নতুন



গল্পগুচ্ছ

নতুন গল্পগুচ্ছ

প্রগতি প্রকাশন
মস্কো

নতুন গল্পগুচ্ছ

সোভিয়েত লেখকদের গল্প

৫

আমরা যা লিখেছি (ভূমিকা)

১৩

ইয়েভগেনি নোসভ **গাঁয়ের পারে ফাঁকা মাঠে**

৩৭

ভিক্তর আস্তাফিয়েভ **সের্গেই মিত্রফানোভিচ**

৮৩

ইউরি কাজাকভ **ওক বনে হেমন্ত**

১১১

ভিক্তর লোগিনভ **তপ্ত দুধের রঙ**

১৩৩

ভিক্তর তেলপুগভ **পড়াশুনার বাস**

১৩৬

ভিক্তর তেলপুগভ **হাঁটা পথ**

১৪১

ভাসিলি বেলোভ **ল্যুবা-ল্যুবুশ্‌কা**

১৬৫

ফাজিল ইসকান্দের **হারকিউলিসের ত্রয়োদশ কীর্তি**

১৮৯

মাইয়া গানিনা **নির্বাণের পথ**

২২৯

ভ্লাদিমির সলোউখিন **ভারভারা ইভানভনা**

অনুবাদ: ননী ভৌমিক
অঙ্গসজ্জা: আ. সুলেপিশেভ

ЯСНЫМ ЛИ ДНЕМ

(Новые рассказы советских писателей)

На языке бенгали

Е. Носов. В чистом поле, за проселком
В. Астафьев. Ясным ли днем
Ю. Казаков. Осень в дубовых лесах
В. Логинов. Цвет топленого молока
В. Тельпугов. Наш автобус учится
Тропинка
В. Белов. Люба-любушка
Ф. Искандер. Тринадцатый подвиг Геракла
М. Ганина. Путь к нирване
В. Солоухин. Варвара Ивановна

আমরা যা লিখেছি

(ভূমিকা)

সোভিয়েত কথা সাহিত্যে সম্ভবত ছোটো গল্পই সবচেয়ে প্রচারিত ও জনপ্রিয়।

অতি প্রাচীন কাল থেকেই সাহিত্যিকরা এই ধরনের আখ্যানে আগ্রহী। চিরায়ত লেখকদের যাঁরা এমন কি 'অন্য ব্যাপারের ব্যাপারী', তাঁরাও ছোটো গল্প লিখে দেখার প্রলোভন সামলাতে পারেন নি, আর তাতে করে এই ধরনের কথা-শিল্পের ক্ষেত্রে চমৎকার সব আদর্শস্থানীয় নিদর্শন সৃষ্টি করে গেছেন।

চলতি একটা ধারণা আছে যে উপন্যাসের বিপরীতে ছোটো গল্প যেন শুধু ছোটো ছোটো সমস্যা নিয়ে ভাবিত, রূপ দেয় ছোটো ছোটো ঘটনার; সাহিত্যের ইতিহাসে কিন্তু দেখা যাবে সে ধারণা ভুল।

ভূমিদাসপ্রথার অধিকারহীনতা থেকে মুক্তি ও সমাজতান্ত্রিক মানবতায় উল্লম্ফনের যে ঐতিহাসিক কীর্তি সাধন করেছে আমাদের জনগণ, তাকে অনুভব করতে ও তা নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে যিনি আগ্রহী, অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের আভ্যন্তরীণ অনিবার্যতা যিনি প্রগাঢ় উপলব্ধি করতে চান, তিনি কালানুক্রমে অন্তত নিম্নলিখিত গল্পগুলি পাঠ করলেই যথেষ্ট লাভবান হবেন: আ. পুশকিনের 'ডাক বাবু', ম. লেরমন্তভের 'তামান', ই. তুর্গেনেভের 'হাড়', ম. গোর্কির 'মুখপোড়া', আ. তলস্তয়ের 'সাপ', আ. প্লাতনভের 'ফ্রো' আর ভ. বেলোভের 'ল্যুবা-ল্যুবুশকা'।

তালিকাটা অবশ্যই আমার মর্জি মতো রচিত। আমি শুধু

সেইগুলোর নাম করেছি যা আমার মনের সঙ্গে মেলে, বিশেষ করে নারী চরিত্র যেখানে জ্বলজ্বলে হয়ে উঠেছে।

রুশ ও সোভিয়েত গল্পের অন্য ধরনের নানা সংকলনও করা যায়, যা পাঠ করলে প্রায় যাদুস্পর্শে আমাদের সমাজ বিকাশের এমন একটা পরিদৃশ্য অবারিত হবে, রূপময়তায় ও গভীরতায় যা তিনখণ্ড জোড়া স্থূলকায় যে কোনো উপন্যাসকে লজ্জা দিতে পারে।

ভালো একটা ছোটো গল্পের প্রভাব প্রচণ্ড। সংক্ষেপ ভাষণের প্রহরণই তার একমাত্র কারণ নয়। বর্ণনীয় বিষয়ের নির্বাচনটাই, প্রসঙ্গটা সার্বজনীন মনোযোগের কেন্দ্র হয়ে উঠতে সক্ষম এই চেতনাটাই যেন প্রক্ষেপণ লেন্সের মতো চরিত্র ও ঘটনাবলীকে বর্ধিত করে তোলে, তাদের উঠিয়ে দেয় উঁচু ধাপে, অভ্যস্ত দৈনন্দিনতা থেকে তাদের আলাদা করে নিয়ে গল্পের বিষয় বস্তুটাকে করে তোলে গুরুত্বপূর্ণ, তাৎপর্যময়।

এটা আশ্চর্যের কিছু নয় যে সোভিয়েত লেখকদের প্রথম পুরুষের মধ্যে, বিপ্লবের ঝড়ে নতুন হয়ে ওঠা সাহিত্যের স্রষ্টাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ছোটো গল্পের ওস্তাদ। আ. তলস্তয়, ম. শলোখভ, ভ. ইভানভ, ক. পাউস্তভস্কি, ই. বাবেল, ইউ. ওলেশা, ম. জোশ্চেঙ্কো প্রভৃতি বিশ্ববিদিত লেখকেরা তাতে যেমন অভিনবত্ব দান করেছেন, তেমনি চিরায়ত ঐতিহ্যও রক্ষা করে গেছেন সযত্নে।

কী সেই ঐতিহ্য? ইউরোপীয় ও আমেরিকান ছোটো গল্প থেকে রুশ গল্পের বৈশিষ্ট্যসূচক পার্থক্যটা কোথায়? খ্যাতনামা কবি আ. ত্ভারদোভস্কি, প্রসঙ্গত বলি, নিজেও তিনি কয়েকটি চমৎকার ছোটো গল্প লিখেছেন, সে বৈশিষ্ট্য দেখেছেন এইখানে যে, স্থূলভাবে বললে, 'অসচরাচরের' চেয়ে

সচরাচরের বর্ণনাই রুশ বাস্তববাদী গল্পের পছন্দ। যেমন ই. বুনিনের রচনা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধে আ. ত্‌ভার্‌দোভস্কি লিখেছেন:

'লেখকের তর্কাতীত ও কালোত্তীর্ণ শিল্পকৃতিত্ব সর্বাগ্রে এইখানে যে তিনি যা বিকশিত ও সুসম্পূর্ণ করেছেন সেটা হল কাহিনীর বিশ্বস্বীকৃত রুশী ধারা, অবাধ ও অসাধারণ ধারকত্বের এমন অনতিবৃহৎ আখ্যান যা সুনির্দিষ্ট মাপাজোখা প্লট পরিহার করে, শিল্পীর দেখা জীবন্ত ঘটনা বা চরিত্র থেকে তা যেন জেগে ওঠে সরাসরি, উত্থিত প্রশ্ন বা সমস্যার পূর্ণ সমাধানের পর দাঁড়ি টেনে তার কোনো আত্মবদ্ধ সমাপ্তি থাকে না।'

ত্‌ভার্‌দোভস্কির মতে, এই ধরনের গল্পের সূত্রপাত হয়েছে 'শিকারীর রোজনামচা' থেকে, বিখ্যাত এই গল্প সংকলনটি তুর্গেনেভ লেখেন গত শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, ভূমিদাস প্রথা ভেঙে পড়ার সময়।

তবে প্লটের অনস্তিত্ব ও প্রসঙ্গের দৈনন্দিনতাই যে রুশ গল্পের অবধারিত উপাদান, এটা সবাই ভাবেন না।

ছোটো গল্পের অন্যতম একজন সেরা শিল্পী মিখাইল জোশ্যেঙ্কোর কাছে মনে হয়েছে যে, 'পুশকিনের সঙ্গে সঙ্গেই রুশ সাহিত্যে সত্যকারের সেই লোক-ধারাটা লোপ পেয়েছে, যা অমন আশ্চর্য দীপ্তিতে শুরু হয়ে গত শতকের দ্বিতীয়ার্ধে স্থানচ্যুত হয় মনস্তাত্ত্বিক গদ্যের কাছে, যা আসলে আমাদের জনগণের কাছে বিজাতীয়।'

সাফ-সাফ এই দুই উক্তি কিন্তু তেমন পরস্পর বিরোধী নয়। উভয়ের মধ্যেই একই ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে: বিগত এক শতকের রুশ গল্প হল প্রধানত মনস্তাত্ত্বিক রচনা, সুনির্দিষ্ট প্লটে তার তাচ্ছিল্য আছে, এবং খোদ জীবনের

মতোই তার কোনো আত্মবদ্ধ সমাপ্তি নেই। এঁদের মধ্যে তফাৎ শুধু এই যে একজন লেখক এটাকে মনে করেন গুণ, অন্যজন ত্রুটি।

আমার মতে, মনস্তাত্ত্বিক ধরনের গল্প আমাদের উদ্ভাবনও নয়, আমাদের সম্পত্তিও নয়। ইউরোপ, এশিয়া ও উভয় আমেরিকার লেখকেরা বহুদিন থেকেই মনস্তাত্ত্বিক ছোটো গল্পের চর্চা করে আসছেন, শুধু বর্তমানের আধুনিকেরা কুখ্যাত 'চেতনাপ্রবাহের' অপব্যবহার করে মূলত নিরীহ এই ধারাটিকে দাঁড় করিয়েছেন উদ্ভটে।

আমাদের চিরায়ত ও সাম্প্রতিক সমস্ত সাহিত্যকে সমগ্রভাবে ধরলে দেখা যাবে যে কখনোই তা কেবল একপেশে মনস্তাত্ত্বিক আখ্যানে সীমাবদ্ধ থাকে নি। ল. তলস্তয়, ন. লেস্কভ, আ. কুপ্রিনের হ্রস্ব রচনা বা আ. চেখভের ছোটো গল্পসম্ভারের যাঁরা ভক্ত, তাঁরা একথা মানবেন যে আমাদের সাহিত্য সর্বদাই গতিময় তীক্ষ্ণ প্লটের গল্পে সমৃদ্ধ।

বর্তমান কালের গল্পগুলিতে দেখা যাবে স্বাদ ও শৈলীর ব্যাপক ও বিচিত্র বর্ণালী। সংকলিত লেখকদের আদর্শ হিশাবে যে দুই চূড়ান্ত দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমান, যে কোনো বয়স ও মনোভঙ্গির পাঠক তার মাঝখান থেকে নিজের রুচি ও মনের মতো জিনিসটি খুঁজে নিতে পারেন।

এ সংকলনে সংখ্যায় গল্প আছে অল্প। তাহলেও বর্ণালীর এ সমৃদ্ধি তাতে ধরা পড়বে, পাওয়া যাবে আমাদের সাহিত্যে প্রসঙ্গ ও রীতির সত্যকার বৈচিত্র্যের খানিকটা ধারণা।

এতে আছে যেমন চিরায়ত রীতিতে ইভান বুনিনের ধারায় লেখা ইউ. কাজাকভের অপূর্ব কাহিনী, তেমনি ফ. ইসকান্দেরের সরস, প্রাজ্ঞ ও অপ্রত্যাশিত সমাপ্তির চৌকস

গল্প, আর তাদের মাঝখানে আছে নানা প্রবণতায় উভয় দিকে ধাবিত এমন নানা আখ্যান যেখানে সুনির্দিষ্ট প্লটে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে চরিত্রের মনস্তত্ত্ব, অথবা মনস্তাত্ত্বিক সূক্ষ্মতায় সংহত হয়েছে প্লটের পরিচ্ছন্নতা।

এ সংকলনে যাঁদের দেখা যাবে, তাঁদের বলা যায় আমাদের সাহিত্যের মধ্যম পুরুষ।

অভিজ্ঞতায় আমরা জানি যে প্রতিভার জন্ম হয় সমান হারে নয়। নিয়মিতভাবে প্রতিবছর দু'জন করে কথা-শিল্পী ও তিন জন করে কবির উদয় হবে, এমন আশা করা যায় না। লেখক সৃষ্টির জন্যে চাই পরিস্থিতির যোগাযোগ। মাঝে মাঝে এমনকি কয়েক দশকের আপেক্ষিক রোমন্থনের পর হঠাৎ দেখা দেয় নতুন নতুন, সার্থক নাম। এগিয়ে আসেন যেন গুচ্ছাকারে একসঙ্গে কতকগুলি সাহিত্যিক। যেমন, পিতৃভূমির মহাযুদ্ধ ও তৎসূচিত সার্বজনীন দেশপ্রেমিক জোয়ারের পর সোভিয়েত সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে অনেক লেখক ও কবিতে, যে কোনো শিক্ষিত ব্যক্তিই আজ তাঁদের নাম জানেন।

আবার পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি একদল লেখক তাঁদের প্রথম উপন্যাস, প্রথম গল্প-সংকলন নিয়ে এগিয়ে এসে যথেষ্ট অবদান যোগ করেছেন আমাদের সাহিত্যে (এ বইটি প্রধানত তাঁদেরই রচনা নিয়ে)। আর খুব সম্প্রতি এই ষাটের দশকে দেখা দিয়েছে একান্ত তরুণ একদল প্রতিভা, ছোটো গল্পের দুরূহ শিল্পকে যাঁরা সার্থকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

সাহিত্যিকদের প্রতিটি গোষ্ঠীই কথা-শিল্পে নতুন কিছু যোগ দেন। সেই সঙ্গে নবীনদের সমগ্র রচনা একত্রে ধরলে এটা না দেখে পারা যায় না যে, তাদের মধ্যে একটা মিলও আছে, সোভিয়েত আমলের রুশ সহিত্যের বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে তাতে।

মিলটা এইখানে যে অন্যান্য 'অবজেকটিভ' আখ্যানের বিপরীতে আমাদের গল্পগুলি নীতিগতভাবে ক্রিয়ামুখী।

সাধারণ অথবা অসাধারণ কোনো একটা ঘটনার শিল্পিত চিত্রণ দেবার সময় আমাদের লেখকেরা সচেষ্ট থাকেন শুধু এইটুকুর জন্যে নয় যে ঘটনাগুলো আঁকা হল যথাসম্ভব জ্বলজ্বলে রঙে, নিখুঁতভাবে তা মিলে গেল সাধারণ জীবন যাত্রার সঙ্গে। ঘটনাদির বিশ্লেষণ করে লেখক পাঠকদের চেতনায় চরিত্র ও তাদের আচরণের প্রতি নিজের মনোভাবও সঞ্চারিত করতে চান, চেষ্টা করেন যাতে জীবনের জটিল ও স্ববিরোধী ঘটনাগুলির নৈতিক মূল্যায়নে পাঠক তাঁর সঙ্গে একমত হয়।

সার্থক এই ঐতিহ্যটি দেখা দিয়েছিল গত শতকের গোড়াতেই, যখন রুশ চিরায়ত সাহিত্য গড়ে উঠছিল, গল্প তখন প্রধানত লেখা হত উত্তম পুরুষের জবানিতে, নাম হত: 'বুড়ো সিপাহীর কথা', 'মফস্বলবাসীর কথা', 'শিক্ষার্থী অফিসারের কথা'...

রুশ ভাষায় 'গল্প' কথাটির ব্যাপক অর্থে বোঝায় মৌখিক আখ্যান। সাধারণ কথোপকথনে আলাপ চলে কতিপয় লোক নিয়ে। গল্প শোনায় শুধু একজন, বাকিরা শোনে। 'গল্প' নামক আধুনিক সাহিত্যিক রুশ পরিভাষার মধ্যে তাই কথকের, গল্পকারের বিশেষ তাৎপর্যও নিহিত আছে।

কথকের উপস্থিতিতে গল্পটি পায় বিশেষ একটা রঙ, কেমন একটা স্বাধীনতা। পাঠককে যেন গল্পকার হাত ধরে এগিয়ে দেন, সখার মতো তাকে পথ দেখান প্লটের গোলকধাঁধার মধ্যে, ঘটনার মূল্যায়নে তাকে ওপরে উঠতে সাহায্য করেন, জুগিয়ে দেন সঠিক বিচারবোধ, পাঠককে তোলেন শিলীভূত অভ্যস্ত দৃষ্টিভঙ্গির ওপরে।

এ সংকলনের অধিকাংশ রচনাই উত্তম পুরুষে লেখা। মাঝে মাঝে স্থির করা মুশকিল হয় কে বলছেন, লেখক নাকি তাঁর চরিত্র। তা নিয়ে বিব্রত হবার কারণ নেই। উভয় ক্ষেত্রেই পাঠক শুনবেন সোভিয়েত নাগরিকের উদ্দীপিত কণ্ঠস্বর, ন্যায় ও শুভের সৌন্দর্যে যে তন্নিষ্ঠ, যে কোনো বলাৎকারে যে অসহিষ্ণু, শ্রমজীবী মানুষ ও তার অফুরন্ত সৃজনশক্তিতে যে গর্বিত।

সের্গেই আন্তনভ



ইয়েভগেনি নোসভ। কুর্স্ক অঞ্চলে জন্ম ১৯২৫ সালে। পিতৃভূমির যুদ্ধে যোগ দেন, আহত হন গুরুতর, দুটি অর্ডার লাভ করেন। সৈন্যদল থেকে ছাড়া পেয়ে খবরের কাগজে ঢোকেন। ১৯৫৮ সালে বেরয় তাঁর প্রথম গল্পের বই 'জেলেদের পথে'। পরে বেরয় 'তিরিশটি বীজ', 'সূর্য যেখানে জাগে', 'ওট ক্ষেতের গুঞ্জন' প্রভৃতি নানা গল্পগ্রন্থ যাতে সেরা ছোটো গল্প লিখিয়েদের মধ্যে নিজের স্থান করে নেন নোসভ, ব্যাপক খ্যাতি ও স্বীকৃতি লাভ করেন।

গাঁয়ের পারে ফাঁকা মাঠে

১

ছোটো সেপ্লিকি গ্রামটাকে বেশ খানিকটা দূর দিয়ে ঘুরে গেছে যে মেঠো রাস্তাটা, কামারশালাটা ছিল সেখানেই। রাস্তা থেকে বাকহুইট ক্ষেত পেরিয়ে দেখা যেত কেবল গ্রামের বাগানগুলোর চুড়ো, বাড়িগুলো সবই থাকত চেরি আর আপেল গাছের নিবিড় সারির আড়ালে। হাওয়া না থাকলে ভোর বেলায় গাঁয়ের মাথায় উঠত চুল্লির অলস ধোঁয়া, গাঢ় হয়ে ছড়াত ঘুঁটের গন্ধ। গ্রীষ্মে সেখান থেকে উত্তপ্ত গুঞ্জন তুলে ধূমায়মান কামারশালাটা এড়িয়ে বাকহুইট মঞ্জরীর দিকে উড়ে যেত ঝাঁক বেঁধে মৌমাছি। আর শরতে, বার কয়েক ভীরু জানানি দেবার পর যখন সপ্তাহ দুয়েকের জন্যে সত্যি করেই দেখা দিত সংক্ষিপ্ত দ্বিতীয় গ্রীষ্ম, নীল আকাশ, নতুন খড়ের সোনালী স্তূপ, তখন সেপ্লিকি গ্রাম থেকে মাঠের

বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ত আপেলের ঝাঁঝালো মদির গন্ধ, আর আনাড়ীর মতো প্রাণপণে চেঁচাত সে গ্রীষ্মে জন্মানো মোরগছানা।

গাঁয়ের যে কোনো প্রান্ত থেকে দেখা যেত কেবল সপ্ত-শ্রেণী স্কুলটা। পুরনো, প্রাথমিক, এবং ভয়ানক জীর্ণ স্কুলটার বদলে তা গড়া হয়েছে মাত্র বছর কয়েক আগে। তোলা হয় সেটা গাঁয়ের পেছন দিকে, ঘন ঘাস ভরা সমতল চারণক্ষেত্রে, আর এখন তা বাগানগুলোর কালচে সবুজের পটে ধবধব করে নির্মল শাদায় আর সূর্য উঠলে তার জানলার চওড়া চওড়া শার্সিগুলো একেবারে জ্বলতে থাকে।

সেই সাবেক কালেই গাঁয়ের কাছে কামারশালাটা বানায় সেপিলকি গ্রামের কোন এক তুখোড় চাষী, ভেবেছিল পথের যত রকম যাত্রীদের শুষে খাবে মাকড়সার মতো। লোকে বলে, পথের কামারগিরিতে টাকা জমিয়ে লোকটা কামারশালার পাশেই একটা সরাইখানা বানায়, গরম হবার জন্যে সামোভার মদ দুইয়েরই ব্যবস্থা ছিল। আরো বলে, যারা আস্তানা নিত তাদের 'গায়ের চামড়াটা খুলে নিতে' তার বাধত না।

বিপ্লবের সময় সেপিলকির লোকেরা নিজেরাই এই সরাইখানাটা পুড়িয়ে সাফ করে। সেই সঙ্গে জ্বালিয়ে দেয় কামারশালাটাও। তবে শীগগিরই টনক নড়ল যে কামারশালাটা পোড়ানো ঠিক হয় নি। তখন ছাইপাঁশ সব সরালে, নতুন কাঠের গুঁড়ি আনলে নেহাইয়ের জন্যে, হাপর সেলাই করে নিলে, ইঁটের খোপরটা ছাইলে কাঠ দিয়ে আর সেই থেকে কামারশালা প্রথমে সেপিলকি কমিউনের, পরে যৌথখামারটার দিব্যি কাজ করে এসেছে একটানা।

অবিশ্যি একবার ছোটো সেপিলকির কামারশালাটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়, ঘটনাটা বলে রাখি কারণ এ গল্পের সঙ্গে তার

সরাসরি সম্পর্ক আছে। বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ মারা গেল কামার জাখার পানকভ। আর জাখার পানকভ শুধু যেমন-তেমন কামার নয়, ছিল এমন ওস্তাদ যে আশেপাশের জেলা থেকেও যত রাজ্যের মাথা-ভাঙা বরাত আসত তার কাছে। যেমন কাজের জোর মরশুমের সময় হয়ত ভেঙে গেল ট্র্যাক্টরের কোনো একটা অংশ। এখানে সেখানে ছোটাছুটি করলে মেকানিকরা: না, জিনিসটা জেলাতেও নেই, গোটা ভুক্তিতেও নেই। অন্য ধরনের পার্ট চাও তো আছে, কিন্তু ঠিক ঐরকমটি নেই। ওরা তখন ছুটে আসত পানকভের কাছে: বলে, এই তো ব্যাপার জাখার, তুমিই বুঝে দেখ, বানিয়ে দিতে হয়... ভাঙা পার্টটা জাখার হাতে নিত কথাটি না বলে (চেহারাটা ওর গোমড়ামতো, কপালের ওপর পাট করা চুল, বুক পর্যন্ত দাড়ি, ঠিক যেন সেকালের কামানমিস্ত্রি, তবে একালের কায়দাকানুনও ওর জানা ছিল খাসা), কখনো কখনো কেন জানি আতশী কাচ দিয়ে ভাঙা জায়গাটা দেখত। কথাটি কইত না, টুঁ শব্দটি নয়, শুধু যত্ন করে অংশটা ন্যাকড়ায় জড়িয়ে পকেটে পুরত। তবে বিনা কথাতেই বোঝা যেত: নিয়েছে যখন, তখন করে দেবে। আর জাখারের যা কাজ তা শুধু দেখে নয়, দূর থেকে শুনেও আনন্দ। জোগাড়ে ভান্যুশ্কার সঙ্গে যখন পেটাতে শুরু করত তখন যেন গির্জের ঘণ্টা বেজে উঠত, নানা সুরে সে এক হাতুড়ির বাজনা। কখনো জলদে, কখনো গলা কাঁপানো ধুয়ায়। সোর্পলিকিতে যেন এক উৎসব লেগে যেত, বিশেষ করে বসন্তে, চাষ শুরুর আগে। আকাশ ঝরঝরে নীল, চাল থেকে বরফ গলা জল পড়ছে টিপটিপ, না-ঠান্ডা না-গরম আবহাওয়া, আর ওরা ওদিকে ঘর ফাটিয়ে আওয়াজ করে চলেছে... কী খাতির ছিল জাখারের, বছরের পর বছর ওর ছবি ঝুলত

কলখোজের সম্মান ফলকে, যখন মারা গেল তখনো সেটা তুলে নেয় নি, বরাবরের জন্যে রেখে দেয়।

যোগ্যমতো সম্ভ্রম করে অন্ত্যেষ্টি হয় জাখারের। ছুটি দিয়ে দেওয়া হয় সেপির্লকির ইশকুলে। শবযাত্রায় লাল প্যাডে তার তিনটি পদক (যুদ্ধে সে ছিল ইঞ্জিনিয়র বাহিনীতে) বয়ে নিয়ে যায় ছাত্ররা...

সেই শরতেই সৈন্যদলের কাজে ডাক পড়ে ভান্যুশ্‌কার। একেবারে অনাথ হল কামারশালা, ফাঁকা মাঠে দাঁড়িয়ে রইল গোমড়ামুখো ফটকটাকে হাট করে খুলে। বাগানগুলোর ওপাশ থেকে হাতুড়ির ফুর্তিবাজ আওয়াজ শুনতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল সেপির্লকির লোকেরা, এখন তাদের মনে হল যেন ঘরে ঘরে ঘড়ি থেমে গেছে। হঠাৎ কেমন নির্জন নিরানন্দ হয়ে উঠল গ্রামটা: মাঠের ওই ঠুক-ঠাকটার বড়োই অভাব বোধ হচ্ছিল। তাছাড়া সাংসারিক ক্রিয়াকর্ম থেকেও বিদায় নিলে কামারশালাটা — কিছু একটা বানানো হচ্ছে না, মেরামত হচ্ছে না। খুবই আক্ষেপ করলে গাঁয়ের লোকেরা, কেন যে সময়মতো কোনো একটা মাথা-ওয়ালা ছোকরাকে জাখারের সঙ্গে লাগায় নি, তাহলে তার সূক্ষ্ম বিদ্যাটা সে আয়ত্ত করে নিতে পারত। এমন সময় কিনা হঠাৎ নভেম্বর উৎসবের ঠিক আগের দিনে হেমন্তের ফাঁকা মাঠ থেকে পাতা-ঝরা বাগানগুলোর মধ্যে দিয়ে সেপির্লকি গ্রামে ভেসে এল পরিষ্কার একটা শব্দ: ঠুক-ঠুক-ঠাক... ঠুক-ঠুক-ঠাক...

২

ঝমঝমানি ঠকঠকানিটা উঠল নভেম্বর উৎসবের আগের দিনকার গহন অন্ধকার রাতে, যখন গাঁয়ের লোকেরা তখনো

শুতে যায় নি। প্রায় প্রতিটি ঘরেই তোমার গিন্নিরা ময়দা মাখছিল পিঠের জন্যে, মোরগ ছাড়াচ্ছিল, মাংস-জেলীর জন্যে বাছাবাছি করছিল শুয়োরের ঠ্যাং। মাঠের এই অপ্রত্যাশিত আওয়াজটা কানে গেল অনেকেরই, তাই বাইরে বেরিয়ে এসে কান পেতে শুনলে তারা, বুঝতে পারলে না কী ব্যাপার।

কিন্তু রাত্তির বেলায় গাঁয়ের বাইরে থেকে হাতুড়ির এই তাজ্জব শব্দটা সবার আগে শুনেছিল দোনিয়া সিনিয়াভকিন— বেয়াক্কেলে রকমের লোমশ এক রোগামতো বুড়ো। দাড়ি তার গজাত গাল জুড়ে নয়, এখানে ওখানে ঝুঁটির মতো। এমন কি তার হাঁস-ঠোঁট নাকে, একেবারে নাকের ডগাটিতেও অদম্যে ফুঁড়ে বেরিয়েছে খোঁচা খোঁচা শাদাটে একটা ঝোপ। তার এই ঝোপ-ঝোপ দাড়ির জন্যে তার নাম জুটেছিল 'চৌখুপী ঝোপ' অথবা স্রেফ চৌখুপী। বুড়ো একলা লোক (পরে অবশ্য তার কাছে শহর থেকে আসে তার ভাইঝি ভেরকা), বুড়ি মারা যাওয়ার পর থেকে তার ঘরে পিঠে ভাজা বা মাংস-জেলী ঠাণ্ডা করার কেউ না থাকায়, চৌখুপী দাদু সেদিন সকাল থেকেই গাঁ ঘুরে ঘুরে বাড়ি বাড়ি আসন্ন উৎসবের অভিনন্দন জানিয়ে বেড়াচ্ছিল। অভিনন্দন জানানোর পদ্ধতিটা তার ছিল সাবেকী, খৃষ্টভক্তদের মতো: দরজা খুলে, চৌকাঠের কাছে টুপি নামিয়ে, গলা পরিষ্কার করার জন্যে একটু কেসেই হড়বড়িয়ে আবৃত্তি করে যেত:

'অভিনন্দন গো তোমাদের, সাধু সজ্জন, মিলমিশ থাক সংসারে, মিঠে মিঠে পিঠে পুলি, কড়া সেদ্ধ ডিমগুলি, চর্ব্যচূষ্য থালা-থালা, হাতেতে পেয়ালা...'

ছড়াটি বলে চৌখুপী দেবপটের কাছে মাথা নোয়াত, তারপর বসত বেঞ্চিতে।

গাঁয়ের লোকেদের অবশ্য চৌখুপীর দিকে মন দেবার সময় ছিল না: ঘরদোর রঙ করা, তোশক ঝাড়া, রান্নার ঝামেলা—কত কাজ। তাহলেও দু-তিনটি বাড়িতে বুড়ো জমিয়ে বসলে, একথা ওকথা গল্প করলে প্রাণ ভরে এবং রাত নাগাদ মেজাজটি হয়ে দাঁড়াল ভারি প্রশান্ত। এবার তার শুতে যাবার পালা, কিন্তু কলখোজের সভাপতি দেনিস ইভানভিচের বাড়ির সামনে দিয়ে যাবার সময় এক মিনিটের জন্যে এখানেও একটু অভিনন্দন জানাবার প্রলোভন সে ঠেকাতে পারল না, কেননা বড়োই সে শ্রদ্ধা করত দেনিস ইভানভিচকে।

'দেনিস ইভানভিচ ছাড়া উৎসবের অভিনন্দন জানাবার মতো লোক আর আছে-টা কে?' মনে মনে সশ্রদ্ধে বললে চৌখুপী এবং ফটক ঠেললে।

ঘর ভরে উঠেছে খাবারের গরম পরব-পরব গন্ধে, টেবিলের ওপর স্তূপ হয়ে আছে পিঠের পুর দেবার জন্যে সদ্য-ভাজা কোঁকড়া কোঁকড়া বাঁধাকপির ফালি। দেনিস ইভানভিচের থলথলে গুরু-নিতম্বা বৌ দারিয়া নোনা বাঁধাকপির পিপেটা নিয়ে ব্যস্ত আর দেনিস ইভানভিচ নিজে ফিটফাট কামিজ পরে নাকে চশমা চড়িয়ে রুপোলী মোচ খুঁটতে খুঁটতে কাছেই বসে জেলা-সমাচার পড়ছিল, মানে আসলে কোন খামার কত কাজ তুললে, দেখছিল সেই হিশাবটা। চৌখুপী ভেতরে ঢুকে যেই তার 'মিঠে মিঠে পিঠে পুলি' শুরু করতে যাবে, ঠিক সেই সময়েই দেনিস ইভানভিচ কাগজখানায় এমনভাবে চড় মারলে যেন মশা তাড়াচ্ছে, তারপর ঈষৎ বিদ্রূপের সুরে সেই সঙ্গে আহতভাবেই বলে উঠল:

'শালার ব্যাটা! তবে ধুরন্ধর আছে!'

'কার কথা বলছ?' জিজ্ঞেস করলে চৌখ্‌পী, সম্ভ্রম জানিয়ে স্পর্শ করলে গিন্নির কন্‌ইয়ের ওপরটা, কেননা কব্জি তার ছিল পিঠে তৈরির লেই দিয়ে মাখা।

'আরে ওই রসশি গাঁয়ের 'সত্য পথ' খামার,' কাগজ রেখে দিলে দেনিস ইভানভিচ। 'হিশেবে দেখিয়েছে যে ওর সব ক্ষেতে হাল দেওয়া হয়ে গেছে; অথচ এই সেদিন আমি ওদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, খাল পারের ক্ষেতে আজও পর্যন্ত হাত পড়ে নি। দেখতে না দেখতে জেলার দ্‌ই নম্বরে লাফিয়ে উঠেছে। ধ্‌রন্ধর বটে এই পস্‌ভিস্তভ লোকটা!'

'লোকে বলে তিমিরিয়াজেভ কৃষি আকাদমি নাকি শেষ করেছে,' বললে চৌখ্‌পী।

'ওটা কোনো কথা নয়।'

'হ্যাঁ, তাই তো আমি বলছি,' চট করেই সায় দিলে চৌখ্‌পী, 'বিদ্যে ছাড়াও নিজের ঐটে খানিকটা চাই। বোতাম চকচক করলেই হয় না, গা গরম হলে তবেই বলি ওভারকোট। ধরো না এই তুমিই, দেনিস ইভানভিচ। বিদ্যে তোমার বলতে গেলে কিছ্‌ নেই। হাতে কলমে কাজ করে লোকজনকে দেখে তোমার যা কিছ্‌ শিক্ষা। কিন্তু কাজ চালাও কেমন খাসা দেখো দিকি নি।'

'হ্‌ঁ...' বলে কাসলে দেনিস ইভানভিচ এবং ফের কাগজের আড়াল নিলে।

'তা আমাদের সেপিলকি গাঁয়ে খেয়ে দেয়ে সবাই দিব্যি তো আছি, ভগবানের দয়ায় তোমার ছোটাছ্‌টি অদলবদল, একে তোলো ওকে নামাও, এসব কিছ্‌ নেই,' ভাজা বাঁধাকপির কাছে আসন নিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে গেল চৌখ্‌পী, 'এই তো আমি যাচ্ছিলাম, দেখে প্রাণ জ্‌ড়োয়, কেমন আমাদের গ্রামটি। সবকটিতে নতুন রঙ পড়েছে, ধবধব করছে, ঝকঝক করছে

জানলার কাচ, গর্ ভেড়ায় বেড়া ভেঙেছে এমন নয়, তোমার ওই রসশি গাঁয়ে যা হয়।'

'কার বাড়িতে রঙ পড়েছে সেটা দেখছি,' বললে দেনিস ইভানভিচ, 'কিন্তু তোমার বাড়ি যে ফের ছোপ ছোপ হয়ে উঠেছে যেন চিতাবাঘ। রঙ দেবার জন্যে পড়শীদের একটু বললেই পারতে, লজ্জা হওয়া উচিত।'

'করব, ভগবানের দিব্যি, করে নেব,' বিবর্ণ পাতায় চোখ মিটমিট করলে চৌখুপী। 'কেন বলছি, জানো? এই তো তুমি আমায় বকুনি দিলে, আমার কিন্তু রাগ হল না। ভালো মানুষের মুখ থেকে বকুনি শুনতেও ভালো লাগে। কারণ তুমি হলে আমাদের এখানকার সত্যিকারের কর্তা, কী কেন সেটা বিদ্যে দিয়ে নয়, কলজে দিয়ে টের পাও।'

'নাও হয়েছে...' ভুরু কোঁচকালে দেনিস ইভানভিচ, 'ওসব আমার ভালো লাগে না... বরং একটু জলখাবার খেয়ে যাও।'

'খাব, খাব বৈকি,' মাথা নাড়লে চৌখুপী; চেয়ে দেখলে, দারিয়া ইলিনিচনা টেবিল থেকে বাঁধাকপি সরিয়ে তার বদলে রাখছে ডিশ, অ্যাশবেরি ফলে জারানো নকসা কাটা এক পাত্র মদ। 'ফের এই কথাটা ধরো, ওদের চেয়ে আমাদের কলখোজের নামটা কত ভালো: 'নিভা'! আর 'সত্য পথ' মানেটা কী?.. কার কাছে সত্য, কেবল ওদের কাছে? এই তো গত শীতে ওদের তেরোটা বাছুর পটল তুললে... নাম দেবার সময় হুঁশিয়ার হতে হয়, এই তোমায় বলে দিচ্ছি। নয়ত পরে পস্তাবে...'

'খাও, খাও... কী কাজে বকবক করছ...'

মাত্র দুই পাত্র অ্যাশবেরি ব্র্যাণ্ডি খেয়েই চৌখুপী দাদু আলাপের মধ্যেই ঢুলতে শুরু করলে। দেনিস ইভানভিচ

তার খালি পা জোড়া হাইবুটে ঢুকিয়ে গায়ে বালাপোষের কুর্তা চাপিয়ে বললে:

'ঝিম ধরেছে তোমার, চৌখুপী, চলো পেঁছে দিয়ে আসি...'

পুরনো ইশকুলটার কাছে সাঁকোর ওপর যখন ওরা যাচ্ছে (দেনিস ইভানভিচ না থাকলে বুড়ো অন্ধকারে সেখানে উল্টে না পড়ে পারত না), এমন সময় ভেসে এল সেই তাজ্জব আওয়াজটা।

'শুনছ?' সতর্ক হয়ে দাদু আঙুল তুললে অন্ধকারে।

দাঁড়িয়ে কান পাতলে: কালচে আড়ষ্ট হৈমন্তী বাগানগুলোর ওপাশ থেকে, গহন মেঠো অন্ধকারের ভেতর দিয়ে আগের চেয়েও স্পষ্ট করে শোনা গেল: ঠুক-ঠুক-ঠাক-ঠুক, ঠুক-ঠুক-ঠাক-ঠাক...

'হেই ভগবান, নির্ঘাৎ কামারশালা থেকে...' রায় দিলে চৌখুপী।

'যত বাজে কথা,' আপত্তি করলে দেনিস ইভানভিচ।

'মাথার দিব্যি, কামারশালায়!'

'কার এমন দায় পড়েছে, রাত্রে, তাতে আবার পরবের আগের দিন?'

'কার দায় তুমিই ভেবে দ্যাখো।'

'যত গাঁজাখুরি।'

'উঁহুঁ, শুনে দ্যাখো। এই যে দুটো চাপা আওয়াজ, এটা ও বাড়ি মারলে তপ্ত লোহায়, এখনো নরম, তাই চাপা... শুনে দ্যাখো। আর এইটে জোরালো, এটা ও মারলে নিহাইয়ের ওপর।'

'ও মানে-টা কে?' জিজ্ঞেস করলে দেনিস ইভানভিচ।

'হ্যাঁ, ওই বটে...'

‘ধুত্তোরি তোর নিকুচি করেছে... ও-টা কে?’ চটে উঠল দেনিস ইভানভিচ।

‘কে, কে... বুঝতে পারছ না, জাখারই ঠুকছে...’ ফিসফিসের সুরে গলার স্বর নামিয়ে বললে বুড়ো, শিউরে নিঃশ্বাস ফেললে।

‘ধুত্তোরি!’ থুতু ফেললে দেনিস ইভানভিচ।

‘একেবারে ওরই ঢঙ। শুনছ, কেমন হালকা মার। যেন কাজ করছে না, গির্জের ঘণ্টা বাজাচ্ছে।’

‘মাথা খারাপ হল নাকি?’

‘মরেছে তো কাজ করতে করতেই—হার্ট ফেটে। লোকে বলে নাকি যুদ্ধের ওই শেলের টুকরোটা ভেতরে হার্টের কাছেই থেকে গিয়েছিল। ছুটে গেলাম সবাই—দেখি মরে পড়ে আছে, আর কালটিভেটরের লাঙলটা তখনো ধোঁয়াচ্ছে। দ্যাখো, কেমন মৃত্যু হয় মানুষের।’

‘মানুষের মতো মানুষ ছিল, মারাও গেছে মানুষের মতোই।’

‘আরে, তাই তো আমি বলছি: কাজটা তো শেষ হয় নি, তাই কবর থেকে উঠে এসেছে।’

‘নাহ্, আজকে তুমি বড়ো টেনেছ,’ বিষণ্ণ ভর্ৎসনায় বললে দেনিস ইভানভিচ, ‘অ্যাশবেরি ব্র্যাণ্ডিটা তোমায় না দিলেই হত।’

‘না গো, আমায় তুমি মাতাল ঠাউরিও না... ও চলে যাওয়ায় কামারশালাটা একেবারে অনাথ হয়ে পড়ে ছিল... ঠুক নেই, ঠাক নেই... ওর কাজটা তো আর কেউ তুলে নিলে না।’

‘থামো তো তুমি...’ ঝঙ্কার দিলে দেনিস ইভানভিচ, কিন্তু অন্ধকার হৈমন্তী মাঠ থেকে আসা হাতুড়ির শব্দটা তার

কাছে কেমন অদ্ভুতই লাগল। এমন কি তাতে উত্যক্তই করে তুলল তার বাস্তবতায়, যার কোনো ব্যাখ্যা সে খুঁজে পাচ্ছিল না।

'হুঁ,' যে সুরে কথাটা বললে দেনিস ইভানভিচ তা সম্ভব কেবল লাল ন্যাকড়া দেখে চকে যাওয়া ষাঁড়ের পক্ষে। কোনো রকম ধাঁধা সইতে পারত না সে, তাই দৃঢ়ভাবেই সে জানাল, 'গিয়েই দেখা যাক!'

রাস্তা ছেড়ে দেনিস ইভানভিচ মাঠে যাবার অন্ধকার পথটা ধরলে।

চৌখুপী কিন্তু রাস্তাতেই থেকে গেল।

'দেনিস ইভানভিচ,' ডাক দিলে সে, 'ঘাঁটিয়ে কাজ নেই, কী বলো? হাতুড়ি পিটছে, নয় পিটোক...'

'এক্ষুণি গিয়ে দেখছি,' অন্ধকারে গোঁয়ারের মতো জানিয়ে দিলে দেনিস ইভানভিচ।

'আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও, তার চেয়ে বরং লোকজন ডেকে হল্লা করা যাক, এ্যাঁ?'

'তোমার কেবল হল্লা হলেই হল। ওসব চলবে না, চলো যাই!'

নানা প্রকার অনুমানাদিতে উত্তেজিত হওয়ায় দাদুর ভারি ইচ্ছে হচ্ছিল নিজের গরম ঘরখানায় ফিরে যায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে ইচ্ছা দমন করে সন্তর্পণে দেনিস ইভানভিচের পেছু নিলে, শুধু সুনিশ্চিত হবার জন্যে মাঝে মাঝে সে হাঁক দিচ্ছিল:

'চলছ তো দেনিস ইভানভিচ?

'হ্যাঁ চলছি... তুমি কোথায়?'

'আমি এই এখানেই... তাহলে যাচ্ছ, এ্যাঁ?'

৩

বাগানগুলো পেরতেই দাদু টের পেলে যে অন্ধকারে গোয়ালের উষ্ণ, নিবিড়, গন্ধ ভরা সেপির্লকি গ্রামের সঙ্গে শেষ সংযোগটাও এবার হারাল; দাঁড়িয়ে পড়ে সে অন্ধ শূন্যে চক্ষু নিবদ্ধ করলে সেই জায়গাটায়, যেখানে কামারশালাটা থাকার কথা, কিন্তু কামারশালা চোখে পড়ল না, যেন আদৌ ওটা নেই। উল্টো দিকে কিন্তু আরো স্পষ্ট করে ভেসে এল গায়ে কাঁটা দেওয়া সেই রহস্যজনক শব্দটা: ঠুক-ঠুক-ঠাক্... এমন কি নাকেও সে ধোঁয়ার সেই মিঠে বোটকা গন্ধটা টের পেলে যা জাখার পানকভের জীবদ্দশায় মেঠো বাতাসে ভেসে আসত গাঁয়ে। চোখের সামনে তার ফুটে উঠল যেন পরিত্যক্ত কামারশালার ঝুলকালি ভরা ভেতরটায় দাঁড়িয়ে এক মনে চুপচাপ হাতুড়ি পিটছে জাখার, পাট করা চুলে ঢাকা তার কপালের ওপর লালচে ছটায় দপদপ করছে চুল্লির ঝলক... কিন্তু সামনে দেনিস ইভানভিচের হাইবুট মেঠো দলাগুলোকে পিষেই চলেছে গোঁয়ারের মতো, অগত্যা চৌখুপী দাদু আরেকবার সভাপতিকে ডেকে পেছু পেছু ছুটে গেল খুটখুটিয়ে।

এই সময় বন্ধ হয়ে গেল হাতুড়ির শব্দ। এবার যেতে হচ্ছে রাতের বুকে নিঝুম হয়ে যাওয়া রহস্যটার দিকে।

'দেনিস...' অনুচ্চে ডাকল চৌখুপী।

'কী?'

'বড্ডো তুমি ছুটে চলছ... একটু দাঁড়াও...'

থামল দেনিস ইভানভিচ।

'খামকা আমায় টানলে, ভগবানের দিব্যি।'

দেনিস ইভানভিচ কোনো জবাব দিলে না।

'ভারি তুমি একবগ্গা... বাপরে! হাতুড়ি পিটছে। তা পিটোক...'

সঙ্গ ধরে দাঁড়িয়ে রইল খানিক।

'থেমে গেল যেন...' বললে দাদু।

হেমন্তের গহন নিঝুমতায় হারিয়ে গেছে মাঠ। বাগানগুলোর আড়ালে পড়া গাঁয়ের বাতিগুলোও দেখা যাচ্ছিল না। শুধু তাজা ঝাঁঝালো গন্ধ উঠছিল ঠাণ্ডা খড় আর কামারশালার মিষ্টি ধোঁয়ার।

'দেনিস... দেখছ...'

'দেখছি।'

সামনে দেখা গেল কামারশালার চারকোনা ফটকটা, ভেতর থেকে আসা আলোয় সামান্য উদ্ভাসিত।

'চলো যাই,' দৃঢ়ভাবে বললে দেনিস ইভানভিচ।

'তোমার দেনিস যা ইচ্ছে হয় করো গে, আমি বাপু এইখানেই রইলাম...'

দেনিস ইভানভিচ বিরক্তির একটা অস্ফুট শব্দ করে এগিয়ে গেল একাই। শোনা গেল গোঁয়ারের মতো বদরাগী শব্দ উঠছে ওর বুট থেকে। আলোকিত ফটকের মধ্য দিয়ে দেনিস ইভানভিচের কালো গাঁট্টাগোঁট্টা মূর্তিটাকে কিছুক্ষণ দেখা গেল তারপর তা অদৃশ্য হয়ে গেল কামারশালার ভেতরে।

চুপচাপ কাটল বেশ কিছুক্ষণ, কোনো সাড়াশব্দ নেই। আড়ষ্ট ও উৎকর্ণ হয়ে, ভোঁ-দৌড় দেবার জন্যে তৈরি থেকে চৌখুপী দাদু ভাবছিল এই বুঝি কামারশালায় কিছু একটা ঝনঝন করে উঠবে, ভেঙে পড়বে, ছুটে বেরুবে দেনিস ইভানভিচ, পেছনে তার বর্ষিত হতে থাকবে উত্তপ্ত লোহালক্কড়। কিন্তু সময় কেটেই গেল, কিছুই হল না, দেনিস ইভানভিচেরও

দেখা নেই যেন পাতালে তলিয়েছে। বার কয়েক ক্রুশ করে বুড়ো এগিয়ে গেল ফটকের দিকে, তারপর নিজে লুকিয়ে থেকে উঁকি দিলে ভেতরে। চালের খুঁটি থেকে কেরোসিনের বাতি ঝুলছে, তার তুলোর পলতেটা উঠেছে কাঁচা এক চাকা আলুর ভেতর দিয়ে। ধোঁয়াটে লালচে শিখাটা থেকে ঝাপসা আলো পড়েছে কামারশালায়। চুল্লিতে ছাইয়ের মধ্যে রক্তিম খণ্ডে ধিকিয়ে ধিকিয়ে ঠাণ্ডা হচ্ছে কয়লা... আর দাঁড়িয়ে আছে দেনিস ইভানভিচ, মিটমিটে রুপোলী মোচের ওপর নিচের ঠোঁটটা চাপিয়ে কী যেন ভাবতে ভাবতে নাড়াচাড়া করছে একটা লোহার টুকরো। এমনভাবে জিনিসটা সে এহাত ওহাত করছিল যে বোঝা যায় লোহাটা তখনো ঠাণ্ডা হয় নি।

'দেনিস ইভানভিচ,' বাইরে থেকে ডাক দিলে দাদু।

'কী?'

'কেউ নেই... হেথাকে?'

জবাব দিলে না দেনিস ইভানভিচ, নাড়াচাড়াই করতে লাগল জিনিসটা।

'কিন্তু চুল্লিতে কয়লা জ্বলছে যে... তাহলে কেউ নিশ্চয়...'

এই বলেই চোখুপীর মুখ আড়ষ্ট হয়ে হাঁ-করা অবস্থাতেই রয়ে গেল, যেন গোঁজ ঢুকিয়ে দিয়েছে কেউ। কোণের দিকে, জাখার কামার তার যন্ত্রপাতি রাখত যে কাঠের সিন্দুকে তার পেছনে কার যেন পা নজরে পড়লে দাদুর, তারপলিনের জীর্ণ বুট পরা। এমন কি তার সোলের চক্করগুলো পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল।

'আঁ-আঁ... আঁ-আঁ,' বলে কাঁপা কাঁপা আঙুলটা বুড়ো তুললে সিন্দুকটার দিকে, 'আঁ-আঁ...'

দেনিস ইভানভিচ চোখ কুঁচকে মাথা হেলিয়ে অনেকক্ষণ

তাকিয়ে রইল বেরিয়ে আসা বুটটার দিকে, তারপর কাছে গিয়ে সিন্দুকের পেছনে তার খাটো-আঙুলে হাত ঢুকিয়ে তুলো ভরা ওভারঅল ধরে আলোয় টেনে তুলল ভয়ে মরোমরো কুকুরছানার মতো ন্যাতানো এক বাচ্চাকে।

'কে তুই?' জিজ্ঞেস করলে দেনিস ইভানভিচ।

'ম-মিৎকা...' কাঁদুনে গলায় বললে ছেলেটা, ছুঁচলো থুতনি আর চওড়া কপালের ত্রিভুজাকৃতি মুখটা সে ঢাকলে লম্বা, লটপটে আস্তিন দিয়ে।

'মিৎকা-টা কে?'

'এটা ওই আগাশকার কুলাঙ্গারটা,' সঙ্গে সঙ্গেই চড়ুইয়ের মতো চটপট লাফিয়ে এল চৌখুপী, 'ওই যে গলিতে থাকে, যার ন্যাসপাতি গাছে বাজ পড়েছিল... পোঁদপাকা কোথাকার! এটা তুই হাতুড়ি ঠুকছিলি? আমি ত্-তোকে...'

বলে দাদু মিৎকার ছড়কানো কান এমনভাবে মোচড়াতে লাগল যেন সেটা গ্রাম-সোভিয়েতের পুরনো আমলের টেলিফোনের হাতল।

'আমি ত্-তো, পুঁচকে ফক্কড়, লোককে ব্যতিব্যস্ত করা তোর দেখাচ্ছি! অক্টোবর বিপ্লবের দিন পালনের জন্যে লোকে উজ্জুগ করছে, আর এ হারামজাদা হাতুড়ি ঠুকছে বসে বসে... ত্-তোকেই আমি হাতুড়ি ঠোকা করছি, দাঁড়া...'

'আ-আ-আমি নই!' চেঁচালে ছেলেটা, 'আমি শুধু হাপর টানছিলাম... ঠুকছিল আপোলশকা...'

'আপোলশকাও কান মলা খাবে!'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও,' দাদুকে থামালে দেনিস ইভানভিচ, 'কান পরে মললেও চলবে। আপোলশকা, কোথায় তুই?'

'শীগগির নেমে আয় বলছি!' হুমকি দিলে চৌখুপী।

'হ্যাঁ, আমি ঠুকছিলাম...' ওপর থেকে চাপা একটা আওয়াজ ভেসে এল।

চালার ঠিক নিচেকার বর্গা থেকে বেরিয়ে এল দুটো ফৌজী জুতো, ঠিক যেন দুটি ইস্ত্রি, তারপর পা-পট্টি, তারপর একটা ছেলের অনাবৃত পা। বরগার বহু বছরের ঝুলকালি মুছে নেমে এল একটা বেঢপ-ঢ্যাঙা ছেলে, ঝুলন্ত কাঁধ, মিৎকার দাদা আপোলশকা। বিব্রতের মতো নাক তিরতির করে খাড়া হয়ে দাঁড়াল সে। মস্ত বাঁকা নাকটায় তার কয়লার কালি লাগা।

ছেলেটার দিকে কৌতূহল, এমন কি বিস্ময়ের দৃষ্টিতেই চাইলে দেনিস ইভানভিচ।

'রূপ আর ধরে না,' বলে উঠল চৌখুপী।

'দাঁড়াও, দাঁড়াও,' বলে মুখ কোঁচকালে দেনিস ইভানভিচ; নেহাইয়ের ওপর পাওয়া লোহার টুকরোটা তার কালিমাখা নাকের সামনে ধরে আপোলশকাকে সে জিজ্ঞেস করলে:

'তুই বানিয়েছিস?'

'হ্যাঁ...' মুখ ঘুরিয়ে কবুল করলে আপোলশকা।

'কী হবে এটায়?'

চুপ করে রইল ছেলেটা।

ওর হয়ে ভাই জানাল, 'এটা রড।'

'সে আবার কী?'

'যা দিয়ে চাকা ঘোরে,' কান্নাভেজা চোখ চকচকিয়ে চট করে জানালে মিৎকা, 'ইঞ্জিন বানাচ্ছিলাম আমরা। সব যেমন ছিল ফের রেখে দেব...'

তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে লোহালক্কড়ের স্তূপ থেকে মিৎকা বড়ো ক্যালিবারের একটা কামানের নল বার করলে।

'এইটে হবে বয়লার... জল থাকবে... এইখানে একটা

ফুটো বন্ধ করলেই বয়লার হয়ে যাবে... এখানে থাকবে চাকা... বাষ্পটা প্রথমে এখান দিয়ে যাবে, তারপর এইখানে, তারপর এইখেনে...'

বয়লারটা আরেকবার দেখে তা নেহাইয়ের ওপর রেখে দিলে দেনিস ইভানভিচ।

'শোন আপোলশকা... ইঞ্জিন নয় হল... আচ্ছা, বল তো, বলটু বানাতে পারিস?'

উশখুশ করে দাঁড়িয়ে রইল আপোলশকা।

'চুপ করে আছিস যে? একেবারে গাড়ল!'

'খাঁজ কাটা পাক দেওয়া?' দূরের কোন দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে আপোলশকা।

'যেমন হওয়া উচিত।'

'তাহলে খাঁজ কাটা যন্ত্র লাগবে।'

বললে সে ধীরে ধীরে, টেনেটেনে, যেন চ্যাটচেটে কাদায় এক একটা পা টেনে তুলছে কষ্ট করে।

'কোত্থেকে তুই জানলি যে যন্ত্র লাগবে?'

নাক কোঁচকাল আপোলশকার, এমন কি তার ঝুলকালি মাখা মুখেও কেমন একটা অবজ্ঞা ঝলক দিলে।

'নইলে হবে কী করে?'

'হুঁ...' ঠোঁট নাড়ালে দেনিস ইভানভিচ, 'বেশ, আপাতত খাঁজ ছাড়াই বানা।'

'এমনি?'

'এমনি।'

'এখুনি?' সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞেস করলে আপোলশকা।

'এখুনিই লেগে যা।'

'কিন্তু কী সাইজ? তিন-চার নাকি পাঁচ-আট, নাকি অন্য কিছু।'

'তিন-চারই নয় কর।'

লোহার স্তূপ থেকে একটা লম্বা শিক টেনে বার করল আপোলশকা, মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করলে মিৎকাকে।

'নে হাপর ধর।'

খুশি হয়েই মিৎকা চটপট ছুটে গেল হাপরের কাছে, মাথার ওপরকার কাঠের বারে লটকানো বেল্টটা ধরে পা উঁচু করে ঝুলে পড়ল বাঁদরের মতো। হাতলটা টেনে ধরে ফের নেমে এল মাটিতে, বেল্ট আলগা করে দিলে।

৪

চুল্লির ভেতর ছাইয়ের ওপরে গোঁ-গোঁ শোঁ-শোঁ করে উঠল, ঠাণ্ডা হয়ে আসা কয়লাগুলোর রক্তিম বিন্দুগুলো চাঙ্গা হয়ে ফুলকি ছোটালে, নীলাভ হয়ে উঠল শিখায়। আপোলশকা আগুন উশকিয়ে শিকটা ঢুকিয়ে দিলে কয়লার ভেতর।

দপদপে লাল ছটায় আলো হয়ে উঠল আপোলশকার থুতনি, হাড্ডিসার গাল, ঢিপ কপাল, বেঢপ এই কিশোরটির মধ্যে একগুঁয়েমির যত চিহ্ন ছিল সবই, শুধু ছায়ায় রইল তার বড়ো বড়ো করে মেলা নীল, চিন্তিত চোখদুটি। আর এই ছটায় অথবা আপোলশকার নিজেরই ভেতর জ্বলে ওঠা অদৃশ্য কিছু একটার আভায় ও যেন হঠাৎ বয়স্ক হয়ে উঠল, কঠোর হয়ে উঠল, বরাদ্দ কাজটা যেন তার বয়স বাড়িয়ে দিলে পুরো দশ বছর। তাই-ই হয়—গুরুত্বপূর্ণ কাজ প্রবীণ ওস্তাদকে নবীন করে তোলে, কিশোরকে সাবালক।

দেনিস ইভানভিচ আর দাদুও সরে এল আগুনের কাছে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল কী ভাবে সাঁড়াশী চালাচ্ছে

আপোলশকা, কয়লা চাপাচ্ছে আগুনে। আপোলশকার হাতে, লোহার ঘুঘুরঙা চটায় লম্বা সাঁড়াশী, সরোষে ফুঁসন্ত আগুন তারা এমনভাবে দেখতে লাগল যেন সারা জীবনেও এর চেয়ে বিস্ময়কর কিছু দেখে নি। হয়ত সেটা রাতের প্রভাব, হয়ত অবাক লাগছিল আপোলশকাকে দেখে। কিন্তু দুই বৃদ্ধ যে অমন বিভোর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তার প্রধান কারণ হয়ত এই যে, মানুষের যে প্রাথমিক কারুশিল্পটা ব্রোঞ্জ যুগ থেকে শুরু হয়ে অন্য সমস্ত জটিল ধাতু-প্রক্রিয়ার জন্ম দিয়ে এসেছে, লোহার সেই পোক্ত হয়ে ওঠাটা, চুল্লির গনগনে আগুনে লাল হয়ে ওঠাটা মানুষ নিরুত্তাপ হৃদয়ে দেখতে কখনোই অভ্যস্ত হয়ে উঠবে না।

'ইঞ্জিনটা সরিয়ে নাও তো!' এমনভাবে হুকুম করলে আপোলশকা যেন যাদের বাগানে বাজ পড়ে ন্যাসপাতি গাছ পুড়ে গিয়েছিল সেই আগাফিয়ার ছেলে নয় সে, এখন সে স্বয়ং অগ্নিদেব, কী এক রহস্য সাধন করছে নিশীথে। চমকে উঠে দাদু ছুটে গিয়ে নেহাই থেকে নিয়ে ছুঁড়ে ফেললে ইঞ্জিনটা। চুল্লি থেকে শাদাটে হলদে, প্রায় স্বচ্ছ হয়ে ওঠা, তাপ ও আলো ছড়ানো শিকটা বার করে আপোলশকা খোঁড়ানো পায়ে প্রায় পড়তে পড়তে এগিয়ে গেল নেহাইয়ের দিকে। অন্ধকারে ঝলকে উঠল একটা চোখ ধাঁধানো অর্ধবৃত্ত, কামারশালার দেয়াল আর সিলিঙে পড়ল আপোলশকার আধভাঙা কালো ছায়া।

'ছেনী!' হুকুম করলে আপোলশকা, কালো কোটরে ঝকঝক করে উঠল চোখের শাদা।

হাপর ছেড়ে মিৎকা লম্বা সাঁড়াশীতে ছেনীটা ধরে শিকের ওপর বসালে, শুধু চোখ দিয়ে জিজ্ঞেস করলে আপোলশকাকে: 'এইখানে?' আপোলশকাও মাথা নেড়ে সায় দিয়ে এক ঘায়েই

কেটে ফেললে শিকের প্রান্তটা। তারপর সঙ্গে সঙ্গেই কাটা টুকরোটা চিমটেয় ধরে ঘন ঘন বাড়ি মারতে লাগল চটপট, চিমটেটা ঘোরাতে লাগল কখনো ডাইনে, কখনো বাঁয়ে। আর প্রতিবার ঘোরাবার সময় ফাঁকা এক একটা বাড়ি মারছিল নেহাইয়ে,—এটা কামারশালার সেই হালকা 'ঠ-ঠাক', যে কোনো পাকা ওস্তাদের পক্ষে যা অপরিহার্য, যে সময়টুকুর মধ্যে সে তার কাজটা চকিতে যাচাই করে টিপ নেয় পরের বাড়িটার জন্যে। নমনীয়, প্রায় জীবন্ত টুকরোটা আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে বাধ্যের মতো বসে গিয়ে পুরু হয়ে উঠতে লাগল, তারপর ঠাণ্ডা হয়ে রঙ ধরলে রক্তিম।

জিনিসটাকে ফের চুল্লির মধ্যে গুঁজে আপোলশকা মাথা নাড়লে তার চেলার দিকে, মিৎকাও ছেনী ফেলে ছুটল হাপরের কাছে। আর মাথার ওপর যতক্ষণ যেন কোথায় ফোঁসফোঁস করল হাপর, শোঁ-শোঁ করল আগুন, চুল্লি থেকে জ্বলন্ত কয়লার চটা ফেলল উড়িয়ে, আপোলশকা ততক্ষণ ফের সেই নীরব কঠোর মুখে বসে রইল যেন অস্ত্রোপচারের আগে সার্জন।

'ছয়কোনা, নাকি চারকোনা?' দেনিস ইভানভিচের দিকে মুখ ফেরালে সে।

'ছয়কোনাই কর।'

জিনিসটা বার করে আপোলশকা নিপুণভাবে তার কোনগুলো বানালে, পেষণ-কলে চেপে খুঁতগুলো সেরে ফেলে দিলে জলভরা টবে।

জিনিসটা তুলে নিলে দেনিস ইভানভিচ, তখনো ধোঁয়া উঠছিল তার গা থেকে। এমন মন দিয়ে জিনিসটা দেখতে লাগল যেন শুঁকছে।

'হ্যাঁ, বল্টুই বটে...' বললে সে।

'খাঁজ কেটে দেব?'

'দরকার নেই, পারবি বুঝতে পারছি,' বলে ঘুরে বল্টুটা এগিয়ে দিলে দাদুর দিকে।

দুই হাত দিয়ে জিনিসটা নিলে চৌখুপী, আঙুলের ডগা দিয়ে ধরে রাখলে অনেকক্ষণ, ওলটালে পালটালে আর কেবলি মাথা নাড়লে।

'দ্যাখো দিকি...'

'জাখার কাকা একবার তাতিয়েই বল্টু বানাত,' কোণের কোন দিকে যেন চেয়ে বললে আপোলশকা, 'আমায় তাতাতে হল দুবার...'

'বটে!' পাশকেভাবে তার দিকে ঝুঁকে এল দেনিস ইভানভিচ, 'চাকায় লোহার পাত পরাতে পারবি?'

'পারব।'

'জোড় ঝালাই করতে?'

'জাখার কাকা একবার দেখিয়ে দিয়েছিল... ঠিক বলতে পারছি না...'

'দেখিয়ে দিয়েছিল বলছিস? হুঁ... আর ফাল?'

'কালটিভেটরের?'

'হুঁ, হুঁ।'

'তা ফালও পারব... শুধু ভালো ইস্পাৎ দরকার।'

'তুই আমাকে এখন কেবল একটা আদল করে দেখা তো।'

'একজনে হবে না। হাতুড়ি-পিটিয়ে দরকার।'

'দেখা যাক পারি কি না,' বললে দেনিস ইভানভিচ এবং কামারে কাজের জীবন্ত, উদ্দীপ্ত উত্তেজনায়, তার প্রাচীন সম্মোহনী শক্তির আকর্ষণে যোগ দিলে বেপরোয়ার মতো:

'ভান্যুশকার হাতুড়িটা কোথায় দ্যাখ তো। আর তুমি দাদু আমাদের হাপর টানো, কাচ্চাটা নেতিয়ে পড়েছে।'

হাপরের কাছে গেল দাদ্ব, মিনিট খানেক পরেই তেতে উঠে কোটের বোতাম খ্বলে ফেললে, হাপরের ভারাক্রান্ত হাঁপ-টানের ফাঁকে ফাঁকে বলতে শ্বর্ব করলে:

'দ্যাখ, দেনিস, কাণ্ডখানা... ভেবে দেখলাম কী জানো, র্বশী মাটি বটে, ফসল দেয়... কিন্তু গাঁয়ের কামারশালাটিতে যখন হাতুড়ির শব্দ ওঠে, তখন প্রাণটি জ্বড়িয়ে যায়... এই তো এখন রকেট ফকেট কত কি তোমার হল... কিন্তু মাথা তো ওই কামারশালাটি... র্বশ মাটি তখন একেবারে আপন বলে মনে হয়... যাই বলো বাপ্ব... এ কাজটা থামতে দেওয়া চলে না...'

'তুমি ব্বড়ো বরং হাপর টানো!' ঝঙ্কার দিলে দেনিস ইভানভিচ।

'চেষ্টা তো করছি... টানছি বৈকি... আর আমি ভাবছিলাম আমাদের জাখারের বংশ ব্বঝি শেষ হয়ে গেল... তাই কি হয় কখনো... বংশ যেমন চলবার চলছে...'

৫

প্রাক-উৎসব রাত্রে সেদিন সেপির্লাকি গ্রামে হাতুড়ির শব্দ ভেসে এসেছিল অনেকক্ষণ। কখনো সে শব্দ উঠেছে রাগী-রাগী, তড়িঘড়ি, কখনো ঝমঝমে, ফুর্তি-ফুর্তি। সচকিত সেপির্লাকি-বাসীরা কিছ্বতেই ব্বঝে উঠতে পারছিল না কী হচ্ছে ওখানে ওই ফাঁকা মাঠে, ঠিক নভেম্বর দিবসের আগটিতে, ওখানে এ কীসের দ্বর্বোধ্য উপাসনা। গাঁয়ে ছ্বটে এসে মিৎকা বললে সোৎসাহে:

'ওহ্, কী যে শ্বর্ব হয়েছে! দেনিস ইভানভিচ নিজেই হাতুড়ি ধরেছে... কুর্তা খ্বলে ফেলছে, শ্বধ্ব একটা কামিজ

গায়ে... ঝুলকালি মেখেছে কি — সাংঘাতিক... দেনিস ইভানভিচ পেটাই চালাচ্ছে, আর হাপর টানছে চৌখুপী... আপোলশকাকে বলে দেনিস ইভানভিচ: 'এটা পারবি?' 'পারব।' 'আর এটা?' 'পারব...' কিছুতেই হার মানবার পাত্র নয় আপোলশকা। সব একেবারে যাচাই করে দেখা। কত যে বানালে — সাংঘাতিক!'

'তা তুই আবার কোথায় যাচ্ছিস?' বলা হল মিৎকাকে, 'তোর মা যে তোকে চারিদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

'বেড়াক গে!' ঝোলা আস্তিন দোলালে ছেলেটা, 'বলে দিও আমার সময় নেই এখন... আমায় যে জল আনতে পাঠিয়েছে, আর সিগারেট।'



ভিক্তর আস্তাফিয়েভ। ১৯২৪ সালে সাইবেরিয়ায় জন্ম। কারখানার স্কুল শেষ করে রেল শ্রমিক হন। পিতৃভূমির যুদ্ধে সৈনিক, আহত হন, পুরস্কার পান, খবরের কাগজে ঢোকেন। ১৯৫৩ সালে প্রথম গল্পের বই বেরয় পের্‌ম শহর থেকে। 'নক্ষত্রপাত', 'হরণ' প্রভৃতি উপন্যাস ও গল্প-সংগ্রহের লেখক। সত্যনিষ্ঠ ও সহজভাবে লেখেন সাইবেরিয়া আর তার অপরূপ প্রকৃতির কথা, সাধারণ মানুষের কথা, যাদের তিনি ভালোবাসেন, বিশ্বাস করেন।

সের্গেই মিত্রফানোভিচ

পাতা ঝরছিল শহরে। পপলার গাছ থেকে সবুজ পাতা, লাইম গাছ থেকে হলদে। লাইমের হালকা পাতাগুলো লুটিয়ে বেড়াচ্ছিল রাস্তায় আর ফুটপাথে, পপলারের পাতাগুলো গাছের কাছেই পড়ে ছিল বৃত্ত রচনা করে।

সের্গেই মিত্রফানোভিচ হাঁটছিল ফুটপাথ দিয়ে, কানে আসছিল কিভাবে মুখরিত হলেও কেমন যেন চুপ করে যাওয়া শহরটায় জোরে ঠক ঠক শব্দ তুলছে তার কাঠের পা। হাঁটছিল সে ধীরে ধীরে, কাঠের পা-টা ফেলার চেষ্টা করছিল পাতাগুলোর ওপর, তাহলেও শব্দ চাপা পড়ছিল না।

প্রতি হেমন্তে বনঘেরা গ্রাম থেকে শহরে ডাক্তারি কমিশনের কাছে হাজিরা দেবার জন্য তার ডাক আসে, আর প্রতি বছরেই ক্ষোভ জমতে থাকে প্রাণের মধ্যে। ব্যাপারটা এতদূর পৌঁছল যে, চুয়াল্লিশ সাল থেকে এই নিষ্প্রয়োজন পরীক্ষাগুলো সহ্য

করে এলেও সের্গেই মিত্রফানোভিচ আজ হঠাৎ ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করে বসল:

'এখনো গজাল না?'

মাথা তুলে ডাক্তার অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে চাইল তার দিকে।

'কী বললেন?'

বহুকাল থেকে জমা রাগে চটে উঠে সের্গেই মিত্রফানোভিচ আরো জোরে পুনরুক্তি করলে:

'বলছি এই পা-টা, এখনো গজাল না?'

পাশের টেবিলে নার্স কার্ড পূরণ করছিল, মাথা ফিরিয়ে সে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে, তার সমস্ত হাবভাব দিয়ে বুঝিয়ে দিলে যে, এ জায়গাটায় গোলমাল করা নিষেধ, রোগী যদি নেশা টেশা করে বা স্রেফ এমনিই হল্লা করতে চায় তাহলে সে ০২ নম্বরে ফোন করে দেবে। মিলিসিয়ার লোকেরা আজকাল আর ভদ্রতা দেখাবে না, এক মুহূর্তেই সমঝে দেবে বাছাধনকে। আজকাল শান্তশিষ্ট হয়ে চলাই নিয়ম। কিন্তু লক্ষ করল যে, পঙ্গু লোকটা সঙ্গে সঙ্গেই মাথা নিচু করেছে, ভেবে পাচ্ছে না কোন দিকে তাকাবে, হাত দুখানা রাখবে কোথায়, তাই বিজয়ীর দৃষ্টিতে নার্স চোখ বুলিয়ে নিলে রিসিভিঙ হলটায় যার অবস্থাটা প্রায় একটা হাটের মতো।

'এবার পোষাক পরতে পারেন,' বললে ডাক্তার। চশমা খুলে স্মকের প্রান্ত দিয়ে কাচ ঘষতে লাগল।

সের্গেই মিত্রফানোভিচের কাঠের পা আর পোষাক ছিল কোণের দিকটায়। টেবলগুলোর মাঝখানে কার্পেটের পথ বিছানো, তার ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে যাবার সময় তার খালি প্যাণ্টটা লটপট করতে লাগল, ধাক্কা খেতে লাগল চেয়ারে আর কার্পেটে। কাঠের পাটা না থাকায় অসুবিধা

হচ্ছিল, ভারসাম্য হারিয়ে সের্গেই মিত্রফানোভিচের ভয় হচ্ছিল এই বুঝি কোনো টেবলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়বে, দোয়াত টোয়াত উল্টে গিয়ে কারো শাদা স্মক বা বার্নিশ করা টেবিলের ওপর কালি লেগে যাবে।

কোণটা পর্যন্ত নিরাপদেই পৌঁছল সে, চেয়ারে বসে হলঘরটার দিকে চেয়ে দেখলে। কমিশন নিজের কাজ করছিল। সের্গেই মিত্রফানোভিচ বুঝল যে, এ লোকগুলো সবই সামনাসামনিতে অভ্যস্ত, কেউ তার পেছনে উঁকি দেয় নি, শেষ যে ডাক্তারটি তাকে পরীক্ষা করলে, দ্রুত কী একটা সে লিখতে লাগল কাগজে।

পোষাক পরলে সের্গেই মিত্রফানোভিচ, কাঠের ঠ্যাঙটা লাগিয়ে এগিয়ে এল টেবিলের কাছে। ডাক্তার তখনো লিখছিল। এক মুহূর্ত থেমে, মাথা দিয়ে চেয়ারটার দিকে ইঙ্গিত করলে সে, এমন কি পা দিয়ে ঠেলে এগিয়েও দিলে। কিন্তু বসবার ইচ্ছে হল না সের্গেই মিত্রফানোভিচের। ধীর ভাবে সে অপেক্ষা করল। ইচ্ছে হচ্ছিল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে বেরিয়ে একটু সিগারেট টানে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে ভাবছিল যে বছর বছর কমিশনে পুরনো পরিচিত পঙ্গুদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে কম, মরে যাচ্ছে তারা, অথচ বিধানগুলোর নড়চড় নেই। আর এই ধরনের কমিশন, পরীক্ষা, কাগজপত্র নিয়ে হাঁটাহাঁটি, নানা ধরনের কিউয়ে অপেক্ষা করে করে এমনিতেই কমে যাওয়া আয়ু থেকে কত দিনই না লোকসান যাচ্ছে...

ডাক্তার পূর্ণচ্ছেদ টানলে, ছাত্রসুলভ নীল ব্লটিং প্যাডটা দিয়ে চাপ দিলে লেখার ওপর, তারপর চোখ তুললে।

'দাঁড়িয়ে আছেন যে?' বলেই মাপ চাওয়ার ভঙ্গিতে গোপনতার সুরে বিড়বিড় করলে, 'যত লেখা আর লেখা!..'

সের্গেই মিত্রফানোভিচ শহরে আসা উপলক্ষে যে নতুন টুপিটা এনেছিল, অপ্রস্তুতের মতো সেটা বগলে চেপে কাগজটা নিয়ে চার ভাঁজ করে রাখলে মনিব্যাগে। তারপর টুপিটা পরলে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাড়াতাড়ি করে সেটা ফের খুলে অভিবাদন জানাল নীরবে।

ফাঁকা ফাঁকা দাঁতে হেসে প্রত্যভিবাদন দিলে ডাক্তার, হাত নাড়লে, যেন বলতে চাইল, আমি কী করতে পারি? আইন যে এই। ক্লিষ্টের মতো হাসল সের্গেই মিত্রফানোভিচ তারপর যেন সহানুভূতি দেখিয়েই মস্ত একটা দীর্ঘ শ্বাস ফেলে বেরিয়ে গেল হল থেকে, এই ভেবে আনন্দ হল যে অন্তত আগামী হেমন্ত পর্যন্ত সব চুকল।

আর পরের বছরটা সব সময়ই মনে হয় ঢের দূরে।

রাস্তায় এসে সে সিগারেট ধরালে। জোরে টান দিতেই ছ্যাঁকা লাগল, নিজেকেই ভর্ৎসনা করলে সে, 'গলা যখন চড়ালি, তখন ছাড়িস না! আইনে আছে! তাহলে তুই, আরেকজন, আরেকজন, সবাই মিলে একসঙ্গে গিয়ে যেখানে বলা দরকার সেখানে বল, আইন পাল্টে নে। আইন তোমার কি পাথরে গড়া। পাহাড়ও ক্ষয়ে যায়...'

স্টেশনে যাবার পথে ও দোকানে ঢুকল, স্বচ্ছ প্যাকেটে মোড়া পীচ ফল কিনলে তিনটে, তারপর এল 'স্পুৎনিক' কাফেতে, দু' ডিশ সসেজ আর এক গেলাস জেলির সরবৎ নিয়ে বসলে মাকড়সার জালের নক্সা-কাটা একটা কোণে, টেবিলটায় ওয়েলক্লথ না থাকলেও বেশ পরিষ্কার আর মসৃণ।

একই টেবিলে বসেছিল আলুথালু একটি মেয়ে, সেও সসেজ খাচ্ছিল আর পড়ে যাচ্ছিল রেখা, ত্রিভুজ, নানা রকম চিহ্ন আর অরুশ অক্ষরে ভরা একটা মোটা বই। পড়ছিল সে নিবিষ্ট মনে আর সেই সঙ্গেই মাস্টার্ড মাখাচ্ছিল সসেজে,

ছুরি কাঁটা চালাচ্ছিল, চা খাচ্ছিল, অথচ কিছুই তার ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছিল না।

'ঈস, কায়দা আছে বটে!' অবাক হল সের্গেই মিত্রফানোভিচ।

সিলিঙ থেকে ঝুলছিল ডোরাকাটা বাতি। দেয়ালগুলো নীল, সেই নীলের মধ্যেও নানা রকম ডোরা, জানলায় হালকা পর্দা, তাও ডোরাকাটা। চারিদিকেই একটা নীলাভ গোধূলি, পর্দাগুলো বাতাসে কাঁপছে, ভেসে আসছে রান্নাঘরের ভাপ।

'চমৎকার, দেখবার মতো।' ভাবলে সের্গেই মিত্রফানোভিচ, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললে:

'তৃপ্তি করে খাও মেয়ে।'

বই ছেড়ে মেয়েটি অন্যমনস্কের মতো তাকাল তার দিকে:

'ওহ, হ্যাঁ হ্যাঁ, ধন্যবাদ,' বলে যোগ দিলে, 'কুশল হোক আপনার!' এবং সঙ্গে সঙ্গেই ফাঁকা ডিশে কাঁটা নাড়তে নাড়তে মুখ গুঁজলে বইয়ে।

কাফের দরজাটা কাঁচের, একটু সংকীর্ণ। একই রকমের পাতলা রঙের কোট পরা দুজন ছোকরা—হেমন্তের আবহাওয়ার পক্ষে যা হালকা, দরজা খুলে দিলে তার জন্যে। শশব্যস্তে তাড়াতাড়ি করে বেরিয়ে এল সের্গেই মিত্রফানোভিচ, ধন্যবাদ দেওয়ারও ফুরসুৎ হল না।

আর রাস্তায় কেবলি ঘুরপাক খাচ্ছে পাতা। ছুটে যাচ্ছে নীরব মোটরগাড়ি। আলগোছে যাচ্ছে ট্রলিবাস, গরমকালের মতোই তার জানলাগুলো এখনো খোলা, স্কুল থেকে আসছে ছেলেমেয়েরা, স্কুলের ইউনিফর্ম তাদের এখনো দলা-মোচড়া হয়ে ওঠে নি।

ক্লান্ত হয়ে স্টেশনে পেঁছিল সের্গেই মিত্রফানোভিচ, টিকিট কিনলে, জগদ্দল একটা বেঞ্চিতে বসে অপেক্ষা করতে লাগল ট্রেনের।

শহরতলির একটা ট্রেন থেকে নামল একদল ছেলেমেয়ে। সবারই পরনে প্যাণ্ট, একই রকম বিদেশী কাটের কুর্তা, সবারই চুল ছোটো করে ছাঁটা, চট করেই বোঝা যায় না কোনটা ছেলে কোনটা মেয়ে। কারো ঝুড়িতে গোটা দশেক ব্যাঙের ছাতা, কারো কম। তবে সবারই কাছে একরাশ করে অ্যাশবেরি ডাল, বার্ড-চেরি খেয়ে খেয়ে সবারই মুখ কালচে। হুড়মুড়িয়ে সবাই জুটল আইসক্রীমের দোকানে।

'আমিও আইসক্রীম কিনব নাকি? নাকি একটু মদটদ খাব?' ভাবল সের্গেই মিত্রফানোভিচ, কিন্তু আইসক্রীম খেতে ভয় হল ওর, টনসিলাইটিসে খুব ভোগাচ্ছে।

'যুদ্ধ, মিত্রফানোভিচ, যুদ্ধ তোমার উপর চেপে রয়েছে,' বলত ওর বৌ। বৌয়ের কথা মনে হতেই বরাবরের মতো তার প্রাণটা একটু নরম হয়ে এল, লোকের অলক্ষ্যে সে কোটের পকেটটা ছুঁয়ে দেখলে। পানিয়া, তার বৌ, যে কোনো উপহার পেলেই খুশি হয়। এটা আবার পীচ ফল! জন্মে কখনো খায় নি। বলবে, 'কী কাণ্ড, সাগর পার থেকে চালান এসেছে নিশ্চয়।' লুকিয়ে রাখবে ফলগুলোকে, তারপর তাকেই খাওয়াবে।

লোক হতে লাগল স্টেশনে। বয়স্ক একজন ক্যাপটেনের নেতৃত্বে ছাঁটা মাথা একদল ছোকরা আর একদল মেয়ে দখল করে বসল সমস্ত ফাঁকা বেঞ্চিগুলো। তাতেও সবার কুলাল না, সের্গেই মিত্রফানোভিচ বেঞ্চির এক পাশে সরে গিয়ে জায়গা করে দিলে খানিকটা।

বেঞ্চির ওপর একটা শীর্ণ ন্যাপস্যাক রাখলে ছোকরা, ফিতে বাঁধা একটা স্পোর্ট থলি, স্ট্র্যাপ বাঁধা একটা ব্যাগ। অনেকটা জার্মান ন্যাপস্যাকের মতো, শুধু জিনিস ধরবে কম, আর গায়ে রঙচঙে সব ছবি সাঁটা।

সেগেঁই মিত্রফানোভিচের কাছে বসলে তিনটি ছোকরা। একজন যেন দেবদারু গাছ কুঁদে গড়া, পরনে পশমের স্পোর্টস্ কস্টিউম। দ্বিতীয় জন যেন ডিমের কুসুম: গোলগাল, জ্বলজ্বলে। সব সময় সে মাথা ঝাঁকাচ্ছিল, হাত দিয়ে তা এমন ভাবে চেপে ধরছিল যেন সামনের ঝুঁটিটা ছেঁটে ফেলা হয় নি। তৃতীয় জন একটু বেঁটে, ঢিপ মাথা, শান্তশিষ্ট। পরনে তার ছেয়ে রঙের হিচ-হাইকিং পোষাক। তার সঙ্গে পাশ-কাটা খাটো স্কার্ট-পরা কোঁকড়াচুলো একটি মেয়ে।

পরে বোঝা গেল, প্রথমটির নাম ভলোদিয়া, হাতে গিটার, সেই দলের পাণ্ডা। তার সঙ্গেও মেয়ে এসেছিল একটি, বেশ হৃষ্টপুষ্ট, পরনে নীল স্ল্যাকস্, গায়ে একটা মোটা সোয়েটার, উরুর মাঝামাঝি পর্যন্ত তা নেমে এসেছে, সোয়েটারের গোল কলারের ওপর পড়েছে ব্লীচ-করা মসৃণ ভাবে আঁচড়ানো চুল। পাটকিলে চুলের যে ছেলেটাকে সবাই ডাকছিল ইয়েস্কা, আর সে নিজে দাবি করছিল তাকে ইয়েভ্সেই বলে ডাকা হোক, তার সঙ্গে এক দফাতেই এল চারটি মেয়ে। চুলের রঙ দেখে মনে হয়, একজন তাদের ইয়েস্কার বোন, বাকিরা তার বান্ধবী। ইয়েস্কার বোনকে সবাই ডাকছিল 'ট্র্যানজিস্টর' বলে, নিশ্চয় খুব বকবক করে। তৃতীয় ছোকরার নাম জানতে কোনো মুশকিল হল না। পাতলা গোলাপী জামা-পরা কোঁকড়াচুলো মেয়েটি তাকে কারণে অকারণেই ডাকছিল, 'স্লাভিক... স্লাভিক!'

দেখে মনে হয় এরা এসেছে কোনো একই পাড়া থেকে, কিংবা হয়ত টেকনিক্যাল কলেজের একই ক্লাস থেকে। এদের মধ্যে ঘোরাঘুরি করছিল উটকো একটা ছেলে, মাথায় চেক-কাটা টুপি, শার্টের কাফ'এ পেতলের বোতাম। তাছাড়া ছিল সিঁদুর-রঙা একটি মাফলার, তার একটা প্রান্ত পিঠের দিকে

ফেলা। মুখের ভাব ওর চঞ্চল, দৃষ্টি প্রখর, জ্বলজ্বলে, সের্গেই মিত্রফানোভিচ সঙ্গে সঙ্গেই স্থির করলে, এটি হাড়-বখাটে, কেন জানি এরকম একটি চিজ ছাড়া কোনো রুশী দলই গড়ে ওঠে না।

ক্যাপটেন দলটাকে এনেই দূরের বেঞ্চিটায় চুপ করে বসে রইল, এখান থেকে সে সবাইকে দেখতে পাবে, কিন্তু সে নিজে থাকবে অলক্ষ্যে।

ছেলেদের বিদায় জানাতে মা-বাপেরা স্টেশনে এসেছিল কম, বিহ্বলের মতো তারা ঘেঁষে ঘেঁষে দাঁড়াচ্ছিল কোণগুলোয়, চুপচাপ চোখের জল ফেলছিল, আর ছোকরাগুলো খুব টেনে না এলেও ভাব করছিল হট্টগোলে বেপরোয়ার মতো।

'সৈন্য তালিমির জন্যে যাচ্ছ বুঝি?' একটু আগ্রহী হয়ে উঠল সের্গেই মিত্রফানোভিচ।

'হ্যাঁ, তাই বটে, রিক্রুট!' সবার হয়ে জবাব দিল ইয়েস্কা-ইয়েভ্সেই, তারপর গিটার-ওয়ালা ছোকরাটাকে ইশারা করলে, 'ভলোদিয়া, লাগা এবার!'

গিটারের সবকটা তারে পাঁচ আঙুলের ঘা মারলে ভলোদিয়া, আর মেয়েগুলোর সঙ্গে পাটকিলে-চুল গেয়ে উঠল:

কেলে বেড়াল কালচে বটে!
জীবনে সব উল্টো ঘটে!
শুধু কেলে বিল্লির কপাল খট্খটে!..

সমস্ত স্টেশন একসঙ্গে ধুয়া ধরল:

শুধু কেলে বিল্লির কপাল খট্খটে!..

'পোড়ার মুখো সব!' মাথা দোলালে সের্গেই মিত্রফানোভিচ। গাইল না শুধু স্লাভিক আর তার সঙ্গিনী। দোষী-দোষী

ভাব করে সে হাসছিল, আর তার কোটের তলে ঢুকে গা ঘেঁষে রইল মেয়েটা।

'কেলে বেড়ালের' গানে মা-বাপেরাও গলা মিলিয়েছিল, একটু বাঁকা হাসিতে অবশ্য, কিন্তু 'আজকের এই শেষ দিন' গানটি তেমন করে কেউ গাইলে না। অ্যাকর্ডিয়ন ছিল না। যুদ্ধের আগের কালে বিদায় দেবার সময় মেয়েরা যেভাবে গাইত, মেয়ের দল সেভাবে গাইলে না কেউ, নিজের গায়ের জামা ছিঁড়ে যে কোনো শত্রু বা অন্তর্ঘাতককে চূর্ণ করার হুমকি দিলে না রিক্রুটেরা।

'বেড়াল' থেকে ওরা কী একটা বিদঘুটে গা-ঝাঁকুনিতে চলে এল। আত্মহারার মতো গিটারে ঝঙ্কার তুললে ভলোদিয়া, আর ছেলেমেয়েগুলো নাচতে লাগল:

চিক-চিক, চা-চা-চা!
চিক-চিক, চা-চা-চা!..

কথাগুলো তো দুর্বোধ্যই, সুরটাও কিছুতেই ধরতে পারা গেল না। কিন্তু গানটায় বেশ রস পাচ্ছিল ছেলেমেয়েগুলো। হাসাহাসি করছিল তারা, চেঁচাচ্ছিল, গা ঝাঁকাচ্ছিল, এমন কি ভলোদিয়ার সঙ্গিনীও জুতো ঠেকাঠুকি করতে লাগল, আর তার কাচের মতো ব্লীচ-করা চুলের গোছা যখন চোখের ওপর এসে পড়ল তখন অধৈর্যে তা মাথা ঝাঁকিয়ে সে সরিয়ে দিলে কাঁধে।

হাঁটুর ওপর খবরের কাগজ বিছিয়ে রুটির সঙ্গে টম্যাটো খাচ্ছিল ক্যাপটেন, কিছুতেই তার কোনো বিকার দেখা গেল না। ছোকরাগুলো যখন এক বোতল ভোদকা বার করে বোতল থেকেই তা খেতে শুরু করলে, তখনো পর্যন্ত ধমক দিলে না সে। প্রথমে অবশ্য শুরু করেছিল ওই চেক-কাটা

টুপি-পরা ছেলেটা। সোজাসুজি বোতলের মুখ থেকে খাবার অভ্যেস ছিল শুধু ওর, অন্যগুলো বেশির ভাগ ফাজলামি করছিল, বড়ো বড়ো করছিল চোখ, ভোদকা ঝাঁকাচ্ছিল বোতলে। ইয়েস্‌কা-ইয়েভ্‌সেই মুখে বোতল তোলার পরই ছুটে গেল স্টেশনের ডাস্টবিনের দিকে, আর এক ঢোক খেতেই জল গড়িয়ে এল স্লাভিকের চোখ থেকে। চটে উঠে সে বোতলটা গুঁজতে লাগল তার সঙ্গিনীর হাতে।

'নাও!' (মেয়েটি তার দিকে প্রভুভক্ত কুকুরের দৃষ্টিতে চাইলে, বুঝতে পারছিল না কী তাকে করতে বলা হচ্ছে)। 'নাও,' অন্ধের মতো স্লাভিক বোতলটা ঠেলতে লাগল তার দিকে।

'কী বলছ স্লাভিক!.. তুমি তো জানো...' তোতলাতে লাগল মেয়েটি, 'আমি গেলাস ছাড়া পারব না।'

'মহিলার গেলাস দরকার!' ধূসর মুখ থেকে চোখের জল মুছে ছুটে এল ইয়েস্‌কা-ইয়েভ্‌সেই। 'নে বার কর,' হুকুম করলে সে চেক-কাটা টুপি-পরা ছেলেটাকে।

বাধ্যের মতো ছেলেটা ইয়েস্‌কা-ইয়েভ্‌সেইর ন্যাপস্যাক থেকে শাদা একটা মুখ বন্ধ কাপের মতো বার করলে, ঢাকনিতে তার লালচে-গাল এক মেয়ের ছবি আঁকা। জিনিসটা 'ভিওলা' পনীর, ছবিটা যেন কার মতো দেখতে, অথবা কেউ যেন ছবিটার মতো দেখতে। সেগেই মিত্রফানোভিচ তাকিয়ে দেখলে, চোখ পড়ল ভলোদিয়ার সঙ্গিনীর ওপর, 'ঠিক ছবিটার মতোই দেখতে!'

'পনীরটা খেয়ে নে!' হুকুম দিল ইয়েস্‌কা-ইয়েভ্‌সেই, 'আর কাপটা দিয়ে দে মহিলাকে। কেননা উনি...'

গেলাস ছাড়া খেতে পারেন না!

ধুয়ো ধরলে ছেলেগুলো। কী গাইছে, কী ভাবে গাইছে, কিছুতেই ওদের আসে যায় না।

গিটার বাজাচ্ছিল ভলোদিয়া, কিন্তু নিজের ফুর্তিটা সে যেন ফোটাচ্ছিল একটু জোর করে, ভাব করছিল যেন তার সঙ্গিনী সম্পর্কে উদাসীন, তাহলেও চোখ তার থেকে থেকেই ওর ওপর পড়ছিল, সঙ্গে সঙ্গেই আবার নিস্পৃহতা ফুটিয়ে তুলছিল মুখে।

'খাসা-া-া,' আঙুল দিয়ে পনীর চুষতে চুষতে চেঁচিয়ে উঠল বখাটে-টা, সেই সঙ্গে একটা খিস্তি জুড়লে।

'দাঁড়া! তোকে...' ঝট করে তার দিকে ফিরল স্লাভিক।

'স্লাভিক! স্লাভিক!' স্লাভিকের পাঁজরায় কনুইয়ের গুঁতো দিলে তার সঙ্গিনী, সেও মুখ ফিরিয়ে দেখল, ক্যাপটেন ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে তারই দিকে।

'লে লুল্লু! লে লুল্লু!' চেঁচিয়ে উঠল ছোকরা, যেন স্লাভিকের কথা তার কানেই যায় নি, 'এই যে পনীর, হা-হা...' সবার আগে হেসে হেসে বলতে লাগল সে, 'পাঠানো হয়েছিল প্রসূতি-ভবনে। আর পোয়াতী সব বৌমারা দেখে ঢাকনির ওপর লালচে-গাল সুন্দরী... বাস্, মাখতে লাগল গালে... ভেবেছিল বুঝি ক্রী-ীম!'

খিলখিলিয়ে হাসল মেয়েরা, এমন কি ভলোদিয়ার সঙ্গিনীও হি-হি করে উঠল।

'আর তুই? প্রসূতি-সদনে তুই নিজে কী করছিলি?' হাসির মধ্যেই খোঁচা দিয়ে জিজ্ঞেস করলে ইয়েস্কা-ইয়েভ্সেই।

'জানিস তো,' মাটির দিকে চোখ নামিয়ে মাফলারের ঝালরগুলো পাকাতে লাগল ছোকরা, 'পেট খসাচ্ছিলাম!'

একসঙ্গেই চুপ করে গেল মেয়েরা, লাল হয়ে মুখ ফেরালে, স্লাভিক রুখে রুখে উঠে দাঁড়াল, কিন্তু তার কোটের ঝুলটা চেপে ধরল তার সঙ্গিনী।

'স্লাভিক! এই স্লাভিক! ও যে ঠাট্টা করছে!..'

ফের বাঘের মতো বসে পড়ল স্লাভিক, সঙ্গিনীর মাথার ওপর দিয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে ওপরে, মেয়েটিও চটপট তার কোটের ভেতর ঢুকে পড়ল, যেন ওটা পাখির ডানা।

পনীরের কাপটা ইতিমধ্যে শূন্য হয়ে গিয়েছিল, গেলাস হিশেবে তা ফিরতে লাগল হাতে হাতে।

আধ কাপ ভোদকা খেলে ভলোদিয়া, কামড় দিলে চকোলেটে, ইয়েস্কার আগুন-রঙা বোনটি তা গুঁজে দিয়েছিল সময় মতো। তারপর কাপটা ভলোদিয়া ধরলে তার সঙ্গিনীর নাকের কাছে।

'তুমি তো জানো, আমি ভোদকা খেতে পারি না,' ন্যাকার মতো নাক কোঁচকালে মেয়েটি।

কাপটা বাড়িয়েই ধরে রাখল ভলোদিয়া, গাল ওর ক্রমশ শক্ত হয়ে উঠল, কালো টানা ভুরু ওর কুঁচকিয়ে উঠল নাকের কাছে।

'সত্যি বলছি ভলোদিয়া... পাইওনিয়রী শপথ করছি...'

কাপ কিন্তু সরালে না ভলোদিয়া, দুটি সুচারু আঙুলে কাপটা নিলে মেয়েটি।

'তুমি ভারি ইয়ে! আমার যে সহ্য হবে না...'

তাতে কোনো সাড়া দিলে না ভলোদিয়া। রাগত ভাবে মেয়েটি তার রঙ-করা মুখের ভেতর ভোদকাটা ঢেলে দিলে। সমস্বরে হাততালি দিয়ে উঠল মেয়েরা। চকোলেটের বাকি টুকরোটা ভলোদিয়া ছিপি গোঁজার মতো করে গুঁজে দিলে তার সঙ্গিনীর খোলা মুখে। তারপর ক্ষেপার মতো গিটার বাজাতে লাগল।

'হারে ছোকরা, ব্যাপার তোর সুবিধের নয় দেখছি...' সেগেই মিত্রফানোভিচের আস্তিন ধরে কে যেন টানলে। স্লাভিকের সঙ্গিনী তার কাছে কাপটা নিয়ে এল।

'আমাদের ছেলেগুলোর জন্যে একটু খান... আর সবকিছুর জন্যে, সবকিছু!' বলে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে সে কাটা গাছের মতো টলে পড়ল স্লাভিকের বুকে।

স্লাভিক তাকে তার কোটের তলে ঢেকে নিলে, তারপর সবকিছু ভুলে কী একটা গুনগুন করে দোলা দিতে লাগল তাকে।

'হারে আমার টুনটুনি!' উঠে দাঁড়াল সের্গেই মিত্রফানোভিচ, টুপিটা খুলে তা বেঞ্চিতে রাখল।

ভলোদিয়া চেপে ধরল তার গিটারের তারগুলো। দুই হাত দিয়ে ইয়েস্‌কা-ইয়েভ্‌সেই জড়িয়ে ধরল তার বোন আর তার সবকটি বান্ধবীকে। অমন ধারা ছেলেরা সব সময় সকলের সঙ্গেই বন্ধুত্ব করে, তবে ট্যাঁকসই তো নয়। আসবে, সময় আসবে, ইয়েস্‌কা-ইয়েভ্‌সেইকে বগলদাবা করবে কোনো ডাকসাইটে মেয়ে, তারপর সারা জীবন ধরে ঘ্যান ঘ্যান করবে যে তাকে উচ্ছৃঙ্খলতা আর সর্বনাশ থেকে বাঁচিয়েছে সেই।

'তা বেশ ভায়ারা,' শুরু করলে সের্গেই মিত্রফানোভিচ, একটু কাসলে, 'তা বেশ ভায়ারা... ছেলেপিলেরা যেন বাজকে না ডরায়, কী বলো তাই তো?..' তারপর জোর করে ভোদকা খেলে কাপটা থেকে, শাদা শাদা পনীরের টুকরো ভাসছিল তাতে। এমন কি একটু গলা খাঁকারিও সে দিলে যেন সুরার তৃপ্তিতে; তা দেখে উল্লাস করে উঠলে উটকো ছেলেটা।

'এ্যাই! এই না! এই হল যোদ্ধা!' চেঁচিয়ে উঠল ছেলেটা, তারপর অন্তরঙ্গের মতো দেখাল কাঠের পা-টার দিকে, 'তা পা-টা কোথায় গেল?'

'যুদ্ধে, ছেলেরা, যুদ্ধে,' বললে সের্গেই মিত্রফানোভিচ।

কোথায় কেমন করে তার পা কাটা গেছে সেটা বলতে

ভালো লাগত না তার, তাই যখন ট্রেন আসার ঘোষণা হল, তখন খুশি হয়ে উঠল সে, পায়ের প্রসঙ্গ আপনা থেকেই থেমে গেল।

দূরের বেঞ্চিটা থেকে উঠে দাঁড়াল ক্যাপটেন, হুকুম দিলে তাকে অনুসরণ করতে।

'আপনিও আমাদের লগে আয়েন বাপজান,' চ্যাঁচাল ইয়েস্‌কা-ইয়েভ্‌সেই, 'জমবে নে ভালো,' উরাল অঞ্চলের বুলি ব্যবহার করে ঢঙ করছিল সে, 'পিতা পুত্র—বর্তমান সাহিত্যে যা বলে, কোনো সংঘাত নেই তাদের মধ্যে...'

'শিক্ষিত নচ্ছার! বুলির জোর আছে! আমাদের ইউক্রেনী সার্জেণ্ট-মেজর অমন ছেলেদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারত না। শুধু রঙ্গ রসিকতা করেই দফা রফা করত...'

রেখো, মনে রেখো,
পথ চেয়ে থেকো,
পথ চেয়ে থেকো, পথ চেয়ে থেকো...

এবার যেমন উচিত, রঙঢঙ না করেই গানটা গাইছিল ওরা, আর তাদের পেছন পেছন চলল সের্গেই মিত্রফানোভিচ। সবাই চলল বাহুলগ্ন হয়ে। শুধু ভলোদিয়ার সঙ্গিনী ফিতে-বাঁধা স্পোর্টস থলিটা দোলাতে দোলাতে পর পর ভাব করে ধীরে পা চালাচ্ছিল একটু দূরে, মিত্রফানোভিচের মনে হল শোভনতায় না বাধলে সে সানন্দেই ওয়াগন পর্যন্ত যেত না, তাড়াতাড়ি বিদায় নিত।

গিটারে প্রায় ঘুষি মারছিল ভলোদিয়া, সঙ্গিনীর দিকে নজরই করলে না।

প্ল্যাটফর্মে একটা কিওস্ক দেখে কাঠের পা ঠকঠক করে এগিয়ে গেল সের্গেই মিত্রফানোভিচ।

'যাচ্ছেন কোথায়?' চেঁচিয়ে উঠল ইয়েস্‌কা-ইয়েভ্‌সেই, বাকি সবাইও দাঁড়িয়ে পড়ল।

গুঁই গুঁই করলে সের্গেই মিত্রফানোভিচ যেন বলতে চায়, আরে বাপু চলো, চলো, আমি এখুনি আসছি।

কিওস্ক থেকে সে দু' বোতল বিদেশী ভেরমুথ কিনলে, শ্যাম্পেন ছাড়া আর কোনো মদ দোকানটায় ছিল না, কিন্তু শ্যাম্পেনের পেছনে টাকা খরচ করা তার মনে হল বেফায়দা হবে।

গাড়িতে উঠল সে। ধোঁয়া, হৈচৈ, গান আর হাসাহাসিতে থতমত খেয়ে গেল, কিন্তু ওর মধ্যেই ক্যাপটেনকে দেখতে পেল সে, ভূতপূর্ব সৈনিকের তাতে সুস্থিরতা ফিরে এল। ওয়াগনে যেখানে সামোভারে জল গরম হয়, সেখানে বসে ছিল ক্যাপটেন, খবরের কাগজটা নাড়াচাড়া করে ফের সে তাকিয়ে দেখল গোটা গাড়িটা।

'সৈনিকের দোস্তি ভাঙবার নয়!' দরজার কাছে মদের গেলাস ঠোকাঠুকি করে হাঁক দিলে এক ছোকরা, মাথার চুল তার ছোটো করে ছাঁটা।

'ভাঙবার নয়, চলেও লম্বা মেয়াদে!'

'ওহো, চুমু খাওয়া হচ্ছে। রাত চলে যায়! কী বলো?' সঙ্গে সঙ্গেই সবাই গেয়ে উঠল মন-ছোঁওয়া পুরনো গানটা:

রাত চলে যায়
তারারা ঘুমায়...

'সৈন্যের কাজ কেমন তা তোমরা কেউ জানো না বাছারা,' আপন মনে সামান্য হাসল সের্গেই মিত্রফানোভিচ, 'কিছুই জানো না। দাঁড়াও না, ছাউনিতে পৌঁছও আগে। এই ক্যাপটেনটি এখানে তোমাদের খুবই স্বাধীনতা দিচ্ছে।

কিন্তু ওখানে ইস্কুপ টাইট দেবে; একেবারে শেষ খাঁজটি পর্যন্ত!'

ফ্রন্টের পুরনো গানটা তাকে আকুল করে তুলছিল, পাছে পুরোপুরি বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, তাই তাড়াতাড়ি করে সে ডাক দিলে:

'ভলোদিয়া, ইয়েস্‌কা, স্লাভিক, কোথায় তোমরা?' দাঁড়িয়ে পড়ে কান পেতে সে এমন ভাবে ডাক দিলে যেন বনে কাউকে খুঁজছে।

'এইখানে, এইখানে!' সাড়া এল ওয়াগনের মাঝখান থেকে।

'আর আমার রাধা-টি নেই ওখানে?' ভিড়াক্রান্ত কুপে'র ভেতর ঢুকতে ঢুকতে জিজ্ঞেস করলে সে।

'আপনারটি দুঃখের বিষয় নেই,' সাড়া দিলে ভলোদিয়া। আরো মুখ গোমড়া হয়ে উঠেছে তার, বদমেজাজ চাপার চেষ্টাও করছিল না।

'এই নাও হে সৈন্যেরা। এটা আমি দিচ্ছি, বিদায় উপলক্ষে...' বেঞ্চির ওপর ঠক করে বোতলটা নামাল সের্গেই মিত্রফানোভিচ।

'মিছি মিছি কেন পয়সা খরচ করতে গেলেন?' সমস্বরে প্রতিবাদ করে উঠল ছেলেমেয়েরা, শুধু ওই উটকো ছোকরাটা বাদে। বলাই বাহুল্য সে আগে ভাগেই জায়গা করে নিয়েছে জানলার পাশে, আরো দু'এক ঢোক চালিয়েছে, টুপিটা নেমে এসেছে একেবারে চোখের ওপর, হুকে ঝুলছে মাফলারটা— এ সিটে যে লোক আছে এটা তারই জানানি।

'তোফা!' অনুমোদন করে উঠল সে সের্গেই মিত্রফানোভিচের কাণ্ডটা, খপ করে তুলে নিলে বোতলটা, 'এক্ষুনি ব্যবস্থা করছি!..'

'কার কাছে কর্ক-স্ক্রু আছে?' গোলমাল ছাপিয়ে চেঁচিয়ে উঠল ইয়েস্‌কার বোন।

'কী দরকার তাতে! যত সব পুরনো অভ্যেস!' চোখ মটকালে তুখোড় ছোকরা, কাঠবেড়ালির বাদাম ভাঙার মতো করে দাঁত দিয়ে ওপরকার সোনালী রাঙতাটা ছিঁড়লে, তারপর আঙুলে টিপে ভেতরে ঢুকিয়ে দিলে কর্কটা।

আত্মসন্তুষ্টির সঙ্গে সে তাকালে গোটা দলটার দিকে, চোখ টিপলে ইয়েস্‌কার বোনকে। মেয়েটির সঙ্গে জমাতে চাইছিল সে, মেয়েটি কিন্তু তাচ্ছিল্য না চেপেই সরে থাকছিল দূরে। তা সত্ত্বেও যখন সে কায়দা করে এসে তার গায়ে হাত দিচ্ছিল, তখন মুখ ঝামটা দিচ্ছিল মেয়েটা: 'সরাও তো তোমার নোংরা হাতটা।'

হাত সে সরাচ্ছিল বটে, কিন্তু তার কথায় কোনো গুরুত্ব দিচ্ছিল না, যেন অনবধানে ব্যাপারটা হচ্ছে এই ভাব করে ফের হাত রাখছিল কখনো তার হাঁটুতে, কখনো আরো ওপরে। মেয়েটি উঠে গিয়ে অন্য জায়গায় বসলে।

প্ল্যাটফর্মে ঘোষণা হল: 'চুয়ান্ন নম্বর ট্রেন ছাড়তে পাঁচ মিনিট বাকি। প্যাসেঞ্জারদের কাছে অনুরোধ...'

সঙ্গে সঙ্গেই লাফিয়ে ওঠা ছেলেমেয়েগুলোর ধাক্কায় পাশে সরে গেল সের্গেই মিত্রফানোভিচ আর টুপি-পরা ছেলেটা। ইয়েস্‌কা-ইয়েভ্‌সেই তার বোন আর বান্ধবীদের জড়িয়ে ধরল। কাঁদছিল ওরা, হাসছিল, ইয়েস্‌কা-ইয়েভ্‌সেই-ও কাঁদলে হাসলে। গোলাপী জামা-পরা মেয়েটি একেবারে মরণ আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরলে স্লাভিককে, ঝুলতে লাগল তার গায়ের সঙ্গে, যেন কিছুতেই তাকে ছেড়ে দেবে না। তার ভেজা মুখের ওপর দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল ছেলেমানুষের মতো বড়ো বড়ো জলের ফোঁটা, ছেয়ে রঙের দাগ ধরিয়ে দিলে জামাটায়। বাঁকা চোখের জলে ধুয়ে যাচ্ছিল কাজল।

'চুপ করো, ছি, কাঁদো না,' বসে যাওয়া গলায় বললে

স্লাভিক, ওকে সুস্থির করার জন্যে সে ঝাঁকুনি দিচ্ছিল কাঁধে, 'কথা দিয়েছিলে, কাঁদবে না...'

'বে-শ, কাঁদ... ঠিক আ-আছে...'

'কাণ্ড বটে,' খুক খুক করে উঠল দল-ছাড়া টুপি পরা ছেলেটা, 'ভিজিয়ে ছাড়বে দেখছি...'

সেগেই মিত্রফানোভিচ তার কথা শুনছিল না, দেখছিল ভলোদিয়া আর তার সঙ্গিনীকে, কষ্ট হল তার ভলোদিয়ার জন্যে।

'ভালো করে খেটো ভলোদিয়া, দেশ রক্ষা করো,' ভলোদিয়ার গালের কাছে তার রঙ-করা ঠোঁট এগিয়ে বললে মেয়েটি, বুঝতে পারছিল না আর কী করবে। ঘন ঘন ঝটকা মেরে সরিয়ে দিচ্ছিল তার শাদা চুল।

ওপরের বার্থে হাত রেখে জানলার দিকে তাকালে ভলোদিয়া, কিছুই বললে না।

'ইচ্ছে হলে চিঠি লিখো ভলোদিয়া,' বলে দরজায় ভিড় করা জনতার দিকে সে ফিরল, 'ইস, গোলমাল কী! আর চারিদিক থেকে কেবল কাঁচি মদের গন্ধ!..'

'বাস, চলো!' অবশেষে বললে ভলোদিয়া, সঙ্গিনীকে সে দরজার দিকে নিয়ে যেতে যেতে ঘাড় ফিরিয়ে হাঁক দিলে, 'বাস!'

সঙ্গিনীদের নিয়ে ছেলেরা নামল ওয়াগন থেকে, স্লাভিকের মেয়েটি কিন্তু হঠাৎ বসে পড়ল বেঞ্চিতে।

'যা-ব-না আ-মি!'

'সে কী? মাথা খারাপ হল,' চিলের মতো রুখে এল স্লাভিক, 'মুখে চুনকালি দেবে! তাই চাও?'

'দি-ই-ক...'

'নটঘট করে বসেছে! একেবারে নির্ঘাৎ!' সিটের ওপর

ছটফট করে উঠল ছোকরাটা, 'বাড়ি ফিরে স্লাভিক দেখবি, কোলে খোকা-সৈন্য, নয়ত খুকি!..'

'যাও মা, যাও,' একেবারে নেতিয়ে পড়া মেয়েটির কাঁধে হাত রাখলে সের্গেই মিত্রফানোভিচ, 'নেমে যাও মা, ভালো মনে বিদায় দিতে চেষ্টা করো... সময় তো আর নেই, পরে পস্তাবে...'

কৃতার্থের মতো স্লাভিক চাইলে সের্গেই মিত্রফানোভিচের দিকে, তারপর রোগীকে নিয়ে যাওয়ার মতো করে নিয়ে গেল সঙ্গিনীকে।

'বরাবর কেবল এই ব্যাপার, একই ব্যাপার,' হাত জড়ো করে বিষণ্ণ মনে ভাবলে সের্গেই মিত্রফানোভিচ, 'বিচ্ছেদ আর কান্না, বিচ্ছেদ আর কান্না...'

'এক ঢোক হয়ে যাবে নাকি, ওরা আসতে আসতে,' বললে টুপি-পরা ছোকরাটা, নিঃসঙ্গতায় পীড়া বোধ করছিল সে, শীতার্তের মতো হাত ঘসলে।

'খেতে হয় সবাই মিলে খাব।'

গাড়ি ছেড়ে দিলে। ছুটে এল স্লাভিক, টেবলটার ওপর ভর দিয়ে জানলার সংকীর্ণ ফাঁকটা দিয়ে বাড়িয়ে দিলে তার প্রকাণ্ড মাথাটা।

গতি বাড়ালে গাড়িটা আর ঠিক আগেকার কালের মতোই তার সঙ্গে সঙ্গে ছুটল মেয়েরা, নারীরা, মায়েরা, প্ল্যাটফর্ম থেকে হাত নাড়তে লাগল বাপেরা, দাদুরা। গতি বাড়তেই থাকল। গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে ছুটল ইয়েস্কার বোন, পাটকিলে চুল তার আলুথালু, ছুটতে ছুটতেই কী যেন বললে চেঁচিয়ে। ভলোদিয়ার সঙ্গিনী ওয়াগনের সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা এসে থেমে গেল, ডানা নাড়ার মতো করে ভাসন্ত ভঙ্গিতে হাত নাড়লে।

গাড়ির পেছু পেছু সবচেয়ে বেশি দূর এসেছিল স্লাভিকের

মেয়েটি। আঁটো স্কার্টে ছুটতে তার অসুবিধা হচ্ছিল। স্লাভিকের হাত ছোঁবার চেষ্টা করতে গিয়ে হোঁচট খেল সে।

'পড়বে! পড়ে যাবে যে!' জানলা থেকে চেঁচিয়ে উঠল স্লাভিক।

এক্‌জিট্‌ পয়েণ্টের কাছে কেঁপে উঠল ট্রেনটা, বেঁকে গেল ধনুকের মতো, আর একটা গোলাপী বুক উড়ন্ত পাখির মতো বাঁকের ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেল মেয়েটি।

জানলা থেকে বস্তার মতো ঝুলছিল স্লাভিক, দু'হাত ওর লটপট করছে জানলার বাইরে, ফ্রেমে ঠক্‌ঠক্‌ করছে মাথা।

সবাই বসল কেমন শান্ত উদ্‌ভ্রান্তের মতো, স্টেশনের দৃশ্যটার সঙ্গে তার কোনো মিল নেই। সবাই নীরব, এমন কি বখাটে-টাও চুপ করে গেল, ছটফট করা থামাল।

ঝাড়ুদারনী এসে গজ্‌গজ্‌ করতে করতে ঝাড়ু দিয়ে গেল। খোলা জানলাটার দিকে ভেসে গেল সিগারেটের ধোঁয়া। ব্রিজের ওপর চাকার ঝমঝম। পেরিয়ে গেল নদী। শুরু হল শহরতলীর বাগান-বাড়ি এলাকা, অলক্ষ্যেই আবার তা হারিয়ে গেল বন-উপবনের মধ্যে। গাড়িটা যাচ্ছিল বিনা ঝাঁকুনিতে, কোনো হুইসিল না দিয়ে, একই গতিবেগে, যেন উড়ে যাচ্ছিল মাটির সামান্য ওপর দিয়ে, ঝিক্‌ঝিক্‌ শব্দ করে দূর যাত্রার জন্য তৈরি করে তুলছিল সবাইকে।

'স্লাভিক, স্লাভিক!..' ইয়েস্‌কা-ইয়েভ্‌সেই আর পারল না, প্যাণ্ট ধরে টানতে লাগল বন্ধুকে, 'তুই কি সারা পথটা অমনি ঝুলতে ঝুলতে যাবি?'

ঘাড় ফিরিয়ে স্লাভিক মাথা টেনে আনলে ভেতরে, তারপর একটা কোণে বসে কোটটা ঠেলে তুললে কান পর্যন্ত।

গা ঝাড়া দিলে সের্গেই মিত্রফানোভিচ, বোতল নিয়ে চোখ দিয়ে পনীরের কাপটা খুঁজতে খুঁজতে বললে:

'ধ্বত্তোরি, সবাই মিইয়ে গেলে যে? মরতে চলেছ নাকি? যুদ্ধে? এসো বরং মদ খাওয়া যাক, আলাপ করি, হয়ত গানও গাওয়া যাবে। তোমাদের ওই 'কেলে বেড়াল' আমি অবিশ্যি জানি না, তবে নিজের পেয়ারের গান শোনাব।'

'ঠিক কথা!' ইয়েস্‌কা-ইয়েভ্‌সেই নড়ে চড়ে উঠল, স্লাভিকের কান থেকে নামিয়ে দিলে কুর্তাটা, 'তোর কী হল? ভলোদিয়া! ভাইসব, উনি প্রস্তাব করছেন, বৃদ্ধ সৈনিক, পা নেই...'

'বেচারা, তুই বেচারা,' স্লাভিকের দিকে চেয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললে সের্গেই মিত্রফানোভিচ, 'ভাবিস না রে, সবই সয়ে যায়। যা পেরিয়ে এলি সেটা কিছু নয়, যা সামনে সেইটেই আসল কথা...'

'ওকে এখন ঘাঁটিয়ো না,' ইয়েস্‌কা-ইয়েভ্‌সেইকে বললে সে, তারপর তোবড়ানো, একধারটা ফেটে যাওয়া কাপটা খুঁজে নিয়ে জোরে জোরে বললে, 'কামনা করি, তোমাদের সার্জেণ্ট-মেজর যেন ভালো জোটে।'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান!' হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠে ভলোদিয়া তাকে থামালে, 'আমাদের যে মগ, চামচ, খাবার সবই আছে। স্টেশনে আমরা শুধু ইয়ার্কি করছিলাম,' একেবারে স্বাভাবিক লোকের মতো সে হাসল, 'এসো ভদ্রলোকের মতো জিনিসটা হোক।'

সুরা পানের পর এবার আলাপ চলল সাধারণ লোকের মতো। বিচ্ছেদের কষ্ট সইবার পর ছেলেগুলো হয়ে উঠেছে সহজ, বোধগম্য।

'আমাকেও দাও,' বললে স্লাভিক। মদ ছলকে, বিষম লেগে সে জিনিসটা খেলে তারপর বুকের কাছ থেকে কাপটা সরিয়ে ফের কুর্তাটা টেনে দিল কান পর্যন্ত।

ফের পায়ের কথা তুললে ছেলেরা। ওদের প্রীতি ও সৌহার্দ্যের সম্মানে সের্গেই মিত্রফানোভিচ বলতে লাগল

কিভাবে বনের মধ্যে হঠাৎ শত্রুর ট্যাঙ্ক আক্রমণের সামনে পড়ে গোলন্দাজ-দলের লোকেরা লড়াইয়ের জন্যে তৈরি হয়ে উঠতে পারে নি। কার্পেতিয়া অঞ্চলের উঁচু উঁচু পাহাড়গুলোর মাথায় পাইন বন ধোঁয়াচ্ছিল। যুদ্ধের মধ্যেই গাছ কাটা হচ্ছিল গোলা দাগার সেক্টরটায়। ব্যাটারির দুটো ডিট্যাচমেণ্ট গাছ কাটছিল আর বাকি দুটো হাউইটজার ঘোরাচ্ছিল। বনের প্রান্তটায় ছিল পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র, তাড়া দিচ্ছিল তারা, কিন্তু পাইনগুলো ছিল মোটা মোটা, আর করাত মাত্র দুটি, কুড়ুল চারটি। কাজ করছিল সবাই জামা খুলে, ঠাণ্ডা সত্ত্বেও গা ঘেমে উঠছিল। পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকে টেলিফোনে গালাগালি দিলে, ধমক দিলে, শেষ পর্যন্ত হুঙ্কার ছাড়লে:

'কাছেই ট্যাঙ্ক, আমাদের সেরে ফেলবে, গোলা দাগো!'

কিন্তু গোলা দাগা অসম্ভব, কামানের সামনেকার আরো গোটা পাঁচেক পাইন গাছ কাটা তখনো বাকি। তবে যুদ্ধে তো প্রায়ই অসম্ভবকেও ডিঙোতে হয়েছে।

এলোমেলো কামান চালানো হল।

যে কামানটার কম্যাণ্ডে ছিল সের্গেই মিত্রফানোভিচ তার গোলা লাগল পাইন গাছে, ডিট্যাচমেণ্ট চাপা পড়ল বিস্ফোরণের ফলে উল্টে পড়া হাউইটজারের ডাভটেলিঙে, আর কিছু দূরে দাঁড়ানো কম্যাণ্ডারকে উড়িয়ে নিয়ে আছাড় দিল মাটিতে।

জ্ঞান তার ফিরল হাসপাতালে, একটি পা নেই, কানে তালা, জিভ আড়ষ্ট।

'এইভাবেই লড়েছিলাম ছেলেরা।'

'দ্যাখো দিকি, কী না হয়! আর আমরা ভেবেছিলাম...' শুরু করলে ইয়েস্‌কা-ইয়েভ্‌সেই।

স্লাভিক কুর্তা থেকে নাক বার করে একদৃষ্টে তাকিয়ে

রইল সের্গেই মিত্রফানোভিচের দিকে। কান্নায় চোখ দুটো বসে গেছে, মাথাটা কেমন জানি মনে হল আরো বড়ো।

'আর তোমরা ভেবেছিলে, পা দিয়ে আমি বুঝি ইমব্রেইজারে লাথি মেরেছি?'

'আর বৌ? বৌ আপনাকে সহজ ভাবে নিয়েছিল?' শোনা গেল ভলোদিয়ার গলা, 'মানে জখমের পরে আর কি।'

'কেন নেবে না? সহজ ভাবে বৈকি। হাসপাতালে আসে আমার কাছে, বাড়ি নিয়ে যায়। যেমন উচিত।' ভলোদিয়ার দিকে একদৃষ্টে তাকাল সের্গেই মিত্রফানোভিচ।

পানিয়া আসবে না এ সন্দেহ তার ঘুণাক্ষরেও হয় নি। হাসপাতালেও এ ধরনের কোনো ঘটনা শোনে নি সে। ঠুঁটো জগন্নাথ, হাত নেই, পা নেই, তারাও এমন কোনো কথা বলে নি। চেপে গেছে হয়ত?

'মেয়েরা, আমাদের রুশী মেয়েরা স্বামীকে বিপদের দিনে কখনো ছেড়ে যায় না হে। সুস্থ সমর্থ হলে হয়ত পারে, যদি সহ্যগুণ না থাকে, কিন্তু পঙ্গু কি অনাথকে কখনো ছেড়ে যাবে না! কেননা মেয়েরা আমাদের বরাবরই মানুষের মতো মানুষ! আর তোমরা ভাইসব তাদেরকে খারাপ ভেব না! আর এই তোমারটি, তোমার,' স্লাভিকের দিকে ফিরল ও, 'তোমারটি তো তোমার জন্যে যে কোনো দুঃখ মাথা পেতে নেবে!..'

'আপনাকে আমি চুমু খাব!' মাতালের মতো চেঁচিয়ে উঠে স্লাভিক এগিয়ে গেল মিত্রফানোভিচের দিকে। আর মিত্রফানোভিচের ইচ্ছে হচ্ছিল স্লাভিকের মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দেয়, কিন্তু ঠিক মনস্থির করতে না পেরে অভিভূতের মতো বিড়বিড় করলে:

'পাগলা, একেবারে পাগলা! তা কী, গান হবে নাকি?

ঈগল পাখি?' ভলোদিয়ার উদ্দেশে বললে সে, 'ওয়াগনে কচি ছেলেমেয়ে নেই তো?'

'নেই, নেই,' বলে উঠল রিক্রুটরা, 'প্রায় গোটা ওয়াগনেই কেবল আমরা। শুরু করেন বাপজান!'

ছেলেগুলোর গলার স্বর আর হাসির ধরন দেখে সের্গেই মিত্রফানোভিচ টের পেল যে ওরা ভাবছে তার বেশ নেশা হয়েছে, এক্ষুনি নিশ্চয় গেয়ে উঠবে 'ওই লো আমার অ্যাশবেরি', কিংবা 'অস্ত্র হাতে জন্ম আমার অস্ত্র হাতে মরি!' পাশকে দৃষ্টিতে একটু চেয়ে সে অলক্ষ্যে হাসল, তারপর শুরু করলে গভীর জলদ গলায়,—রিজার্ভ রেজিমেণ্টে সে ছিল মূলগায়েন, গলা তার এখনো নষ্ট হয় নি:

ঘোর রজনী কিবা
আলোক উজল দিবা...

প্রশ্রয়দানের পরিহাস মেশা দৃষ্টিগুলো অদৃশ্য হল এক মুহূর্তে। দেখা দিল বিহ্বলতা, আগ্রহ। একই রকম অন্তরঙ্গতার সুরে, যেন আলাপের ফাঁকে, গেয়ে গেল সের্গেই মিত্রফানোভিচ:

তোমারেই স্মরি, তোমারে...

এই জায়গাটায় সে আধ বোঁজা চোখে, কোনো রকম ভঙ্গি না করে হাঁটুতে হাত রেখে বসে রইল একটু কুঁজো হয়ে, দুলতে লাগল গাড়ির তালে তালে, তারপর একেবারে আস্তে যেন অন্তরের কোন এক তন্ত্রী দিয়ে, বুক ভাঙা কোনো আর্তনাদকে চেপে, শেষ করলে:

আদর করে কি কেউ?
সোহাগে ভরে কি কেউ?
ডাকে প্রিয়তমা বলে?..

গলায় ওর না ছিল মাতাল চাষাড়ে বন্যতা, না ছিল পরিশীলিত চাকচিক্য, তাতে যেন ধরা পড়ছিল তার গোটা চরিত্র, গোটা প্রাণটা—অমায়িক, নমনীয়। নিজেকে সে খুলে ধরতে পেরেছিল এই জন্য যে তার মধ্যে ছিল না কোনো আবর্জনা, অন্ধকার, চোরাগলি। গান শুনে তার লোকে নিঃসঙ্গতা ভুলে যেত, বোধ করত ভ্রাতৃত্বের তাগিদ, চাইত যেন কেউ তাকে ভালোবাসে, সেও ভালোবাসুক কাউকে।

ছেলেগুলোর সামনে এখন সে আর কেঠো পা এক পঙ্গু নয়, সবকটা বোতাম আঁটা গলাবন্ধ নীল রুশী কামিজের ওপর যে পরে আছে সাবেকী ফ্যাশনের বনাতী কোট। একটু টাক-পড়া মাথা, রগের পাকা চুল, তুলনায় কমবয়সী মুখের ওপর একান্ত বেমানান বলিরেখা, আঁচড়-ভরা কালো কালো গর্ত-ফোটা হাত দুখানা আর কারো চোখেই পড়ছিল না।

ছেলেগুলো দেখছিল জোয়ান এক তেজস্বী কম্যাণ্ডারকে, বুকে তার অর্ডার আর পদক।

আর সে? গ্রামোফোন রেকর্ডে শোনা কবেকার এই যে গানটার সুর আর কথা তার গলায় বদলে গেছে, এ গান গেয়ে সে ঠিকই করেছে। সেও নিজেকে দেখছিল যেন তার ডিট্যাচমেণ্টেই আছে, জোয়ান, তাগড়াই, ঝাঁকড়া, লোকে যাকে সমাদর করে শুধু গানের জন্য নয়, নম্র স্বভাবের জন্যও।

সের্গেই মিত্রফানোভিচের গান শুনে অবাক হয়ে ছেলেরা ভাবছিল, এমন যার গলা আর গুণ, তার গাওয়ার জায়গা এটা নয়। কিন্তু প্রতিভা নিয়ে এমন ছিনিমিনি খেলে রুশীদের মতো আর কেউ নয়। কত যে আমাদের নাইটিঙ্গেল গান গেয়ে গেছে কোচম্যানের বাক্সে, সৈন্যদের পঙক্তিতে, মদের আড্ডায়, তাইগার নির্জনতায়, হারিয়ে গেছে রাশিয়ার গহনে, তা কে গুণবে...

রুশ প্রতিভার সাগর থেকে দু'এক বিন্দু জল আহৃত হয় শুধু দৈবাৎ, শুধু অন্ধ সৌভাগ্যচক্রে।

কিন্তু সে দৈবও কতই না বিরল আর চঞ্চল।

...ঝকঝক করছিল গাড়ির চাকা। গান শেষ করে সের্গেই মিত্রফানোভিচ বসেছিল একই ভঙ্গিতে, কাঠের পা-টা টেবিলের নিচে বাড়ানো, যে হাত দুখানার সঙ্গে তার গলার স্বরের কোনোই মিল নেই—আঁচড়-ভরা, নখের চটা ওঠা, গর্ত-গর্ত, তা আগের মতোই দুই হাঁটুর মাঝখানে জড়ো করা। শুধু আরেকটু ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে মুখ, স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার ঠোঁটের নিচের পুরো-না-কামানো জায়গাটা, শুধু চোখ দুটো যেন ভেসে গেছে কোন সুদূরে।

'হু-উ-উস্,' বলে টান দিলে ইয়েস্কা-ইয়েভ্সেই, মাথা ঝাঁকালে, যেন কপাল থেকে চুলের গোছা সরাচ্ছে। পাটকিলে চুল তো, প্রায়ই তা কোঁকড়ানো হয়।

সের্গেই মিত্রফানোভিচের নজরে পড়ল যে উটকোটা আলাপ শুরু করতে চাইছে, আর আগে থেকেই তো তার জানা আছে যে ও বলবে, 'হ্যাঁ, আমাদের সংশোধনাগারেও এক ছোঁড়া, সেও এই সব বিরহ আর ভালোবাসার গান গাইত খাসা'। সের্গেই মিত্রফানোভিচ তাই জানলার দিকে চোখ ফিরিয়ে চাপড় মারলে হাঁটুতে।

'তাহলে, ছোকরারা, আমায় তো এবার নামতে হয়,' বলে লজ্জিত ভাবে হাসল সে, 'গানে আলাপে চট করে সময় কেটে গেল। বিদায় নেওয়া যাক।' এই সময় তার খেয়াল হল যে কোটটা যেন ভারি হয়ে ঝুলছে, 'ওহো, আমার আরো একটা বোতল আছে। ভাগ করে নেবে নাকি। আমি কিন্তু আর খাব না।'

'আরে না, না, আমাদের আছে,' ওর হাত চেপে ধরল স্লাভিক, 'টাকাও আছে, মদও আছে। ওটা বরং বাড়ি নিয়ে যান।'

'তোমাদের যা ইচ্ছে। আমি শুধু...'

'না, না, ধন্যবাদ,' স্লাভিককে সমর্থন করলে ভলোদিয়া, 'আমাদের পক্ষ থেকে আপনার স্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে দেবেন। দেখতে পাচ্ছি, গিন্নি আপনি পেয়েছেন ভালোই।'

'খারাপ হলে কি আর রাখতাম,' সরল মনেই বললে সের্গেই মিত্রফানোভিচ, তারপর ছেলেদের মেজাজ খোশ করার জন্যে যোগ দিলে, 'আমাদের বন সমবায়ে কাঠ গুদামে একটা লোক কাজ করে। সে কি বড়াই করে জানো, বলে,—আমি একটা লোক বটি! পাঁচটা বৌ রেখেছি, কিন্তু কাউকে দুঃখু দিই নি...'

হেসে উঠল ছেলেগুলো, তারপর এগিয়ে দিতে গেল সের্গেই মিত্রফানোভিচকে। বেরবার মুখটায় সিগারেট খাচ্ছে সবাই। ব্রেক কষে ট্রেন থামল একটা ছোটো স্টেশনে, চারিপাশেই তার ধোঁয়াটে রুপোলী ফার গাছের ঝাড়, এমন কি স্টেশনের বাগিচাতেও ফার গাছ গজিয়েছে, তার একটার সঙ্গে লম্বা দড়িতে বাঁধা বুড়ো ঘোড়া চরছে।

সন্তর্পণে পাদানি থেকে নেমে সের্গেই মিত্রফানোভিচ পদদলিত কালচে মাটির ওপর দাঁড়াল দৃঢ় ভাবে। গাড়িটাও যেন শুধু এইটুকুরই অপেক্ষা করছিল, নিঃশব্দে তা এবার ছেড়ে দিলে। টুপি তুললে সের্গেই মিত্রফানোভিচ:

'শান্তিতে থেকো হে ছেলেরা!'

কনডাক্টরের পেছনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে রইল ওরা, ক্রমশ গতি বাড়ল ট্রেনের, স্টেশন ছাড়িয়ে রুপোলী ফার গাছগুলোর মধ্যে ফাঁপা আওয়াজ ছাড়লে ইলেকট্রিক এঞ্জিন, ঝকঝক শব্দ

তুলল ওয়াগনগুলো, তারপর অচিরেই বনের ওপর দিয়ে ভেজা তারের ঘর্ষণে উড়তে লাগল নীল ফুলকি। শেষ ওয়াগনটাও অদৃশ্য হয়ে যখন সব একেবারে চুপ হয়ে গেল, সের্গেই মিত্রফানোভিচ তখন ফের পুনরুক্তি করলে:

'শান্তিতে থেকো হে ছেলেরা!'

ছেলেগুলোর চোখেও সে ওই মূর্তিতেই রয়ে গেল: কাঠের পা, পাকা পাকা চুল ছিটানো খোলা মাথা, লম্বাটে কোট, তার একদিকটা ঝুলে পড়েছে বোতলটার ভারে, আর তার পেছনে পিখতোভ্কা নামে এক ছোটো স্টেশন।

পথে সঙ্গী কেউ জুটল না, সবই অবশ্য জানা, তাহলেও সের্গেই মিত্রফানোভিচের পক্ষে দীর্ঘ এই চার কিলোমিটার পথটা তাকে ঠুকঠুকিয়ে যেতে হল একা।

পেছনে পড়ে রইল পিখতোভ্কা, আর রুপোলী ফার গাছগুলো। পাচিলের মতো করে তা কাটা গুঁড়ি আর ফাঁকা জায়গাগুলো আড়াল করে রেখেছে। এমন কি তুষার ঠেকানোর জায়গাগুলোও চুড়ো কাটা ফার গাছ দিয়ে তৈরি। নিচে তাদের শ্যাওলা আর অন্ধকার।

কেটে সাফ করা জায়গাগুলোয় প'য়তাল্লিশ সালের হেমন্তে এ বন মাথা তুলছিল সবেমাত্র, চারিদিকেই তখন সমভূমি মাঠ, জলা-জলা বনাকীর্ণ প্রান্তর, এখানে ওখানে লাল লাল বিলবেরি আর ক্র্যানবেরির ছোপ, ঘন ঘনই বুড়ো ঘোড়ার মতো পিঠ-বাঁকা পাঁচমিশেলী বিচালির কালচে স্তূপ।

আবহাওয়াটা তখন ছিল এবারকার চেয়ে অনেক ভালো।

আকাশ ছিল অঢেল, চতুর্দিকে রোদ্দুর, ভূমিতল যেন বাসন্তী ধোঁয়ায় ধুধু করছে।

নাকি সবকিছু অমন সুন্দর, জ্বলজ্বলে লেগেছিল এই জন্যে যে সে ফিরছিল হাসপাতাল থেকে, যুদ্ধ থেকে বাড়িতে। প্রতিটি ঘাস, ঝোপ, পাখি, কাচপোকা, উইঢিবিই ছিল তার আনন্দ। স্মৃতি, বাকশক্তি, শ্রবণশক্তি হারিয়ে একবছর হাসপাতালে শুয়ে থাকার পর এই যে দুনিয়াটা ফের তার কাছে উন্মুক্ত হল, সেটা দেখে দেখে আশ তার মিটছিল না। তখনো সে সবকিছু চিনতে পারছিল না, ধরতে পারছিল না, কথা কইছিল তোতলিয়ে। ডাক্তাররা পানিয়াকে আগেই সাবধান না করে দিলে সে নিশ্চয় ভাবত মিত্রফানোভিচ পাগল হয়ে গেছে।

বনপ্রান্তের ঝোপগুলোয় বদিয়াক, বাজ ঠোঁটো, ছাগলদাড়ি, বোতাম ফুল, মেরিগোল্ড দেখে সে কিছুই তফাৎ করতে পারছিল না, মুষড়ে পড়ছিল। সবগুলোই তার কাছে মনে হচ্ছিল একই ফুল, কেননা সবগুলোই দেখতে হলদে।

'কুলবাবা! কুলবাবা!' হঠাৎ উদ্দাম হয়ে উঠে সে ক্রাচে ভর দিয়ে ছুটতে গেল ঝাড়টার দিকে। পড়ে গেল পা জড়িয়ে আর উপুড় হয়ে থেকেই ছিঁড়ে নিলে আগাছার শীর্ণ ফুলটা, শুঁকতে লাগল সেটা।

'কুলবাবাই বটে! চিনতে পেরেছ তাহলে?' সায় দিলে পানিয়া, মুখ থেকে তার ঝেড়ে ফেললে মাকড়সার জালটা। তখনো সে মাকড়সার জাল ধরতে পারছিল না। গন্ধ টের পাচ্ছিল না।

অ্যাশবেরি গাছের কাছে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ সে লক্ষ করতে লাগল, ভাবতে লাগল। থোকাগুলো ঠিকই আছে, কিন্তু ফল নেই কেন।

'পাখিতে খেয়েছে, পাখি!' বুঝিয়ে দিলে পানিয়া।

'ও প্-পাখি!' জ্বলজ্বল করে উঠল সে, 'হ্-হ্-হ্যাজেল-হেন?'

'হ্যাজেলহেন, থ্রাশ, অ্যাশবেরির লোভ সব পাখিরই, সে তো জানো।'

'জ্-জানি।'

'কিছুই জানো না তুমি,' মনে মনে ভাবল পানিয়া, প্রধান ডাক্তারের সঙ্গে তার শেষ আলাপটার কথা মনে হয়ে মন খারাপ হয়ে গেল তার। ধৈর্য সহকারে অনেকক্ষণ ধরে ডাক্তার বুঝিয়েছিলেন রোগীর কী ধরনের শুশ্রূষা করতে হবে, কী তাকে খেতে দেওয়া যেতে পারে, কী রকম বিশ্রাম ওর দরকার, আর সব সময় চোখ দিয়ে যেন যাচাই করে নিচ্ছিলেন পানিয়াকে। যেন কথা প্রসঙ্গে ডাক্তার জিজ্ঞেস করেছিলেন ছেলেপিলে আছে কিনা। বিব্রতের মতো পানিয়া বলেছিল যে যুদ্ধের আগে ঠিক ফুরসুত হয়ে ওঠে নি, 'তবে তাতে কী, এখনো তো সোমত্ত বয়েস...' 'খুবই আফশোসের কথা,' চোখ ঢেকে বলেছিলেন ডাক্তার এবং এরপর কথাবার্তা তাদের থেমে যায়।

পিখতোভ্কা থেকে গাঁয়ে ফেরার পথে ব্যাপারটা সে সবই বুঝলে: ডাক্তারের কথা, তার নিষ্ঠুর তাৎপর্যটা তার পুরো হৃদয়ঙ্গম হল কেবল এইখানেই।

কিন্তু সের্গেই তাকে মন খারাপ করার, অন্যমনস্ক হবার অবকাশ দিলে না। নদীর কাছে বার্ড চেরি দেখে সে মুঠো মুঠো ছিঁড়তে লাগল:

'ম্-মিষ্টি!'

'পেকে উঠেছে যে! মিষ্টি হবে না কেন?'

একদৃষ্টে সে তাকিয়ে রইল পানিয়ার দিকে। অতি সম্প্রতি,

মাত্র মাস তিনেক আগে থেকে সের্গেই মিষ্টি স্বাদ টের পাচ্ছে. তার আগে সে তেতো, টক কিছুরই তফাৎ বুঝত না। ওটা কী ব্যাপার পানিয়া জানত না। কেই বা জানে। সের্গেইয়ের মুখে ফুটে উঠল বেদনার ছাপ। পানিয়া বুঝল যে তার শেলশক-খাওয়া মস্তিষ্ক ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, অস্থির করে তুলছে ওকে। আরো একবার, তবে এবার শিথিল ভাবে সে বার্ড চেরির চারপাশে হপ্ লতাটা দেখালে, আর ক্লান্ত ভাবে পানিয়া বোঝালে:

'এবার গ্রীষ্মকালে যে খুব গরম পড়েছিল। তাই গুটি ধরে নি। কেবল ডাঁটি আর পাতা। হপ্ লতার জন্যে যে জল চাই।'

ক্রাচের ওপর প্রায় ঝুলছিল সের্গেই, আফসোস হল পানিয়ার, ওর কথা না শুনে গাড়ি ডাকলেই হত। জিরিয়ে নেবার জন্যে প্রায়ই ওরা বসছিল বিচালি স্তূপগুলোর ধারে। বিচালি নিয়ে হাতে চটকাল সের্গেই, শুঁকল। চোখ ওর চকচক করে উঠল। বোঝা যায়, গন্ধ থেকে ও বিচালি চিনতে পেরেছে।

বিচালি কেটে নেওয়া জায়গাগুলোয় ফের সবুজ হয়ে মাথা তুলেছে ঘাস, মিট মিট করছে ঘাস ফুল, কোথাও কোথাও গোলাপী হয়ে উঠেছে দেরিতে গজানো ক্লোভার ঘাসের ফ্যাকাশে মঞ্জরী। শান্ত, পরিষ্কার আকাশ, ধারগুলো তার ফ্যাকাশে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়বে তার আভাস পাওয়া যায় এই অপ্রাকৃতিক স্তব্ধতায়।

গাঁয়ের কাছাকাছি যখন তারা পৌঁছল, তখন সের্গেই মিত্রফানোভিচ আর কিছুই জিজ্ঞেস করছিল না, কুঁজো হয়ে তার ক্রাচ চালাচ্ছিল, থামছিল ঘনঘন।

গাঁয়ের প্রান্তে শস্যহীন শূন্য সবজি ক্ষেত, সাজন্ত বনের

মাঝখানে গ্রামটা দেখাচ্ছিল কেমন ন্যাংটা, অনাথ। বাড়িগুলো পুরনো আর কালচে হয়ে উঠেছে, বাড়িও কমে গেছে সংখ্যায়। হালকা বন এসে পেঁছেছে একেবারে বাড়িগুলোর ঘাড়ের ওপর। ফাঁকা হয়ে উঠেছে গ্রাম। গোলমাল নেই, নেই লোকের ব্যস্ততা। এমন কি ছেলেপিলেদের গলাও শোনা যায় না। শুধু গ্রামের গভীরে ঝক ঝক করছে একটা এঞ্জিন আর ধোঁয়া উঠছে সমবায়ের অর্ধতপ্ত চিমনি থেকে, জানানি দিচ্ছে যে গ্রামটা এখনো বেঁচে আছে, কাজ চলছে সেখানে।

'ম্-মা?' পানিয়ার দিকে ফিরল সের্গেই মিত্রফানোভিচ।

'এসো আমি তোমায় নিয়ে যাই। এসো, এসো...'

ওর ক্রাচ দুটো নিয়ে পানিয়া প্রায় ওকে পিঠে করে নিয়ে উঠল উঁচু ঢিবি বেয়ে, সেখানে তার ক্রাচ ফেরত দিয়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগল পাশাপাশি, স্বামী স্ত্রীর যেভাবে হাঁটা উচিত।

'ধন আমার, যাদু আমার!' বললে পানিয়ার মা, 'ইস, কী হালই তোর করেছে ওই জার্মান মুখপোড়ারা, এ্যাঁ?'

মেয়ের চেয়ে জামাইকে সে কম ভালোবাসত না, দেখাতে চাইত যেন বেশি ভালোবাসে। গুমট বাড়িখানায় উঠে সের্গেই তার সামনে দাঁড়িয়ে রইল কেমন রোগা-রোগা, দেখাচ্ছিল যেন তল-ভাঁড়ারে আলুর ফ্যাকাশে অঙ্কুর।

'সারাক্ষণ এবার অমনি করেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে থাকবে নাকি?' ঝঙ্কার দিল পানিয়া।

শিথিল ঠোঁটে বুড়ি চুমু খেলে জামাইকে, তারপর তাকে অলিন্দে উঠিয়ে নালিশ করলে:

'আমায় কুরে কুরে খাচ্ছে ও, সাপ একেবারে, কুরে কুরে

খাচ্ছে... তবে বাড়িতে এবার থেকে তুমি তো থাকবে,' ঠোঁট ওর থর থর করে উঠল।

'আমার সেপাইকে কিন্তু বাপু ঠোকর দিতে এসো না, বলে দিচ্ছি,' প্রশ্রয়দানের অভ্যস্ত ঘরোয়া ভঙ্গিতে বললে পানিয়া, তাকাল মা আর স্বামীর দিকে, ফের তারা সেই যুদ্ধের আগের মতোই এক অঘোষিত জোট বেঁধেছে।

পিখতোভ্কা থেকে গাঁয়ে একলা ফেরবার সময় প্রতিবারই তার যুদ্ধ থেকে ঘরে ফেরার এই দিনটার কথা মনে পড়ত সের্গেই মিত্রফানোভিচের।

গাছ পালার মাঝে মাঝে কালো কালো হয়ে আছে সুদিনের অপেক্ষায় লুকিয়ে থাকা ফার গাছ। রুপোলী ফার, নতুন পোঁতা পাইন আর লার্চ। লাইম গাছগুলো আগু বেড়ে ডগডগিয়ে উঠেছে উঁচুতে, ছড়িয়ে দিয়েছে ডালপালা, কালো কালো কাণ্ডগুলো নিয়ে এদিক ওদিক করেছে, কিন্তু নিজের জায়গা ছাড়ে নি।

গাছ কাটা জায়গাগুলোয় বিচালি-স্তূপগুলো ছোটো হয়ে এসেছে, বেড়ে উঠেছে ঘেসো জমি। কিন্তু জলা মাঠগুলোর অবস্থা সঙ্গীন, তার ওপরকার বনগুলো বেঁড়ে বেঁড়ে হয়ে জমে গেছে, শক্ত হয়ে ওঠার সময় পায় নি।

ঢালুগুলোতে খড়খড়ে হয়ে উঠেছে দেরিতে গজানো ব্যাঙের ছাতা। ছাতাগুলোর পাশ দিকটা খাওয়া-খাওয়া। পাখিদের কাড়াকাড়িতে অ্যাশবেরি আর বার্ড-চেরি পড়ছে পুকুরে, জলের ওপর ফুটিয়ে তুলছে জালি নক্সা।

কিছুদিন পরে পিখতোভ্কা ঘিরে ফের শুরু হবে কাঠ চেরাই। এখন শুধু বুড়ো বার্চগুলোকে সরানো হচ্ছে।

যুদ্ধের আগে বার্চ গাছ কাটা হত না। যখন ফার জাতীয় গাছ শেষ হয়ে গেল, তখন কাঠুরিয়াদের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়, খোলা হয় ছোবড়া আর প্লাই-উড তৈরির সমবায়।

সের্গেই মিত্রফানোভিচ করাতে ধার দিত আর পানিয়া খাটত সিজানো বিভাগে, এখানে বার্চ-ছাঁটের কুণ্ডলীগুলোকে প্রথমে গরম জলে সেদ্ধ করা হত, তারপর কাগজের রোল খোলার মতো করে খুলে ফেলা হত তা, মাঝের অংশটা ফেলে দেওয়া হত লকড়ির স্তূপে।

গাড়ি চলা রাস্তা থেকে হাঁটা-পথে ফিরে সের্গেই মিত্রফানোভিচ চলতে লাগল কারাভাইকা নদী বরাবর। একসময় এখানে ভালো মাছ পাওয়া যেত, কিন্তু কাঠুরিয়ারা নদীটাকে এমন আবর্জনায় ভরে তুলেছে যে কারাভাইকা এখন প্রাণহীন। অনবরত এখন তাতে পচে উঠছে কাণ্ড, গুঁড়ি, ছাঁট। নদীর ওপরকার সাঁকোটা বসে গেছে, ছেয়ে গেছে ঘাসের চাপড়ায়। তার পচা ঝোপে বংশ বৃদ্ধি করছে ঘেসো সাপ, ওদের পক্ষে সেটা শুধু এখানেই সম্ভব।

নদী থেকে পাড়ের ওপর একটা পাক দিয়ে হাঁটা-পথটা উঠে গেছে ফসল তুলে নেওয়া আলু ভুঁইয়ের ঢিপির দিকে। গ্রামের ক্লাবে বসানো রেডিওটা বাজছিল। কান পেতে শুনলে সের্গেই মিত্রফানোভিচ। হৈমন্তী মাটির ওপর দিয়ে ভেসে এল অরুশ একটা গান। প্রথমে তার মনে হয়েছিল মেয়ের গলা, কিন্তু আলু ভুঁইয়ে ওঠার পর ধরতে পারলে কোনো কিশোর গাইছে, এমন গান সে আর কোনো ছেলের গলায় কখনো শোনে নি।

তার মনে হল যেন নদীর তীরে ছেলেটা বসে আছে একা, ঢিল ছুড়ছে জলে, কী ভাবছে, নিজেকেই সে শোনাচ্ছে

কী সে দেখেছে, কী ভেবেছে, কিন্তু তার সরল শৈশব ভাবনার ভেতর থেকেও চুইয়ে পড়ছে অতি প্রাচীন একটা বিষাদ।

বড়োদের অনুকরণ করছে ছেলেটা। কিন্তু সে অনুকরণের মধ্যেও রয়েছে একটা অকপট সততা, এখনো অনপহৃত তার অনাবিল জগতটার প্রতি এক শিশুসুলভ আস্থা।

'ওরে ছেলেটা!' ফিসফিসিয়ে ঠোঁট নাড়ালে সের্গেই মিত্রফানোভিচ, 'বাছা আমার! কোন দেশের লোক তুই?' কথাগুলো ধরার জন্যে সে উৎকর্ণ হয়ে উঠল কিন্তু কিছুই বুঝতে পারল না, তাহলেও ছেলেটার জন্যে কেমন তার শংকা হল, মনে হল এক্ষুনি হয়ত কোনো একটা বিষম বিপদ ঘটবে ওর, তাই যথাসাধ্য আস্তে নিঃশ্বাস নিতে লাগল সে, যেন সতর্ক হয়ে রইল, ছেলেটাকে সাহায্য করার মুহূর্তটা যাতে ফসকে না যায়।

সের্গেই মিত্রফানোভিচ জানত না যে, ছেলেটাকে সাহায্য করার আর কিছু নেই। বেড়ে উঠেছে ছেলেটা, তারপর ফ্যাশন বহির্ভূত জিনিসের মতো হারিয়ে গেছে বিচিত্রানুষ্ঠানের পরিত্যক্ত আবর্জনায়। খ্যাতি তার বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো তার জীবনটাকে প্রদীপ্ত করে তারপর নিবে গেছে লোকের ক্ষণস্থায়ী স্মৃতিতে।

ক্লাবের রেডিওটা এবার কথা কয়ে উঠল, সের্গেই মিত্রফানোভিচ কিন্তু দাঁড়িয়েই রইল ভুঁইয়ের বেড়ায় ভর দিয়ে, আর কেন জানি বিষণ্ণ ভাবে সে দোষ স্বীকার করলে ঐ গাইয়ে ছেলেটির কাছে। ওই ছোকরাগুলোর কাছে, ঘর ছেড়ে অচেনা জায়গায় যারা চলে গেল সৈন্য তালিম নিতে।

স্বীকার করলে এই জন্য যে সের্গেই মিত্রফানোভিচের

ছেলেপিলে নেই, সব ছেলেকেই তার মনে হয় আপন, অবিরাম উদ্বেগ বোধ করে তাদের জন্যে। সেটা বোধ হয় হয়েছে এই জন্যে যে, ফ্রণ্টে তার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে এই যুদ্ধটাই শেষ যুদ্ধ, সে যে যাতনা ভুগছে, সেইটাই মানুষের শেষ যন্ত্রণা।

কিন্তু যা ভেবেছিল সেটা করা যায় নি। সে পারে নি, সুকণ্ঠ ছেলেটার বাবাও পারে নি। কেউ পারে নি। ছাই চাপা আগুনের মতো যুদ্ধ লুকিয়ে আছে, আজ এখানে কাল সেখানে তা জ্বলে উঠছে শিখায়।

সেই জন্যই প্রাণ তার অশান্ত। সেই জন্যই ছেলেগুলোর কাছে সে দোষী। রেডিওয় একবার শ্রদ্ধেয় কোন বৃদ্ধ ভাষণ দিয়েছিলেন। কী না বললেন তিনি! তরুণেরা আজকাল কিছুরই মূল্য দেয় না, শ্রদ্ধা করে না বুড়োদের, অকৃতজ্ঞ তারা, ভুলে গেছে কী স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়া হয়েছে তাদের, কত কী করা হয়েছে তাদের জন্যে...

'আরে বাবা ধেড়ে ইঁদুর, চাও-টা কি তুমি শুনি—ওরাও খালি পায়ে হাঁটুক! ওরাও যেন আধ পেটা খায়, পুরো ঘুম না ঘুমায়, ব্যারাকে ব্যারাকে উকুন আর ছারপোকার পেট ভরায়? কেন ভাব করছ যেন ছেলেমেয়েদের জন্যে সব ভালোটাই করেছ তুমি আর মন্দগুলো পড়েছে আকাশ থেকে? কেন ওদের গাল পাড়ছ এমন ভাবে যেন ওরা তোমারই ছেলেমেয়ে নয়, কোথাকার কোন হতচ্ছাড়া!..'

বৃদ্ধের কথা শুনে সের্গেই মিত্রফানোভিচ এতই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল যে থুতু ফেলে রেডিও বন্ধ করে দেয়। কিন্তু স্মৃতি আর বিবেক তো আর বন্ধ করা যায় না।

'ছেলে-ছোকরাদের ওপর তম্বি হম্বি করা সে তো সবচেয়ে সোজা। আমরা ওদের খাইয়েছি পরিয়েছি, তাই আপত্তি

করার অধিকার নেই ওদের। ধমকাও ওদের, তারপর ওরাও তাদের ছেলেমেয়েদের ধমকাবে। আগাগোড়া কেবল এই চলবে। কিন্তু এমন ভাবে ওদের মানুষ করো যাতে বড়োদের তারা শ্রদ্ধা করবে কেবল রুটির জন্যে নয়... সেইটে হবে কাজের মতো কাজ! নেকড়েও তো তার বাচ্চাদের খাওয়ায়, কখনো কখনো জীবনও দিয়ে দেয় তাদের জন্য। বাচ্চাগুলো সেজন্যে তার মুখ চাটে। তাহলে ওরাও আমাদের গাচাটুক? তাহলে ছেলে-ছোকরাদের কাছে গর্ববোধ, মর্যাদা বোধের কথা বলতে যাওয়া কেন? আমরাই উপদেশ দিচ্ছি, আবার আমরাই তা কাঁচিয়ে দিচ্ছি!'

কাজ থেকে ফিরে পানিয়া সের্গেই মিত্রফানোভিচের অপেক্ষা করছিল। কোনো দিনই তাকে সুন্দরী বলে ধরা হত না। রঙটা একটু গাঢ়, গালের হাড় উঁচু, ছোটো থেকেই খাটুনির ছাপ-পড়া হাত। যখন সে নববধূ তখনো তাকে দেখাত যেন ধেড়ে মাগী। কিন্তু বছরের পর বছর কেটেছে, তার যে বান্ধবীর পেছনে একদা ভিড় করে থাকত ছোকরারা, তার রূপ গেছে, এলিয়ে পড়েছে দেহ, কিন্তু পানিয়ার গায়ে যেন কালের ছোঁয়া লাগে নি। শুধু স্বভাবটা হয়ে উঠেছে একটু চুপচাপ, নরম হয়ে এসেছে চোখ, অচঞ্চল হয়েছে দৃষ্টি, মুখখানা এখন আর গোলগাল নয়, গাল বসে গেছে, ঢিপ হয়ে উঠেছে পুরুষালী কপাল, তাতে দুটি বলিরেখা, কিন্তু রূপ সম্পর্কে সমস্ত মেয়েলী ধারণা সত্ত্বেও সে রেখা তাকে বেশ মানায়। যে কোনো কাজ সে করত বিনা সোরগোলে, দিন কাটাত সহজে, যেন বিনা দুর্ভাবনায়, তাতে রাগ ধরত কাঁদুনি-গাওয়া মেয়েদের।

'অমন গোবেচারা মরদ যদি না জুটত, ছেলে বিয়োত গণ্ডাকত, তাহলে টের পেত...'

মেয়েদের সঙ্গে কখনো তর্ক করত না সে, নিজের জীবন নিয়ে কোনো আলাপে যেত না। ও জিনিসটা তার স্বামীর পছন্দ হত না, আর যেটা স্বামীর পছন্দ নয়, সেটায় তারও অপছন্দ না থেকে পারে না। পানিয়াও জানত, ওদের দুজনের মধ্যে যা কিছু ভালো সেটা তারা পরস্পরকে ধার দিয়েছে, খারাপগুলোকে চেষ্টা করেছে বাদ দিতে।

সর্বজিভুঁই খুঁড়ছিল বুড়ি, তুলে তুলে নিচ্ছিল হর্স র‍্যাডিশ, বীট, গাজর, অসন্তুষ্টের মতো শব্দ করে করে ফেলছিল বালতিটায়। বাড়িখানায় আটটি ফ্ল্যাট, বাড়ির কাছেই প্রতিটি পরিবার পেয়েছে বিঘে খানেক করে সর্বজিভুঁই। অবিরাম সেই ভুঁই খুঁড়ে খুঁড়ে পানিয়ার মা দেখাতে চাইছিল যে, সংসারের অন্ন সে খাচ্ছে অকারণে নয়।

'মদ খেয়ে আসো নি তো?' অলিন্দে সের্গেই মিত্রফানোভিচকে জিজ্ঞেস করলে বৌ।

'একটুখানি,' অপরাধীর মতো স্বীকার করলে সে, পানিয়ার আগেই রান্না ঘরে ঢুকল, 'নতুন রিক্রুটদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, তাই...'

'তা খেয়েছো খেয়েছো...'

'ছোকরাগুলো তোমায় অভিনন্দন জানিয়েছে, সবাই,' বললে সের্গেই মিত্রফানোভিচ, 'আর এটা তোমায়,' পীচের প্যাকেটটা সে দিলে পানিয়াকে, 'আর এটা আমাদের সবাইকার জন্যে।' সুন্দর বোতলটি সে রাখলে টেবিলের ওপর।

'এই মা, দ্যাখো দিকি, ইঁদুরের মতো কেমন খরখরে। এ ফল খায় নাকি?'

'নিজেই তুমি ইঁদুর ছানা! গাল ফোলা গোবিন্দের মা!' হেসে জবাব দিলে সের্গেই মিত্রফানোভিচ, 'মাকে ডাকো!

আচ্ছা দাঁড়াও, আমিই ডাকছি,' বলে মাথা নামিয়ে যোগ দিলে, 'আজ আমার এমন...'

'মিত্রফানোভিচ! কী হয়েছে তোমার বলো তো?' দ্রুত তার কাছে ছুটে এল পানিয়া, ওর থুতনি ধরে মুখখানা উঁচু করে তুলে তাকাল তার চোখাচোখি, 'ফের জ্বালিয়েছে তোমায়? জ্বালিয়েছে তো...' বলে তাড়াতাড়ি করে শেষ করলে, 'বলি কি, আমার কথা শোনো, আর ঐ কমিশনের কাছে যেও না। ফি বার ফেরো একেবারে আধমরা হয়ে। যেও না আর, বলছি তোমায়। বেশি টাকায় আমাদের দরকার নেই...'

'সেটা তো কথা নয়,' দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললে সের্গেই মিত্রফানোভিচ তারপর দরজাটা খানিক ফাঁক করে চেঁচাল, 'মা!' তারপর আরেকটু উঁচু গলায়, 'মা!'

'কেন?' অসন্তুষ্টের মতো সাড়া দিলে বুড়ি, বালতিটার শব্দ করে বোঝালে সে কাজে ব্যস্ত, অন্য দিকে মন দেবার সময় নেই।

'ঘরে এ-সো।'

পানিয়ার মা এককালে দলে মিশে ফুর্তি করতে ভালোবাসত, মদ খেত এবং সেটা শুধু উৎসব উপলক্ষেই নয়। এখন কিন্তু সে নিজেকে উপবাসিনী সন্ন্যাসিনী করে তুলেছে। ঘরে ঢুকে টেবিলের ওপর বোতলটা দেখে সে বকবক করে উঠল:

'কী আনন্দে খাওয়া হতেছে শুনি? দ্বিতীয় গ্রুপের পঙ্গু বলে রায় দিয়েছে?'

'তৃতীয় গ্রুপেই রেখে দিলে।'

'তৃতীয়। দ্বিতীয় গ্রুপ তোমারে দেবে নে পরপারে গেলে...'

'নাও বসো, বকবক করো না...'

'বসবার সময় কত... সবজিগুলো কে খুঁড়ে তুলবে নে?'

পানিয়ার মা এবং পানিয়া নিজেও উত্তরাঞ্চলের এক গাঁ থেকে উঠে এসেছে অনেক দিন, কিন্তু কথায় উত্তুরে টান তাদের এখনো যায় নি।

'কতো তোমার সবজি! চারটে হর্স র‍্যাডিশ, গোটা দশেক গাজর!' বললে পানিয়া, 'ডাকতেছে যখন বসো।'

বুড়ি হাতমুখ ধুয়ে বসল টেবিলের দিকে পাশ ফিরে, তারপর জ্বলজ্বলে লেবেল-আঁটা বোতলটা নিলে:

'বোতলেরও ঢঙ কত! দাম হবে নে অনেক?'

'টাকার মায়া করতে হবে না,' পানিয়া বললে মাকে, যেন বেহিসেবী খরচের জন্য সমর্থন করতে চাইলে স্বামীকে।

'দিব্যি স্বাদ!' অনুষ্ঠানের মতো করে পানপাত্র শেষ করে বললে পানিয়ার মা, আর সের্গেই মিত্রফানোভিচের মনে পড়ল টুপি-পরা ছোকরাটা আঙুল দিয়ে পনীর খাচ্ছিল। 'আর তুই অমন চেপে আছিস কেন পানিয়া? কোথা যেন গুজবেরির আচার আছে আমাদের, নোনা শসা আছে। সব আছে আমাদের!' বলে সগর্বে বুকে চাপড় দিলে বুড়ি, তল ভাঁড়ারে নেমে খোঁজাখুঁজি করতে লাগল।

দ্বিতীয় গ্লাস শেষ করার পর বুড়ি বললে:

'আমারে আর বসতে ক'স না,' বলে মেয়ে জামাইকে একা রেখে সে চলে গেল।

সের্গেই মিত্রফানোভিচ চোখ বন্ধ করে দেয়ালে মাথা হেলান দিয়ে বসেছিল সামনের কোণটায়। ন্যাকড়া দিয়ে ধুয়ে মুছে কাঠের পা-টা শুকতে দেওয়া হয়েছিল রুশী চুল্লির ওপর, ওটা না থাকায় হালকা লাগছিল পা, হালকা লাগছিল দেহ।

টেবিল পরিষ্কার করে পানিয়া বসলে স্বামীর কাছে, জড়িয়ে ধরল তাকে:

'একটা গান গাও না। গান আজকাল তুমি কম গাইছ।'

'শোনো!' চোখ মেললে সের্গেই মিত্রফানোভিচ, আর সে চোখের কোন গভীরে যেন একটা ব্যথা দেখতে পেলে পানিয়া। 'আচ্ছা, আমি তোমায় ভালোবাসি, একথাটা বোধ হয় তোমায় আমি একবারও কখনো বলি নি, না?'

চমকে উঠল পানিয়া, সরে এল স্বামীর কাছ থেকে, মুখে ওর ভয় ফুটে উঠল।

'এসব কী বলছ! কী বলছ? থামো তো বাপু।'

'গোটা জীবন কেটে যাচ্ছে, অথচ প্রধান জিনিসটা করা হচ্ছে না।'

'থামো তো, আমায় আর ভয় পাইও না বাপু।'

পানিয়াকে সে টেনে আনল নিজের কাছে, তার হাতের তালুর মধ্যে বৌয়ের মাথাটা কেমন ছেলেমানুষের মতো, অসহায়। তার বাহুর তলে শান্ত হয়ে রইল পানিয়া, মুখ তুললে না, লজ্জা পাচ্ছিল।

তারপর আদর করে পানিয়া হাত বুলাতে লাগল স্বামীর মুখে। কড়া পড়া হাত, স্বামীর না কামানো গালে তা আটকে যাচ্ছিল। 'খরখরে', মনে পড়ল সের্গেই মিত্রফানোভিচের। গুটি গুটি হয়ে পানিয়া মাথা রাখলে তার কাঁধে।

'ভারি লক্ষ্মী তুমি, আমার একমাত্র ধন! সবার জন্য তুমি সুখ চেয়ে বেড়াও, কী করে তা হবে?'

'দুজনে আমরা বুড়ো হয়ে যাচ্ছি,' বাহুর তলে পানিয়ার পিঠের ছুঁচলো মেরুদণ্ডটা অনুভব করতে করতে বললে

সের্গেই মিত্রফানোভিচ, গলার স্বর তার প্রায় শোনা যাচ্ছিল না।

'রাখো, রাখো...'

'বুড়ো হয়ে যাচ্ছি, বুড়ো,' আবার বললে সের্গেই মিত্রফানোভিচ, তারপর বৌকে একটু ঠেলে মিনতি করলে, 'ঢালো না আরেকটু, শেষ বারের মতো। দুজনে মিলে আমরা আমাদের জন্যে, সব বুড়োদের জন্যে খাব।' তারপর নিজেকেই বাধা দিয়ে যোগ দিলে, 'না-না, আমাদের জন্যে খাক অন্যেরা, যদি আমাদের মনে রাখে। আমরা দুজনে খাব ছেলেপিলেদের জন্যে। কোথাও হয়ত এখন যাচ্ছে...'

ক্ষিপ্রের মতো উঠে গেল পানিয়া, কানায় কানায় মদ ঢাললে দুটি পাত্রে, পান করে সশব্দে চুমু খেলে স্বামীর ঠোঁটে, তারপর রুমালে মুখ ঢাকলে।

'আ মরণ!' বারান্দায় বকবক করে উঠল বুড়ি, 'সোহাগ আর ধরে না! গুচ্ছের ছেলেপুলে হলে আর পীরিতির সময় থাকত না।'

সের্গেই মিত্রফানোভিচের চোখের পাতা কেঁপে উঠল, হঠাৎ অসহায় হয়ে উঠল তার মুখ, বসা গাল আর ঠোঁটের নিচের জায়গাটা যা পুরো কামানো হয় নি—বুড়ি তার সবচেয়ে ব্যথার জায়গাটাতেই ঘা দিয়েছে।

পানিয়ার ইচ্ছে হয়েছিল বলে, 'কেবলি যত তোমার বাজে বকবকানি, হয়েছে-টা কী, ছেলেমেয়েরা যতদিন ছোটো, ততদিনই ভালো, বড়ো হলেই বুক থেকে ছিঁড়ে ফেলতে হবে...' কিন্তু বহু বছরের জীবনে ও বুঝতে শিখেছে কখন কী বলা দরকার।

বলল, 'বয়ে গেল। বরং একটা গান গাও। বুকটা হালকা হবে।'

গালে হাত দিয়ে বসে রইল সের্গেই মিত্রফানোভিচ, তারপর মৃদু গলায়, যেন নিজের মনেই গেয়ে উঠল:

উড়ন্ত পাখি সে যে,
যৌবন গেছে উড়ে...

শুনছিল পানিয়া, শুনতে শুনতে রুমাল গুঁজলে মুখে। নিজেই সে বুঝতে পারছিল না কেন সে কাঁদছে, সের্গেইর জন্যে এই মুহূর্তে তার বুক ভালোবাসায় এত ভরে উঠেছিল যে সের্গেই যদি বলে, — যাও মরণকে বরণ করো, তাহলে প্রাণের মধ্যে জবালাময় সুখ নিয়ে সে নির্ভয়ে বরণ করতে পারত মৃত্যুকে।

মুখ থেকে হাত না সরিয়ে, চোখের জলে দৃষ্টি আবছা করে পানিয়া মনে মনে বললে, 'আহা গো মিত্রফানোভিচ! আহা রে আমার পা-খোয়ানো সেপাই!.. যুদ্ধ যে তোমার কবরে যাওয়া পর্যন্ত ছাড়বে না। কোথায় তোমার মন ঘুরে মরছে এখন? হাল পড়েছে ট্রেঞ্চগুলোর জায়গায়, গম পাকছে, আর তুমি এখনো শুধু সেখানেই, শুধু সেখানেই...'

'ওইটেও গাও। আমাদের গানটা।'

'ও... আমাদের গানটা। বেশ।'

ঘোর রজনী কিবা
আলোক উজল দিবা...

আর ফের সের্গেই মিত্রফানোভিচের চোখের সামনে ভেসে উঠল ছাঁটা মাথা ছোকরাগুলো, সাজগোজ-করা মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে ছুটছে ওয়াগনের সঙ্গে সঙ্গে। এটা তাদেরও গান।

বার দেয়ালের কাছে বসে চোখ মুছে গান শুনছিল একদল বুড়ি। পানিয়ার মা অভিযোগের সুরে বার বার বলছিল:

'গানের দলে ওর ডাক পড়েছিল, আর হাঁদাটা কিনা রাজি হল না।'

'তা তুমিই ভেবে দ্যাখো গো, সবাই যদি গানের দলে যায় তাহলে লড়বে কে, খাটবে কে?'

'কথাটা তোমার ঠিক হল না গো আন্‌কুদিনভনা। লড়তে পারে, খাটতে পারে সবাই। কিন্তু প্রতিভা দিয়েছেন ভগবান। কেন দিয়েছেন। কাজে লাগবে বলে।'

'প্রতিভা প্রত্যেকেরই আছে, তবে দেখাতে সবাই পারে না।'

'যেমন আমার প্রতিভা ছিল ছেলে বিয়নো...'

'সেটা সকলেরই আছে একটু বেশি করেই।'

'আস্তে গো আস্তে, গান শোনো।'

কিন্তু আলাপ করতে করতে গান শেষ হয়ে গিয়েছিল। আরো খানিকটা অপেক্ষা করলে বুড়িরা, হাই তুললে, তারপর কেউ ক্রুশ করলে কেউ অমনিই চলে গেল যে যার বাড়িতে।

রাত নামল গ্রামে। নাবাল থেকে, নদী থেকে মাঠ বেয়ে ভেসে এল তুহিন আমেজ, অচিরেই ঘাসে ঘাসে ফুটল হিম। শাদা হতে শুরু করল সবজিভুঁই, ঘাস কাটা মাঠ, বাড়ির চালা। দাঁড়িয়ে রইল নিশ্চল বন, আর তাদের আঁকড়ে রইল শেষ পাতাগুলো।

সকাল বেলায় বন ভরে ওঠে খড় খড়, গমগম শব্দে। এখন শুধু গাঁয়ের ওপর ভেসে রইল কেবল অন্ধকার আকাশ আর জ্বলজ্বলে চক্ষুষ্মান তারা। এই ধরনের তারা দেখা যায় কেবল হেমন্তে।

পৃথিবীতে বিছিয়ে গেছে শান্তি। ঘুমচ্ছে লোকে। আর কোথায় যেন চিরনিদ্রায় ঘুমচ্ছে হাতিয়ার বন্ধ ডিট্যাচমেণ্ট, অনেক অনেক হাতিয়ার বন্ধ ডিট্যাচমেণ্ট। বহু বহু যুদ্ধের লোহা আর রক্তে ভারাক্রান্ত পৃথিবী দ্বিরুক্তি না করে গ্রহণ করেছে যত ধাতুর টুকরো, চাপা দিয়েছে যত সংগ্রামের প্রতি-ধ্বনি, কিন্তু পুরনো সৈন্যের দেহে যুদ্ধ টিকে আছে অবিস্মৃত। অবিরামই সে তাকে টের পায় নিজের মধ্যে।



ইউরি কাজাকভ। ১৯২৭ সালে মস্কোয় জন্ম। গোর্কি সাহিত্য ইনস্টিটিউট শেষ করেন। ১৯৫৯ সালে প্রথম গল্পগ্রন্থ 'ছোটো স্টেশনে' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তরুণ লেখকের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। পরে বেরয়: 'উত্তরের ডায়েরি', 'পথে', 'ফিরোজা আর সবুজ', 'ডিসেম্বর মাসে দু'জন' প্রভৃতি বই। নিখুঁত ভাষা ও গভীর কাব্যময়তা তাঁর গল্পের বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতির কবি তিনি, সুখ, জীবনের অর্থ, শ্রমকীর্তির সমস্যায় তিনি ভাবিত।

ওক বনে হেমন্ত

নদী থেকে জল আনবার জন্যে বালতি নিলাম। সে রাতে আমার মেজাজটা ছিল বেশ ভালো, কেননা রাতের লঞ্চে ও আসছে। তবে সুখ জিনিসটা কী, তা আমার জানা ছিল, জানতাম তার ছলনা, তাই ইচ্ছে করেই বালতিটা নিলাম, যেন ওর আসার ভরসা করছি না, স্রেফ জল আনতে যাচ্ছি। সে হেমন্তে সবকিছুই আমার বড়ো বেশি ভালো যাচ্ছিল।

সেটা ছিল শেষ হেমন্তের ঘোর কৃষ্ণ রাত, তাই বাড়ি থেকে বেরবার ইচ্ছে হচ্ছিল না, তাহলেও বেরুলাম। লণ্ঠনের পলতে ঠিক করতে লাগল অনেকক্ষণ, তারপর যখন ঠিক করে আলো জ্বালালাম, চিমনিটা সঙ্গে সঙ্গেই কুয়াসাচ্ছন্ন হয়ে গেল, মিটমিট করতে লাগল আলোর ক্ষীণ শিখাটা, তারপর আগুন যখন বেশ ধরে উঠল, তখন শুকিয়ে গিয়ে স্বচ্ছ হয়ে উঠল চিমনিটা।

বাড়ির আলো ইচ্ছে করেই নেবালাম না। লার্চ বীথি ধরে ওকা নদীতে নামা পর্যন্ত আলোকিত জানলাটা বেশ দেখা যাচ্ছিল। আমার লণ্ঠনটা থেকে কাঁপা কাঁপা আলো পড়ছিল সামনে, আলো পড়ছিল এদিক ওদিক, নিশ্চয় আমাকে দেখাচ্ছিল কোনো পয়েণ্টস্‌ম্যানের মতো, শুধু আমার হাইবুটের তলে মচমচ করছিল রাতের দিকে ভিজে ওঠা ম্যাপল গাছের পাতা আর লার্চ গাছের কাঁটা, লণ্ঠনের ঘোলা আলোতেও তা দেখাচ্ছিল সোনালী। ন্যাড়া ঝোপগুলিতে দু'-একটা বৈঁচি তখনো টিকে ছিল।

রাতে লণ্ঠন নিয়ে একা একা যেতে কেমন গা ছমছম করে। বুট খসখস করছি শুধু আমি একা, একা আমার ওপরেই আলো পড়েছে, শুধু আমাকেই দেখা যাচ্ছে, বাকি সবকিছুই লুকিয়ে গিয়ে নীরবে লক্ষ করছে আমাকেই।

বনপথটা খাড়াই নেমে গেছে নিচে, বাড়ির জানলার আলোটা হারিয়ে গেল অচিরেই, তারপর বনবীথিটাও শেষ হয়ে গেল। শুরু হল এলোমেলো ঝোপঝাড়, ওক আর ফার গাছ। বালতির ধাক্কা লাগছিল লম্বা লম্বা ডেইজি ফুলের গাছগুলোয়, ফার গাছের ঝালর আর ন্যাড়া ন্যাড়া কী সব ডালে, কখনো চাপা কখনো জোরে ঝনঝন শব্দ উঠছিল, নৈঃশব্দের মধ্যে তা শোনা যাচ্ছিল অনেক দূর পর্যন্ত।

হাঁটা পথটা হয়ে উঠল আরো খাড়াই আর সর্পিল, বার্চ গাছ দেখা গেল ঘন ঘন, অন্ধকারের মধ্যে মিনিটে মিনিটে ঝলক দিচ্ছিল তাদের শাদা শাদা কাণ্ড। তারপর বার্চ গাছও শেষ হয়ে গেল, পাথর ঠেকতে লাগল পথে, তাজা ঝাপটা লাগল মুখে, আর লণ্ঠনের আলোর বৃত্তটার বাইরে কিছুই দেখা না গেলেও সামনে একটা বিশাল ফাঁকার অস্তিত্ব টের পেলাম, নদীর কাছে এসে পড়েছি আমি।

ডান দিকে দূরের বোয়াটা এখানে চোখে পড়ল আমার। তার লাল আলোটা জলে প্রতিবিম্বিত হয়ে দুটো আলো হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারপর আমার দিকে আরো কাছের বোয়াটা দেখতে পেলাম, এটাও সামান্য মিটমিট করছিল, তারপর ফুটে উঠল নদীটা।

ভেজা ঘাসের ওপর দিয়ে ঝোপঝাড়গুলো পেরিয়ে নিচে নামতে লাগলাম নদীর সেই জায়গাটার দিকে, আমাদের এই বন গাঁয়ে কেউ এলে যেখানে সাধারণত লঞ্চ থামে। অন্ধকারে একঘেয়ে কলকল করে চলেছে নদীর কাছের ঝরনাটা। লণ্ঠন নামিয়ে রেখে আমি ঝরনার কাছে এলাম, জল নিলাম, ঝরনা থেকে কিছুটা খেয়েও নিয়ে মুখ মুছলাম আস্তিন দিয়ে। তারপর লণ্ঠনটার কাছে ভেজা বালতিটা রেখে দূরের জেটিটার দিকে চেয়ে রইলাম।

লঞ্চটা জেটিতেই দাঁড়িয়ে ছিল, সামান্য দেখা যাচ্ছিল তার লাল সবুজ আলো। বসে বসে সিগারেট টানতে লাগলাম আমি। হাত আমার ঠাণ্ডা, কাঁপছিল। হঠাৎ মনে হল ও যদি এ লঞ্চে না এসে থাকে, তাহলে লঞ্চ থেকে আমার আলোটা চোখে পড়লে হয়ত লোকে ভাববে আমি লঞ্চে যেতে চাইছি, তীরে ভেড়াবে। তাই লণ্ঠনটা নিবিয়ে দিলাম।

সঙ্গে সঙ্গেই অন্ধকার হয়ে গেল। শুধু নদী বরাবর জ্বলতে লাগল বোয়ার আলোর সূচীমুখগুলো। স্তব্ধতা হয়ে উঠল গমগমে। এত রাতে তীর বরাবর বহু কিলোমিটার জুড়ে আমি ছাড়া নিশ্চয় আর কোনো লোক নেই। আর ওপরে ফার বনটার ওপাশে অন্ধকার গ্রামটা অনেক আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে, শুধু গ্রামপ্রান্তে আলো জ্বলছে আমার বাড়িটাতেই।

হঠাৎ আমার কাছে ওর আসার দীর্ঘ পথটা আমার কল্পনায় ভেসে উঠল, কিভাবে সে রওনা দিলে আর্খাঙ্গেলস্ক থেকে,

কিভাবে সে ঘুমিয়েছে নয়ত বসে থেকেছে ট্রেনের জানলার কাছে, কথা কয়েছে কারো সঙ্গে। আমার মতোই সেও কিভাবে অপেক্ষা করে থেকেছে এই সাক্ষাৎটার জন্যে। আর এখন সে নদী উজিয়ে আসতে আসতে ওকা নদীর তীর দেখছে, ওকে যখন আসতে লিখি তখন এই তীরের বর্ণনা দিয়েছিলাম আমি। কিভাবে সে ডেকে এসে দাঁড়াচ্ছে, স্যাঁতসেঁতে ওক বনের গন্ধভরা হাওয়া এসে ঝাপট মারছে তার মুখে। কী আলাপ হয়েছে ওর ঘর্মাক্ত সার্সির ভেতরে, উষ্ণতার মধ্যে, কিভাবে লোকে ওকে বুঝিয়েছে কোথায় নামতে হবে, কেউ নিতে না এলে রাত কাটানো যাবে কোথায়।

তারপর উত্তরাঞ্চলের কথা মনে পড়ল আমার, সেখানে আমার ঘোরা ফেরা, শ্বেত রাত্রিতে আমাদের দুজনে মিলে সেই জুবাৎকা মাছ মারা। অঘোরে ঘুমাচ্ছিল জেলেরা, নাক ডাকছিল, থেকে থেকে নিঃশ্বাস আটকে যাচ্ছিল, আমরা কিন্তু ভাটার অপেক্ষায় ছিলাম, নৌকো নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম সমুদ্রে। নিঃশব্দে দাঁড় বাইছিল ও, আর আমি চেয়ে ছিলাম সমুদ্রের গভীরে, জলজ উদ্ভিদগুলোর ঝোপের মধ্যে মাছের সন্ধান করছিলাম। আলগোচে হারপুন চালাই আমি, জুবাৎকার মাথায় বিঁধিয়ে দিই তার ছুঁচলো ডগাটা, তারপর জল থেকে টেনে তুলি। ওঠাবার সময় জল ছিটকিয়ে লাগে আমাদের মুখে, হারপুনে বিঁধে ছটফট করছিল মাছটা, ভয়ংকর মুখটা হাঁ করছিল, স্প্রিঙের মতো সোজা হয়ে উঠছিল, দেখাচ্ছিল যেন ট্রিটন। তারপর নৌকোর খোলের মধ্যেও অনেকক্ষণ ছটফট করেছে ওটা, যা ওর সামনে পড়েছে কামড়ে ধরেছে।

গোটা বছরটার কথাই মনে পড়ছিল, আমার পক্ষে এটা সৌভাগ্যের বছর, অনেক গল্প লিখতে পেরেছি তখন, প্রাকশীতের এই নিবে আসা প্রকৃতির মধ্যে, নদী তীরে আরো

যে কটি নির্জন শান্ত দিন বাকি রইল, তার মধ্যে হয়ত আরো কিছু লিখব...

চারপাশে আমার গহন রাত, সিগারেটে টান দেবার সময় আমার হাত, মুখ, হাইবুট আলো হয়ে উঠছিল, তবে তাতে তারাগুলো দেখতে অসুবিধা হচ্ছিল না। আর এ হেমন্তে তা এত জ্বলজ্বলে ও অসংখ্য যে তাদের ধূসর ছটা বেশ চোখে পড়ছিল, দেখা যাচ্ছিল আলো হয়ে ওঠা নদী আর গাছপালা, তীরের শাদা নুড়ি, ঢিপিগুলোর ওপর কালচে চারকোণা ক্ষেত, খাদগুলো ক্ষেতের চেয়ে অনেক কালো আর গন্ধভরা।

সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল, জীবনের সবচেয়ে বড়ো কথা এই নয় যে তিরিশ, পঞ্চাশ বা আশী বছর, কতদিন বাঁচলাম, কেননা শেষ পর্যন্ত সে আয়ু অল্পই, মৃত্যুটা ভয়ংকরই হবে; প্রধান কথা হল প্রত্যেকের জীবনে এ ধরনের রাত আসবে কতগুলি।

জেটি ছেড়ে লঞ্চটা সরে গেছে। তখনো তা এত দূরে যে গতিটা ধরা যায় না। মনে হচ্ছিল যেন দাঁড়িয়ে আছে এক জায়গায়, কিন্তু জেটি থেকে তার ব্যবধান বাড়ছিল, তার মানে এবার ওটা উজানে আসছে, আমার দিকে। অচিরেই এঞ্জিনের চড়া আওয়াজ শোনা গেল আর হঠাৎ আমার ভয় করে উঠল, মনে হল ও আসবে না, লঞ্চে ও নেই, খামোকাই অপেক্ষা করছি। আমার কাছে আসতে ওকে কত দূরত্ব, কত দিন উত্তীর্ণ হতে হবে সেটা হঠাৎ ভেসে উঠল চোখের সামনে, মনে হল এ সবই কত নড়বড়ে, দুজনে মিলে এখানে এক সুখের জীবন গড়ার এই পরিকল্পনাগুলো।

'কী ব্যাপার!' চেঁচিয়েই বলে উঠলাম আমি, উঠে দাঁড়ালাম। বসে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল, পায়চারি করতে

লাগলাম তীরে। 'কী ব্যাপার!' থেকে থেকেই অসহায়ের মতো পুনরুক্তি করতে লাগলাম কথাটা আর কেবলি তাকাচ্ছিলাম লঞ্চটার দিকে, ভাবছিলাম বালতিটা নিয়ে একা একা ফিরতে কী অসহ্য লাগবে, কী ফাঁকা হয়ে উঠবে বাড়িটা। সত্যিই কি আমাদের কপাল খারাপ, এতগুলো দিন আর অতগুলো ব্যর্থতার পর দেখা হবে না আমাদের, সবই বৃথা যাবে?

মনে পড়ল তিন মাস আগে উত্তরাঞ্চল থেকে আমার ঘরে ফেরার কথা, ফিশারি থেকে ও আমাদের গাঁয়ে এসেছিল আমায় বিদায় জানাতে, দাঁড়িয়েছিল ও সাঁকোর ওপর, দূর যাত্রার জাহাজ ধরার জন্যে আমি মোটর-বোটে উঠছিলাম, আর কেবলি একটা কথাই ও বলে যাচ্ছিল, 'কোথায় যাচ্ছ তুমি? কিছুই বোঝো না, কিছুই বোঝো না তুমি। কোথায় যাচ্ছ?' আর মোটর-বোটের মধ্যে আমি নানা জনের বিদায় বাণী, মেয়েদের চোখের জল, ছোকরাদের ডাকাডাকি আর নানা ধরনের চিৎকারের মধ্যে বুঝলাম যে চলে যেয়ে ভারি ছেলেমানুষি করছি, শুধু ক্ষীণ একটু ভরসা ছিল ভবিষ্যতে যে করে হোক সব ঠিক হয়ে যাবে।

লঞ্চটা কাছিয়ে এল, পায়চারি করা থামিয়ে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম কালো জলের ওপরকার খাড়াই পাড়টায়, চোখ কুঁচকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম ওটার দিকে, আশায় উত্তেজনায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছিল।

এঞ্জিনের শব্দ হঠাৎ চড়া থেকে খাদে নেমে গেল, জ্বলে উঠল সার্চ লাইট, তির্যক ধোঁয়াটে আলো এসে পড়ল তীরে, পিছলে গেল গাছ থেকে গাছে। তীরে ভেড়ার জায়গা খুঁজছিল লঞ্চটা। কেবলি ডান দিকে ঘেঁসে আসছিল ওটা, সার্চ লাইটের প্রখর আলো এসে পড়ল আমার মুখে, ঘাড় ফিরিয়ে

নিলাম আমি, তারপর আবার তাকিয়ে দেখলাম। ওপরকার ডেকে একজন খালাসী দাঁড়িয়ে আছে। নিচে নেমে তীরে সিঁড়ি নামিয়ে দেবার জন্যে সে তৈরি। আর তার পাশে কী একটা হালকা রঙের পোষাকে দাঁড়িয়ে আছে ও।

আলগোচে তীরের বেশ ভেতর দিকে এগিয়ে এল লঞ্চের গলুই, সিঁড়ি নামিয়ে দিলে খালাসী, ওকে নামতে সাহায্য করলে, আমি স্যুটকেসটা ধরলাম, নিয়ে গিয়ে রাখলাম বালতিটার কাছে, তারপর ধীরে ধীরে ঘাড় ফেরালাম। সার্চ লাইটের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছিল, কিছুতেই দেখতে পাচ্ছিলাম না ওকে। বনময় ঢালুর ওপর প্রকাণ্ড এক টালমাটাল ছায়া ফেলে ও এগিয়ে এল আমার দিকে। ইচ্ছে হল চুমু খাই, পরে ভাবলাম, না, সার্চ লাইটের আলোয় তা বড়ো বেমানান হবে, হাত দিয়ে সে আলো আড়াল করে স্রেফ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা, টান-টান হেসে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম লঞ্চটাকে। পিছিয়ে যাচ্ছিল লঞ্চটা, সরে গেল সার্চ লাইটের আলো, তারপর একেবারেই নিবে গেল; ফের গুঞ্জন করে উঠল এঞ্জিন, আর নিচের সেলুনের লম্বা এক সারি আলোকিত জানলা নিয়ে দ্রুত উজানের দিকে এগুতে লাগল লঞ্চটা। আমরা রইলাম একা।

'কেমন আছ,' বললাম অপ্রতিভের মতো।

পায়ের পাতার ওপর উচু হয়ে দাঁড়িয়ে সে সজোরে আমার কাঁধ জড়িয়ে ধরে চুমু খেলে চোখে।

'চলো, যাওয়া যাক,' বলে কাসলাম আমি, 'শালা, কী অন্ধকার। দাঁড়াও আলোটা জ্বালি...'

লণ্ঠন জ্বাললাম, ফের সেটা প্রথমে বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে উঠল, পলতে ধরে উঠে চিমনি শুকিয়ে স্বচ্ছ না হয়ে ওঠা পর্যন্ত সবুর করতে হল। তারপর রওনা দিলাম আমরা, স্যুটকেস

আর লণ্ঠন নিয়ে আমি সামনে, জলের বালতিটা নিয়ে ও পেছনে।

'বইতে কষ্ট হচ্ছে?' জিজ্ঞেস করলাম মিনিট খানেক পরে।

'সে তোমায় ভাবতে হবে না, তুমি এগোও তো!' ভাঙা ভাঙা গলায় বললে সে।

বরাবরই ওর গলার স্বর ভাঙা ভাঙা, হেঁড়ে এবং মোটের ওপর ও খুব কাঠখোট্টা, তাগড়াই, অনেকদিন ওর এই দিকটা আমার ভালো লাগত না। কারণ মেয়েদের মধ্যে আমি কোমলতা পছন্দ করি। কিন্তু এখন, এইখানে, নদী তীরে, রাতে, বাড়ির দিকে এগুবার সময়, উষ্মা, বিরহ, চিঠিপত্র আর অদ্ভুত সব আতঙ্কিত স্বপ্নের এতগুলো দিনের পর তার গলার স্বর, শক্তসমর্থ দেহ, খসখসে হাত, তার উত্তুরে বুলি সবই যেন এক হেমন্তের ঝাঁক থেকে পিছিয়ে পড়া কোন বুনো পাখির আমেজ এনে দিচ্ছিল।

ডাইনে খাদের দিকে মোড় নিলাম আমরা। কে জানে কবে এখানে ওপরে ওঠার পাথর বাঁধানো রাস্তা পেতেছিল কে, ছোট্ট সংকীর্ণ পথটা এখন গাছ পালায় ছাওয়া। অন্ধকারের মধ্যে তা দিয়ে আমরা উঠতে লাগলাম ওপরে, কোনোক্রমে পথ দেখা যাচ্ছিল লণ্ঠনটায়, মাথার ওপরে তারার নদী, পাইনের কালো কালো ডালপালা ভেসে যাচ্ছে তাতে, তারাগুলোকে একেক বার খুলছে আর আড়াল করছে।

প্রায় দম আটকে আমরা পেঁছিলাম লার্চ বীথিটায়। হাঁটতে লাগলাম পাশাপাশি।

হঠাৎ আমার ইচ্ছে হল সবকিছু ওকে দেখাই, এখানকার লোকজন, ছোটোখাটো নানা ঘটনার কথা ওকে বলি। বললাম, 'দেখেছ গন্ধ কী রকম।'

'মদিরার গন্ধ,' সামান্য হাঁপাতে হাঁপাতে বললে সে, 'অনেকক্ষণ থেকেই টের পাচ্ছি, সেই লণ্ডে থাকতেই...'

'পাতার গন্ধ। এদিকে একটু এসো তো দেখি!'

লার্চ বীথিতে মালপত্র রেখে আমরা খাল ডিঙিয়ে লণ্ঠনের আলোয় ঝোপের ভেতর ঢুকলাম।

'এইখানেই কোথাও ওটার থাকার কথা...' বিড়বিড় করলাম আমি।

'ব্যাঙের ছাতা,' পেছন থেকে অবাক হয়ে বললে ও।

শেষ পর্যন্ত যা খুঁজছিলাম পাওয়া গেল। ঘাস, পাইনের কাঁটা আর হলদে পাতাগুলোর মধ্যে ছড়ানো মুরগী ছানার পালক।

'এই দ্যাখো,' বলে আলো ফেললাম, 'আমাদের গাঁয়ে একটা মুরগী-খামার আছে। ছানাগুলো বড়ো হলে তাদের চরতে ছেড়ে দেওয়া হয়। আর এদিকে শেয়াল এসে রোজ লুকিয়ে থাকে ঝোপে। ছানাগুলো একটু ছড়িয়ে পড়লেই ও একটা না একটাকে ধরে সঙ্গে সঙ্গেই খেয়ে ফেলে।'

মনে মনে কল্পনা করলাম শেয়ালটাকে, কালচে মুখটা হয়ে উঠেছে শাদা, নাক থেকে পালক ঝেড়ে ফেলার জন্যে ফ্যাঁচফ্যাঁচ করছে, চাটছে।

'ওটাকে মারা দরকার!' বললে ও।

'বন্দুক আছে আমার, দুজনে আমরা বনে ঘুরে দেখব, বাগে পেয়েও যেতে পারি।'

আবার লার্চ বীথিতে ফিরে হাঁটতে লাগলাম। দেখা গেল আমার বাড়ির আলোকিত জানলাটা, ভাবতে লাগলাম এক্ষুণি পেঁৗছে কী করব। সঙ্গে সঙ্গেই মদ খাওয়ার ইচ্ছে হল আমার। বাড়িতে অ্যাশবেরি ব্র্যান্ডি আছে, নিজেই তৈরি করেছি। বনে গিয়ে দিব্যি অ্যাশবেরি ছিঁড়ে বাড়ি এসে তাকে পিষে

হলদে হলদে ফেনা বার করে ভোদকার বোতলে থিতোতে দিই।

'অথচ আমাদের ওখানে এখন শীত!' কেমন যেন অবাক হয়ে বললে সে, 'দ্ভিনা জমে গেছে, শুধু মাঝখান দিয়ে একটা পথ করেছে আইসব্রেকার। চারিদিক শাদা, শুধু ওই পথটা কালো... ভাপ ওঠে সেখান থেকে। আর সেই কালো জলের ওপর দিয়ে যখন জাহাজ যায় তখন পাশেই বরফের ওপর ছোটাছুটি করে কুকুর। আর কেন জানি ছোটাছুটি করে একসঙ্গে তিনটে ক'রে।'

তিনটে ক'রে কথাটা ও বললে কেমন উত্তুরে টান দিয়ে আর আমার মনে ভেসে উঠল দ্ভিনা, জাহাজ, আর্খাঙ্গেলস্ক, শ্বেত সাগর তীরে সেই গাঁ, যেখান থেকে ও এসেছে, দোতালা উঁচু ফাঁকা কুটির, কালো কালো দেয়াল, নীরবতা, নিঃসঙ্গতা।

'এর মধ্যেই বরফ দেখা দিয়েছে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি, 'সমুদ্রে?'

'হ্যাঁ, এগিয়ে আসছে,' বলে ফের কী যেন ভাবলে, হয়ত যা ও সেখানে ফেলে এসেছে তার কথা, 'ফেরার সময় বলগা হরিণের স্লেজে যেতে হবে, যদি...'

বলে হঠাৎ চুপ করে গেল সে। আমি তার নিঃশ্বাস আর হাঁটার শব্দ শুনতে শুনতে কিছুটা অপেক্ষা করলাম, তারপর জিজ্ঞেস করলাম:

'যদি মানে?'

'কিছুই না,' বড়ো বেশি ভাঙা ভাঙা গলায় অলসভাবে বললে সে, 'যদি আরো বরফ এগিয়ে আসে, এই আর কি।'

দাওয়ায় দুমদাম করে পা থেকে ধুলো ঝেড়ে ভেতরে ঢুকলাম।

চারিদিকে চেয়ে ও বললে, 'আ-া!' মাথা থেকে নীল

রুমালটা খসালে। অবাক বা খুশি হলে ও সবসময় খাটো গলায় ধীরে ধীরে বলত, 'আ-া-া!'

বাড়িটা ছোটো, পুরনো, এক মস্কোবাসীর কাছ থেকে ওটা ভাড়া নিয়েছি, তিনি এখানে ছিলেন কেবল গ্রীষ্মকালটা। পুরনো খাট আর চেয়ার টেবিল ছাড়া আসবাবপত্র কিছুই প্রায় ছিল না। দেয়ালগুলো পোকায় খাওয়া, শাদা শাদা গুঁড়ো ছিটানো। তবে রেডিও ছিল বাড়িতে, ছিল বিজলী আলো, স্টোভ আর মোটা মোটা কয়েকটা পুরনো বই, সন্ধেগুলোয় বসে বসে যা পড়তাম।

বললাম, 'কোট খোলো। এবার চুল্লি ধরাব...'

চুল্লির জন্যে কাঠ ফাড়তে গেলাম আঙিনায়। কিন্তু সুখে আমি যেন কেমন হয়ে গিয়েছিলাম, ঝিমঝিম করছিল মাথা, হাত কাঁপছিল। গোটা শরীরটা যেন শিথিল হয়ে এসেছিল, ইচ্ছে হচ্ছিল বসে থাকি। তীক্ষ্ণ হয়ে ঝকমক করছিল তারাগুলো। বুঝলাম খুব ঠান্ডা পড়বে, সকাল নাগাদ সমস্ত পাতা যাবে ঝরে, এবার শীতের পালা।

ওকা নদী থেকে ধীরে ধীরে ভেসে এল সুরেলা বাঁশি, টিলাগুলোয় ধাক্কা খেয়ে অনেকক্ষণ তা গমগম করলে। কোথায় একটা স্টিমার যাচ্ছে নিশ্চয়, সাবেকী বাষ্পে টানা স্টিমার, যা আজকাল কম দেখা যায়। নতুন স্টিমারগুলোয় বাঁশির আওয়াজ অল্পস্থায়ী, চড়া, নাকি-নাকি। বাঁশির শব্দে জেগে উঠে মুরগী-খামারে ক্যাঁককোঁকিয়ে ডেকে উঠল কয়েকটা মোরগ...

কাঠ ফেড়ে ঘরে ঢুকলাম। ওভারকোট খুলে ও আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে স্যুটকেস থেকে খবরের কাগজে মোড়া কী একটা জিনিস বার করছিল। পরনে ওর ফুল-তোলা একটা গাউন, গায়ে আঁট হয়, এই পোষাকে ওকে মস্কোর কোনো

বাড়িতে বা ক্লাবে সঙ্গে নিয়ে গেলে সবাই নিশ্চয় অলক্ষ্যে হাসত, অথচ এইটাই বোধ হয় ওর সেরা পোষাক। সাধারণত ও চলাফেরা করত ট্রাউজার পরে, তলটা গোঁজা থাকত হাইবুটের ভেতর, আর ওপরে থাকত কোনো একটা পুরনো বিবর্ণ স্কার্ট, ওখানে ওটা ভারি যুৎসই হত।

কেটলি চাপিয়ে চুল্লি ধরাতে লাগলাম। অচিরেই গুঞ্জন করে উঠল সেটা, ফটফট করতে লাগল লকড়ি, ধোঁয়া আর কাঠের গন্ধ ছড়াল।

'এটা তোমার জন্যে,' পেছন থেকে বললে সে।

ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম টেবলে এক খাশা সালমন মাছ। ম্যাড়মেড়ে রুপোলী রঙ, চওড়া কালচে পিঠ, নিচের চোয়ালটা ওপর দিকে বেঁকে গেছে। ঘর জুড়ে ভরভর করছে মাছের গন্ধ... ভ্রাম্যমাণ জীবনের কথা ভেবে ফের মন কেমন করে উঠল আমার।

ও হল সমুদ্রবাসী, বলতে কি, গ্রীষ্মকালের এক সোনালী রাতে মোটর-বোটের মধ্যেই ওর জন্ম। কিন্তু রাতগুলো সম্পর্কে ও ছিল উদাসীন। তবে সে রাতগুলোকে আদপেই খেয়াল করে তো কেবল নবাগতরা, স্তব্ধতা আর নিঃসঙ্গতায় তারা পাগল-পাগল হয়ে ওঠে। কেউ যখন ওখানে আসে নিতান্ত অতিথির মতো, থাকে সবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন, সবার কাছে বিস্মৃত হয়ে, তখনি কেবল রাতে ঘুম আসে না, কেবলি সে ভাবে: হুঁ, এটা কিছু না, এ হল নেহাৎ রাত, আমি তো আর এখানে বরাবরের জন্যে নই, বয়েই গেল এই রাতে, থাকুক না সূর্য সমুদ্রের ওপাশে লুকিয়ে। ঘুমো, ঘুমো...

আর ও? ফিশারিতে রাতের পর রাত ও অঘোরে ঘুমত মোটা পর্দার পেছনে, কেননা ভোর হতেই ওকে উঠতে হত, তাগড়াই জেলেদের সঙ্গে জাল টানতে হত একত্রে, মাছ বার

করে রান্না করত সুপ, বাসন ধুত... আমি না আসা পর্যন্ত এই ছিল তার বরাবরকার প্রতি গ্রীষ্মের রুটিন।

আর এখন ওকা তীরে আমরা অ্যাশবেরি ব্র্যান্ডি আর সালমন মাছ খাচ্ছি, আলাপ করছি নানা কথা। মনে পড়ছে কিভাবে আমরা শ্বেত রাত্রিগুলোয় সমুদ্রে চলে যেতাম জুবাৎকা মারতে, কিভাবে একবার ঝড়ের মধ্যে জেলেদের সঙ্গে একত্রে জাল টেনেছিলাম, হাবুডুবু খেয়েছিলাম লোনা জলে, কিভাবে রুটির জন্যে যেতাম আলোকস্তম্ভে, কিভাবে একবার রাত্রে গাঁয়ের পাঠাগারে জুতো আর বালাপোষের কুর্তা খুলে আমাদের ফিশারিতে থাকাকালীন যত পত্রপত্রিকা এসেছে সব বসে বসে পড়েছিলাম।

চুল্লির কাছে মেঝের ওপর ফারকোট বিছালাম আমি, ফারগুলো রইল ওপর দিকে, পাশেই কেটলি চকোলেট আর কাপ নিয়ে শুয়ে পড়লাম তার ওপর, কখনো দু'জন মুখোমুখি চেয়ে থাকি, কখনো চুল্লিতে আগুনের খেলা দেখি, আর এইভাবেই যাতে অনেকক্ষণ শুয়ে থাকা যায় তাই মাঝে মাঝে উঠে কাঠ গুঁজে দিই চুল্লিতে, শোঁ শোঁ করে ওঠে কাঠ আর আঁচ থেকে খানিকটা করে সরে যাই আমরা।

রাত দু'টোয় অন্ধকারে উঠে দাঁড়ালাম আমি, ঘুম আসছিল না। মনে হচ্ছিল, যদি ঘুমিয়ে পড়ি, ও কোথাও হয়ত চলে যাবে, ওকে আর ছুঁয়ে থাকা যাবে না, অথচ আমার ইচ্ছে ও যেন সর্বক্ষণ আমার পাশে থাকে, আর পাশে যে আছে সেটা যেন আমি জানতে পারি। ইচ্ছে হচ্ছিল বলি: আমায় তোমার স্বপ্নের মধ্যে নিয়ে নাও, তাহলে সর্বক্ষণ তোমার সঙ্গে থাকতে পারব, কেননা বেশিক্ষণ ছেড়ে থাকা যে অসম্ভব। তারপর আমার মনে হল, যে সব লোক আমাদের ছেড়ে যায়, আর

কখনো দেখা হয় না, আমাদের কাছে তারা হয়ে যায় মৃতবৎ। আমরাও তাদের কাছে। আনন্দে অথবা আকুলতায় যখন ঘুম আসে না, তখন অদ্ভুত সব ভাবনা খেলে মাথায়।

'ঘুমোচ্ছ?' জিজ্ঞেস করলাম আস্তে করে।

'না,' বিছানা থেকে সাড়া দিলে ও, 'ভারি ভালো লাগছে। এদিকে তাকিও না, পোষাক পরে নিই...'

তখন আমি কোণে গিয়ে দেয়াল থেকে স্ট্র্যাপে ঝোলানো রেডিওটা খুললাম। নানা ধরনের ক্যাঁকোঁ শব্দ আর ঘোষকদের বিড়বিড়ানির মধ্যে চেষ্টা করলাম সঙ্গীত ধরার। জানতাম কোথাও না কোথাও সঙ্গীত হবেই, পেয়েও গেলাম। কোনো এক পুরুষ কণ্ঠ ইংরেজিতে কী বললে, তারপর যতি, বুঝলাম এবার বাজনা শুরু হবে।

শিউরে উঠলাম আমি, কেননা প্রথম ধ্বনিটাতেই সুরটা চিনতে পারা গেল। যখন আমার মন ব্যথিত অথবা পুলকিত হয়, তখন সর্বদাই এই জ্যাজ ব্যান্ডের সুরটা মনে পড়ে। সুরটা আমার মনে ধরার মতো নয়, কিন্তু কী একটা গোপন ভাবনা রণিত হয়ে ওঠে তাতে, বোঝা যায় না সেটা বিষাদের নাকি আনন্দের। যখন কোথাও যেতাম, কোনো কিছু যদি আমায় পুলকিত বা পীড়িত করত, তাহলে সর্বদাই মনে পড়ত ওটা। মস্কোর সেই রাতটা, যখন আমরা কেবলি কোথাও গেছি, গেছি আর হেঁটেছি, নিঃসঙ্গ, বিষণ্ণ, গোটা রাতের মধ্যে একটা ভর্ৎসনার কথাও ওর মুখে শুনি নি, আর লজ্জায় মরে যাচ্ছিলাম আমি—সে রাতেও ওটা মনে পড়েছিল।

মস্কোয় গোটা পাঁচেক ফাঁকা ফাঁকা দিন কাটিয়ে ও চলে যায় আর্খাঙ্গেলস্কে। মস্কোর রেল স্টেশনে বরাবর যা হয়ে থাকে, সবই ঠিক তেমনি: ঠেলাগাড়ি ঠেলছে মুটেরা, গুঞ্জন করছে অটোমেটিক কেরিয়ার, চারিদিকেই শশব্যস্ততা, বিদায়

জ্ঞাপন, গাড়ি ছাড়তে সামান্য বাকি... চলে যাচ্ছে ও, যদিও তখনই না গেলেও পারত, হাতে সময় ছিল ওর, ছিল আরো দিন কয়েক ছুটি। আর আমার খারাপ লাগছিল, তিক্ত লাগছিল, রাগ হচ্ছিল নিজের ওপর, ওর ওপর। মনে হচ্ছিল, ওকে ছাড়া কী ফাঁকা ফাঁকা লাগবে আমার, মন-কেমন কাটানোর জন্যে ফের মদ ধরতে হবে। বললাম, 'যেও না!'

সামান্য হাসলে ও, কাঁপা কাঁপা চোখে চেয়ে দেখলে নিচু থেকে আমার দিকে। চোখ ওর গাঢ় রঙের, তাতে সবুজের ছটা, বোঝা যেত না সে চোখ সবুজ না কালো। কিন্তু তখন যখন ও আমায় চেয়ে দেখছিল, তখন তা ছিল কালো। সেটা আমার বেশ মনে আছে।

'কী বোকার মতো ব্যাপার!' বললাম আমি, 'সেবার কিছুই না বুঝে আমি চলে এলাম উত্তর থেকে, এবার তুমি... কী বোকার মতো কাণ্ড! যেও না!'

'এখন আর বলে কী ফল,' জ্বালার সঙ্গে বললে সে।

'কোথাকার কোন এক আত্মীয়ের বাড়ি ওঠার কী দরকার ছিল—সারাক্ষণই যে বাড়িতে থাকে!'

'তাহলে উঠব কোথায়? তোমার কাছে? যাক গে,' বললে সে জেদীর মতো, 'এখন আর বলে কী হবে।'

'চলো, এক্ষুণি চলে যাই হোটেলে, এ কয়দিন সেখানে থেকো।'

'এক্ষুণি গাড়ি ছাড়বে,' মুখ ফিরিয়ে বললে ও।

'আরে না, না, দাঁড়াও, ভেবে দ্যাখো! এত চিঠি লেখালেখির পর এক সঙ্গে থাকব আমরা, ভেবে দ্যাখো!'

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল সে, আমার মুখের ওপর চোখ বুলালে, ঠোঁট কামড়ালে, তারপর করুণ আহত স্বরে বললে:

'আমি থেকে গেলে খুশি হবে?'

নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল আমার, দলা পাকিয়ে উঠছিল গলার মধ্যে, ঘুরে দ্রুত কামরায় উঠলাম, ধাক্কা লাগল কার সঙ্গে, ঠেলাঠেলি করে ওর কুপেটায় গিয়ে স্যুটকেস নিয়ে বেরিয়ে এলাম। কন্ডাক্টর আর ওয়াগনের কাছে যারা ছিল, তারা সবাই আমাদের দিকে কী ভাবে চেয়ে দেখেছিল সেটা আজো মনে পড়ে।

'চলো যাই,' বললাম আমি।

'আর টিকিট?' চোখ জ্বলজ্বল করে বললে ও।

'চুলোয় যাক টিকিট,' বলে ওর হাত টেনে নিলাম।

স্কোয়ারে এসে ট্যাক্সি নিলাম আমরা। বললাম, 'হোটেল।'

'কোন হোটেল?' শুধাল ড্রাইভার।

'যে কোনো হোটেল।'

গাড়ি ছাড়ল, এগিয়ে আসতে লাগল ট্র্যাফিক সিগন্যাল, এর মধ্যেই জ্বলে ওঠা নিওন বিজ্ঞাপন, পেরিয়ে যেতে লাগল স্টেশন, লোকজন, ঘরবাড়ি।

'দাঁড়াও তো ভায়া একটু,' একটা দোকানের সামনে বললাম ড্রাইভারকে। নেমে এক বোতল মদ কিনলাম। ফিরলাম সেটা বুক পকেটে ঢুকিয়ে। কল্পনায় খেলে গেল পানপাত্র তুলে পরস্পরের দিকে চেয়ে এ সুরা খাচ্ছি কেবল আমরা দু'জন। তার স্বাদ পর্যন্ত যেন টের পেলাম মুখে। গাড়ি এসে দাঁড়াল হোটেলের সামনে। নেমে গেলাম হোটেল ম্যানেজারের দপ্তরে।

'জায়গা নেই,' শান্তভাবে জানাল লোকটা।

'যে কোনো রুম! বুঝেছেন, সবচেয়ে ভালো, সবচেয়ে খারাপ, যা হোক, যে কোনো ঘর!'

'জায়গা নেই,' তেতো মুখে কথাটার পুনরুক্তি করে অবিরাম বেজে যাওয়া টেলিফোনটা সে তুলে নিলে।

আমার অপেক্ষায় ও দাঁড়িয়েছিল লাউঞ্জে, অপরূপ সব

স্তম্ভ আর আয়নাগুলোকে দেখছিল ভীরুর মতো। আমার দিকেও সে তাকালে ভীরুর মতো, যেন আমিই এ সবের মালিক। ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে গেলাম আমরা।

'চলো অন্য হোটেলে,' বললাম ক্ষুব্ধ স্বরে।

বিনা দ্বিরুক্তিতে সে উঠে বসল গাড়িতে। মস্কো দিয়ে ছুটলাম আমরা। টাকা ধার করার জন্যে গেলাম এক বন্ধুর কাছে, প্রায় তাকে অনুরোধ করতে যাচ্ছিলাম যে আমাদের একটু ঠাঁই দিক, কিন্তু ওর বোনের কাছে অতিথি এসেছিল, তাকিয়ে দেখলাম তাদের দিকে, টেবলের ওপর মদের বোতল, সোফাটা, নরম বুট পরা পাগুলোর দিকে এবং কিছুই বললাম না। তবে টাকা নিলাম একটু বেশি করে।

আমার চোখের দৃষ্টি লক্ষ করে বন্ধু বললে, 'একটু মদ খেয়ে যা!'

'না রে, আমার অপেক্ষায় একজন রয়েছে, ধন্যবাদ।'

ঘণ্টা দু'য়েক কাটল, কোথায় না গেলাম আমরা, সর্বত্রই ওই এক কথা: জায়গা নেই! রাস্তায় দাঁড়িয়ে বড়ো বড়ো হোটেল আর ফ্ল্যাট বাড়িগুলোর দিকে তাকালাম, তলার পর তলায় তাদের সারি সারি জানলা, অনেকগুলোতে এর মধ্যেই আলো নিবে গেছে, আর এই মুহূর্তে যারা নিশ্চিন্তে নিজের ঘরে শুয়ে অথবা বসে থাকতে পারছে, রেডিও শুনছে, ঘুমাবার আগে কিছু একটা পড়ছে অথবা আলিঙ্গন করছে বৌকে, তাদের সবার কথা ভেবে আমার বুকটা জ্বালা করে উঠল।

শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে আমরা ওর স্যুটকেস নিয়ে গেলাম স্টেশনে, ক্লোক রুমে তা জমা রেখে ধীরে ধীরে গেলাম 'সকোলনিকি' পার্কের দিকে। রাত তখন বারোটা।

'কী করা যায় তাহলে?' হেসে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

‘জানি না,’ ক্লান্তভাবে বললে ও, ‘কী বলো, রেস্তোরাঁয় যাবে? বড্ডো খিদে পেয়েছে।’

‘রেস্তোরাঁ বন্ধ,’ ঘড়ি দেখে বললাম আমি। ফের বোকার মতো হাসলাম, ‘চলো মাঝখানটায় যাই, বুলভারে।’

পা চালিয়ে হাঁটলাম আমরা, যে ভাবে উত্তরের সমুদ্রতীর দিয়ে হাঁটতাম বিশ কিলোমিটার দূরে এক ক্লাবের সিনেমায় সময় মতো পৌঁছবার জন্যে। রাস্তার আলোগুলো নিবে গিয়েছিল, জ্বলছিল শুধু এক পাশে একেকটা ছাড় দিয়ে একটি করে বাতি। লোক প্রায় ছিল না। শেষ পর্যন্ত ত্ভের্স্কই বুলভারে এসে বেঞ্চিতে বসলাম।

‘আচ্ছা, তোমার ওখানে কিছুতেই হয় না?’ জিজ্ঞেস করলে ও আশাভরে।

‘তোমায় সঙ্গে নিয়ে! মা রয়েছে, বাবা রয়েছে — অসম্ভব!’

‘যাক গে, ঠিক আছে,’ বললে ও, ‘দুঃখু ক’রো না, কাল আমি চলে যাব। সকালে ট্রেন আছে। আর তারপর... তারপর তুমি ফের কখনো এসো আমাদের ওখানে।’

জড়িয়ে ধরলাম ওকে, গা এলিয়ে দিলে ও, চোখ বন্ধ করলে।

‘এমনি করেই বসে কাটিয়ে দেব, কী বলো,’ বিড়বিড় করলে ও, নড়েচড়ে একটু আরামে বসার মতো করে নিজেকে গুছিয়ে নিলে, ‘লক্ষ্মী তুমি, ভালোবাসি তোমায় বোকাটা, ওখানে থাকতেই যে তোমায় ভালোবেসেছিলাম, অথচ তুমি ধরতেও পারো নি... বেচারি!’

মিনিটখানেক নিশ্চল হয়ে বসে থাকার পর ও জুতো খুলে ফেললে, পা গুটিয়ে নিলে স্কার্টের ভেতর।

‘পা টাটাচ্ছে,’ ঘুমন্ত গলায় বললে সে, ‘এ সব জুতো... অভ্যেস নেই...’

বাঁয়ের তরুবীথি দিয়ে হাঁটছিল দু'জন মিলিশিয়ার লোক। আমাদের দেখতে পেয়ে ওদের একজন এগিয়ে এল আমাদের দিকে।

'চলে যান,' কথাটা বললে সে কেন জানি আমাকেই, 'এ সব চলবে না।'

'কী চলবে না?' জিজ্ঞেস করলাম আমি, ও ততক্ষণে বিব্রত হয়ে তার ফোলা পায়ে ফের জুতো পরেছে।

'তর্ক করে লাভ নেই। যা বলেছি—চলে যান!'

উঠে চলে গেলাম আমরা। ফের ঘরবাড়ি আর জানলাগুলোর দিকে তাকাতে লাগলাম আমি, কেবলি আমার চোখে ভাসছিল সোফাসমেত একটা ঘর। সে ঘরে আর কিছুই নেই, শুধু মৃদু একটু গোলাপী আলো আর সোফা।

'চলো কোনো একটা ফ্ল্যাট বাড়ির সদর সিঁড়িতে গিয়ে বসি,' অনিশ্চিতের মতো বললাম আমি।

'চলো,' ক্ষীণ হেসে সায় দিলে ও, 'জুতো খুলে সিঁড়িতে বসে জিরিয়ে নেব।'

অন্ধকার একটা আঙিনায় ঢুকলাম, গেলাম কোণের দিকে সবচেয়ে দূরের সিঁড়িঘরটায়। ভেতরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে পৈঠায় বসলাম। সঙ্গে সঙ্গেই ও জুতো খুলে পায়ে হাত বুলোতে লাগল।

'নেতিয়ে পড়েছ?' জিজ্ঞেস করলাম আমি, সিগারেট ধরালাম, 'বেচারা, মস্কোয় আমাদের সুবিধা হল না।'

'হ্যাঁ,' আমার কাঁধে গাল ঘষলে ও, 'মস্তো বড়ো শহর।'

এই সময় পায়ের শব্দ শোনা গেল, দরজা খুলে ভেতরে উঁকি দিলে জমাদারনী, দেখতে পেলে আমাদের।

'ওহ্ বটে, এখানে এসে ঢুকেছে!' চেঁচিয়ে উঠল ও,

‘হারামজাদাগুলো একেবারে জ্বালিয়ে খেলে, রাস্তার কুকুরগুলোর মতো! বেরোও এক্ষুণি, নয়ত হুইসিল বাজাব!’

এপ্রনের পকেট থেকে ঝকঝকে একটা হুইসিল বার করলে ও। মুখখানা ওর উগ্রচন্ডা, চোয়াড়ে। ফের আঙিনা পেরলাম আমরা, পেছন পেছন জমাদারনী এল গাল পাড়তে পাড়তে। রাস্তায় এসে আমরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে হাসলাম।

‘এ তোমার শ্বেত সাগর নয়,’ বললাম আমি।

‘যাক গে, যাক গে,’ ফের সান্ত্বনা দিলে আমায়, ‘চলো, এমনি হেঁটে বেড়াই। নয়ত চলো স্টেশনে, বেঞ্চিতে শুয়ে অন্তত খানিকটা ঘুমিয়ে নেওয়া যাবে, কী বলো?’

‘ঠিক আছে,’ রাজী হলাম আমি, তারপর হঠাৎ চাঙ্গা হয়ে উঠলাম, ‘আরে শোনো, কী আহাম্মক আমি! চলো যাই শহরের বাইরে। টাকা আমার আছে, ট্যাক্সি নিয়ে গোটা ত্রিশ কিলোমিটার চলে যাব। আমাদের এখানে এরকম করে।’

রাস্তায় ধীরে ধীরে চলছিল ট্যাক্সি। রাত করে বাড়ি ফেরার সময় আগে রাতের ট্যাক্সি লক্ষ করতে আমার বেশ লাগত। ঘুমন্ত শহরের রাস্তায় তারা ধীরে ধীরে ঘুরে বেড়ায় যেন ডাইনীর মন্ত্রে বাঁধা, মিটমিট করে তাদের সবুজ আলো, আর সে আলো দেখলে সর্বদাই ইচ্ছে হয় চলে যাই কোথাও অনেক দূরে।

ট্যাক্সিটা থামালাম আমি।

‘শহরের বাইরে?’ পাল্টা জিজ্ঞেস করলে ড্রাইভার, সঙ্গে সঙ্গেই হাবভাব তার বদলে গেল, ‘সাড়ে সাত ছাড়লে রাজী আছি।’

‘ঠিক আছে,’ বললাম আমি। ওতে তখন আমার আর কীইবা এসে যায়।

গাড়িতে যাবার সময় ঘুম চাপছিল আমার। রাস্তা ফাঁকা,

পশ্চিম আকাশ তখনো অন্ধকার, কিন্তু ফরসা হতে শুরু করেছে পূব দিকটা। ট্যাক্সির বাইরে একটানা গুনগুন করছে হাওয়া, ভেতরে পেট্রলের কড়া গন্ধ।

'এইখেনে নাকি?' জিজ্ঞেস করলে ড্রাইভার, কী একটা বনের মতো জায়গার কাছে গতি কমালে। 'আর বেশি দূর গিয়ে কাজ নেই। অন্য শহর থেকে এসেছে বুঝি?' জিজ্ঞেস করলে ড্রাইভার ওর দিকে চেয়ে।

গাড়ি থেকে নামলাম আমরা, সঙ্গে সঙ্গেই প্রাক-প্রত্যুষের ঠাণ্ডায় কাঁপুনি ধরল।

'আধ ঘণ্টায় হবে তো?' আমার দিকে বুঝদারের মতো চেয়ে জিজ্ঞেস করলে ড্রাইভার। 'আমি একটু চোখ বুজব, এসে জাগিয়ে দেবেন। সিগারেট আছে? দিন না একটা...'

বলে রাস্তার ধার ঘেঁসে পার্ক করতে লাগল গাড়ি, আমরাও এগুলাম কর্কশ ঘাসের ওপর দিয়ে বনের দিকে, আমার একমাত্র অনুভূতি তখন কোনো স্যাঁৎসেঁতে কাঁপুনির আমেজ। স্যুট আমার ফেঁপে উঠল, ভারি হয়ে উঠল, ভিজে উঠল জুতো, মিলিয়ে গেল ট্রাউজারের ক্রীজ। বনের ভেতরটা আবছা অন্ধকার, ওর দিকে তাকিয়ে ভাবলাম কী এখন করি। চেহারা ওর পরিশ্রান্ত, মুখ বসে গেছে, কালি পড়েছে চোখের নিচে। হঠাৎ ও খোলাখুলি হাই তুললে, বেজার মুখে চাইলে চারিদিকে, যেন বুঝতে পারছে না কেন আমরা এখানে এলাম।

'আহা, কী আমার বন...' বিড়বিড় করে ও হঠাৎ বিরূপ দৃষ্টিতে চাইলে আমার দিকে।

আমিও হাই তুললাম, বেজার লাগছিল, রাগ হচ্ছিল যে আমি এখন বাড়িতে বিছানায় না শুয়ে দাঁড়িয়ে আছি এই স্যাঁৎসেঁতে ঠাণ্ডায়।

'বিরক্ত ধরে গেও,' ঠকঠকিয়ে কেঁপে হাই তুলে ও বললে মৃদু ঘড়ঘড়ে গলায়, 'গেল' কথাটা শোনাল 'গেও'। 'মা গো! কিছুই চাই না আর, চলো ফিরি...'

'ফিরতে চাও ফিরছি,' বললাম এলানো গলায়, আমিও হাই তুললাম, 'শুধু মদটা শেষ করা যাক, পকেটটা ঝুলে পড়ছে।'

বোতল বার করে ছিপি খোলার চেষ্টা করলাম, কিন্তু বড়োই আঁট করে সেটা লাগানো, তাই বোতলের ভেতরে কাঠি দিয়ে সেটা ঢুকিয়ে দিলাম।

'নাও,' উষ্ণ বোতলটা এগিয়ে দিলাম ওকে।

'ইচ্ছে হচ্ছে না,' বিড়বিড় করলে ও, তবে বোতলটা নিলে, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে পান করতে লাগল। থুতনি বেয়ে রক্তের মতো নেমে এল দুটো সুরার ধারা, একবার কেসে ও বোতলটা ফিরিয়ে দিলে আমায়। পুরো সেটা শেষ করে ফেলে দিলাম আমি।

'চলো যাই,' বললাম হাঁপ ছেড়ে।

ফের আমরা হাঁটতে লাগলাম স্যাঁৎসেঁতে বন, আর ঘেসো ঝোপ আর মেঠো চাঙড়াগুলো দিয়ে, আর ক্রমাগত ও তার গাউনের খুঁট তুলে তুলে ধরছিল যাতে না ভিজে যায় শিশিরে।

'এত তাড়াতাড়ি যে,' আমার দিকে ঠাট্টার দৃষ্টিতে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে ড্রাইভার, 'মেজাজে বনল না বুঝি?'

'হয়েছে, গাড়ি ফেরাও!' বললাম রেগে, আর একটু হলেই ওকে মেরে বসতাম।

ফিরতে লাগলাম আমরা, ঝিমুতে লাগলাম, জোর বাঁকগুলো নেবার সময় টলে টলে পড়ছিলাম এর ওর গায়ে, আর মনে আছে, গায়ে গা ঠেকলে ভালো লাগছিল না আমার, সম্ভবত ওরও না... ভোর তখন পাঁচটা, ট্রেন ধরবার আগে আরো

ঘণ্টা তিনেক কোথাও ঘোরাঘুরি করতে হয়। এদিকে শরীর খারাপ লাগছিল আমার, নেশাটা ধরেছে, তবে কেমন ভারি-ভারি, গুমোট হয়ে বসেছে মাথায়।

এ তিন ঘণ্টা হল যন্ত্রণার ঘণ্টা আর সবচেয়ে বড়ো কথা, চলে যেতে পারব না আমি, শেষ পর্যন্ত থাকতে হবে ওর সঙ্গে। তর সইছিল না কখন ট্রেন ছাড়বে, শেষ পর্যন্ত ফের তুলে দিতে এলাম, ভেবে পাচ্ছিলাম না কী বলব, মাথাটা কটকট করছিল।

'নাও হয়েছে, চিঠি লিখো,' বলে দরজার হাতল ধরলে ও।

শেষ শক্তি দিয়ে থামালাম ওকে।

'রাগ করো না,' বললাম অস্ফুট স্বরে, চুমু খেলাম ওর কপালে, চলে গেলাম বেরবার গেটটার দিকে। মনে আছে, ওকে তুলে দেবার পর ভেতরটা এত হালকা লাগল যে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, তবে সেই সঙ্গে একটা বিষাদও ছিল: বুকের গভীরে কোথায় যেন একটা ক্ষত দেগে বসেছিল, কেমন যেন লজ্জাও লাগছিল...

ফারকোটটা আমি নিয়ে গেলাম রেডিওর কাছে, জড়াজড়ি করে তাতে বসলাম পাশাপাশি। মাঝখানকার এই কটা মাস জুড়ে আমার প্রাণের মধ্যে ছিল একটা হারানোর অনুভূতি, এখন তা সবই ফিরে পেয়েছি, আর যা পেলাম সেটা যা পাওয়া সম্ভব ছিল তার চেয়ে বরং ভালোই।

শোকগাথার সুরে বাজছিল ডাবল ব্যাস, অন্ধকারের মধ্যে খুঁজে বেড়াচ্ছিল তার বিপরীত সঙ্গত, হারিয়ে যাচ্ছিল অনিরসনে, উঠছিল, পড়ছিল আর তার মন্থর লয়ে আমার মনে পড়ছিল তারাভরা আকাশের কথা। আর তা শুনে শুনে কী একটা নালিশ করছিল স্যাক্সোফোন, বারম্বার তীক্ষ্ণ

ঝঙ্কারে ছাপিয়ে উঠছিল ট্রাম্পেট, আর থেকে থেকেই পিয়ানো তাদের মাঝখানে গিয়ে সঙ্গতি গড়ে দিচ্ছিল, হালকা ফাঁপা ছন্দাঘাতে সবকিছুকেই নিজের অধীন করে তুলছিল ড্রাম।

'আলো আর জ্বালব না, কী বলো?' বললে সে, তাকাল মেঝে থেকে ওপরের দিকে, সবজেটে রেডিও আর তার নেকড়ের মতো জ্বলন্ত চোখটার দিকে।

'ঠিক আছে,' বললাম আমি, মনে মনে ভাবলাম এমন রাত আমার জীবনে আর কখনো আসবে না। আর এর মধ্যেই তিন ঘণ্টা কেটে গেছে ভেবে মন খারাপ হয়ে গেল আমার, ইচ্ছে হচ্ছিল সব কিছুই আবার গোড়া থেকে শুরু হোক, আবার যেন আমি লণ্ঠন নিয়ে যাই, অপেক্ষা করি ওর জন্যে, আবার যেন সব পুরনো কথা আমরা মনে করি, তারপর ছাড়াছাড়ি হবার আশঙ্কায় ফের বুক দুরদুর করুক অন্ধকারে।

কি একটা খোঁজার জন্যে উঠে সে তাকাল জানলা দিয়ে, ভাঙা ভাঙা গলায় বললে:

'বরফ পড়ছে...'

আমিও গা তুললাম, অন্ধকারে তাকালাম জানলায়। নিঃশব্দে তুষার ঝরছে। এ হেমন্তের প্রথম সত্যিকারের তুষারপাত। মনে হল কাল সকালে বনে কুটোকাটার স্তূপের কাছে দেখা যাবে ইঁদুরের পায়ের ছাপ, অ্যাকাসিয়া ঝোপের কাছে খরগোসের দাগ, রাতে এসে এ গাছটা চিবুতে ওরা ভারি ভালোবাসে, নিজের বন্দুকের কথাটা মনে হতেই ভারি ভালো লাগল, পুলক খেলে গেল শরীরে। কী চমৎকার যে তুষারপাত শুরু হয়েছে, ও এসেছে, আমরা দু'জনে একসঙ্গে, গান রয়েছে আমাদের, রয়েছে অতীত আর ভবিষ্যৎ, সে ভবিষ্যৎ হয়ত হবে অতীতের চেয়েও ভালো, আর কাল আমি ওকে

নিয়ে যাব আমার পছন্দসই জায়গাগুলোয়, ওকে দেখাব ওকা নদী, মাঠ, টিলা, বন, খাদ... রাত বয়ে চলল, কিন্তু ঘুমতে পারলাম না আমরা, ফিসফিসিয়ে কথা কইলাম, আলিঙ্গন করলাম, হারাই হারাই ভয় পেলাম, তারপর ফের চুল্লি জ্বাললাম, তাকালাম তার আগুনে হাঁ-টার দিকে, লালচে আলোর আঁচ লাগল মুখে। ঘুমোলাম আমরা সকাল সাতটায়, জানলা ততক্ষণে নীলচে হয়ে উঠেছে, আর ঘুমোলাম অনেকক্ষণ, কেননা আমাদের বাড়িতে কেউ আমাদের জাগায় নি।

আমাদের ঘুমের মধ্যেই সূর্য উঠেছে, সব গলে গেছে, তারপর ঠাণ্ডায় জমে গেছে আবার। চা খেয়ে বন্দুক নিয়ে বেরুলাম বাড়ি থেকে। এত শাদা শীতকালীন আলোর ধাক্কা লাগল চোখে, আর বাতাস এত নির্মল আর প্রখর যে মুহূর্তের জন্যে প্রায় ব্যথা করেই উঠল। তুষার আর নেই, কিন্তু সর্বত্রই বরফের চটা। দেখতে তা ম্যাড়মেড়ে, আধা স্বচ্ছ। গোয়াল থেকে উঠছিল গন্ধভরা ভাপ, কাছেই ঠেলাঠেলি করছিল বাছুরগুলো, তাতে খুরের শব্দ উঠছিল জোরে জোরে, যেন কাঠের সাঁকো দিয়ে হাঁটছে। শব্দ উঠছিল কারণ জায়গাটার ওপরে বরফের চটা পড়লেও তলে গোবর ধোয়ানি জল এখনো জমে নি। মহোল্লাসে কতকগুলো বাছুর চরছিল শীতকালীন শাদাটে ক্ষেতগুলোয় আর লেজ তুলে লোমশ পা ফাঁক করে প্রস্রাব করছিল ঘন ঘন। প্রস্রাবের জায়গাগুলোয় ফুটে উঠছিল ভেজা কচি রাই চারাগুলোর সবুজ ছোপ।

প্রথমটা আমরা চললাম রাস্তা দিয়ে। চাকার গর্তগুলো ম্যাড়মেড়ে শাদাটে হয়ে আছে, কিন্তু বরফের তলে তখনো কাদাটে জল, বুটের চাপে চটা ভাঙতেই তা ছিটকে উঠছিল বাদামী রঙে। আর বনের ভেতর বরফের তল থেকে তখনো মাথা উঁচিয়ে ছিল শেষ মরশুমের সামান্য হলদে ড্যাণ্ডিলিয়ন।

বরফের ভেতর দেখা যাচ্ছিল আটকে যাওয়া ঝরা পাতা আর মোচা, এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে জমে যাওয়া ব্যাঙের ছাতা, লাথি মারতেই সেগুলো ভেঙে গিয়ে শব্দ করে গড়িয়ে যাচ্ছিল বরফের ওপর। বরফ দেবে যাচ্ছিল পায়ের চাপে, সামনে, পেছনে, পাশে সর্বত্রই উঠছিল মুড়মুড় শব্দ।

দূর থেকে টিলার ওপরকার ক্ষেতগুলো দেখাচ্ছিল ধোঁয়াটে সবুজ, যেন ময়দা ছেটানো। খড়ের গাদাগুলো হয়ে উঠেছে কালচে, বন হয়ে উঠেছে স্বচ্ছ, ন্যাড়া আর কালো, শুধু চড়া রঙে চোখে লাগে বার্চগুলোর শাদা খুঁটি, অ্যাস্প গাছের কাণ্ডগুলো হয়ে উঠেছে মখমলী আর চেকনাই, তরুময় টিলাগুলোর কোথাও কোথাও এমনকি রঙও টিকে আছে, জ্বলজ্বল করছে না-ঝরা গাছগুলোর শেষ লালচে পল্লবশীর্ষ। বনের ফাঁক দিয়েই নদী দেখা যাচ্ছিল অনেকটা জায়গা জুড়ে, মনে হচ্ছিল যেন নিষ্প্রাণ, ঠাণ্ডা। তুষার কণা ভরা খাদ দিয়ে নিচে নামলাম আমরা, পেছনে পড়ে রইল প্রথমে কাদামাখা তারপর ধবধবে পায়ের ছাপ, কাটা অ্যাস্প গাছটার কাছে আমরা ঝরনার জল খেতে লাগলাম। তার নিশ্চল গহ্বরটার তল জুড়ে ছেয়ে আছে কালচে হয়ে আসা ম্যাপল আর ওক পাতা। কাটা অ্যাস্প গাছটা থেকে উঠছে ঠাণ্ডা ঝাঁঝালো গন্ধ, আর তার কাটা জায়গাটার রঙ একেবারে অ্যাম্বারের মতো।

'ভালো লাগছে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি, আর ওর দিকে তাকাতেই অবাক হয়ে গেলাম: চোখ ওর সবুজ।

'চমৎকার!' সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঠোঁট চেটে সে বললে।

'শ্বেত সাগরের চেয়ে ভালো?' জিজ্ঞেস করলাম আবার।

ফের সে তাকিয়ে দেখল নদীর দিকে, তারপর ওপরের ঢালুতে, চোখ তার হয়ে উঠল আরো সবুজ।

'মানে শ্বেত সাগর...' বললে সে অনির্দিষ্টের মতো, 'আমাদের ওখানে... আমাদের ওখানে... আর এখানে যে ওক গাছ। এমন জায়গা তুমি খুঁজে বার করলে কী করে?'

আমি সুখী, কিন্তু অদ্ভুত কী একটা ভয়ও ছিল আমার মনে: এ হেমন্তে আমার সব কিছুই ভারি ভালো কেটেছে। সুস্থির হবার জন্যে সিগারেট ধরালাম, ধোঁয়া ছাড়তে লাগলাম প্রচণ্ড। আলেক্সিনের দিক থেকে একটা স্টিমার দেখা দিল ওকা নদীতে, ঢেউ তুলে তা তরতরিয়ে চলল ভাটির দিকে, নীরবে চেয়ে চেয়ে দেখলাম আমরা। এঞ্জিনটা থেকে উঠছিল অজস্র বাষ্প, ফোয়ারার মতো তা ডেকের ফুটো থেকে ছড়িয়ে যাচ্ছিল ঠিক জলের ওপর।

স্টিমারটা বাঁকের আড়ালে অদৃশ্য হবার পর আমরা হাত ধরাধরি করে বিরল গাছগুলোর মধ্য দিয়ে উঠতে লাগলাম স্বচ্ছ বনের দিকে, ওপর থেকে আরেকবার তাকিয়ে দেখব ওকা। চললাম আমরা আস্তে, চুপ করে, অবশেষে যেখানে আমরা দু'জনে মিলেছি যেন সেই ধবল স্বপ্নের মধ্য দিয়ে।



ভিক্তর লোগিনভ। ভ্লাদিমির অঞ্চলের কৃষক পরিবারে জন্ম ১৯২৫ সালে। বিমান বাহিনীতে মেকানিকের কাজ করেন। তারপর যুব পত্রিকায় আসেন। ১৯৫৮ সালে বেরয় প্রথম উপন্যাস 'কমরেডদের পথ', পরে যে-সব কাহিনী ও উপন্যাস প্রকাশিত হয় সে সম্পর্কে জনৈক সমালোচক বলেছেন, 'লেখকের মেজাজ রোম্যাণ্টিক হলেও পরিপার্শ্বকে ভালো করে দেখে বাস্তব জগতকে নিখুঁত করে ফুটিয়ে তুলতে তাঁর বাধা হয় না।' সমসাময়িক যুবকদের যাত্রাপথই তাঁর রচনার মূল বিষয়বস্তু।

তপ্ত দুধের রঙ

মা মারিয়া গাব্রিলভনার উদ্দেশে

১

স্বপ্নে ভাসে ছেলেবেলাকার ছবি: কুয়াসায় তারা, নুড়ি বাঁধানো পেছল সড়ক, 'দোচ্‌কা' গাই, রঙ তার তপ্ত দুধের মতো। আর কখনো আমি অমন কুয়াসা দেখি নি, অমন নুড়ি, অমনি রঙের গাই। সে কুয়াসা দুধের মতো শাদা, এমন কি শাদা তা রাত্তিরেও। কুয়াসায় নুড়ি বাঁধানো সড়কটা দেখাত ম্যাড়মেড়ে, কিন্তু কুয়াসা কেটে গেলে তার প্রতিটি পাথর থেকে তারার ছটা ঠিকরত। আর দোচ্‌কা গাইটা ছিল আমার বোনের মতো: তাকে চরাতাম রাস্তার ধারের নধর ঘাসে, বনে বনে ঘুরতাম তাকে নিয়ে, ঘুমাতাম তার পাশেই

ভাঁড়ার ঘরে। তার রঙটার কথা ভেবে অবাক লেগেছিল অনেক পরে, ছেলেবেলাকার ছবি যখন স্বপ্ন দেখতে শুরু করি...

এসবই ছিল—তারা, কুয়াসা, নুড়ির ঝলক। হাতে একটা শুকনো ডাল নিয়ে হাঁটতাম সড়ক ধরে, সামনে দুলত গরুর লেজ, তালে তালে খুরের শব্দ উঠত তার দু'-পায়ে। মাঝে মাঝে যেন পাতলা কাগজের ভেতর দিয়ে সামনে ফুটে উঠত শিঙ, তার একটু ওপরে বাবার টুপি। দড়ি ধরে দোচ্‌কাকে নিয়ে যাচ্ছে বাবা। কিন্তু মাঝে মাঝে লেজটা, পাদুটোও যেন মিলিয়ে যেত স্বপ্নের মতো, নুড়িতে খুরের শব্দও শোনা যেত না। অদৃশ্য একটা জগতের মধ্যে গিয়ে পড়তাম আমি, আর প্রত্যেকবারই একটা ছমছমে আনন্দ আমায় পেয়ে বসত—যা হয় কেবল স্বপ্নে আর ছেলেবেলায়। ভয়ে ছুটে যেতাম সামনে, ফের সামনে দেখা যেত গরুর লেজ, নিশ্চিন্তে ফেলা খুর-ওয়ালা দুটি পা। দড়ির টানে নতুন বাড়ির দিকে এগিয়ে যেত ও, কেবলি এগিয়ে যেত আমাদের অন্নদাত্রী গরু দোচ্‌কা আর তার পেছু পেছু আবিষ্কার আর অভিজ্ঞতার দিকে যেত খালি-পা একটি ছেলে আমি, তখনো নিষ্পাপ, ভোরের ধূসর আকাশের তারার মতো নির্মল।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ছেলেবেলায় যত রাস্তা দিয়ে আমি হেঁটেছি, তা সব বাবা পেতেছে। নদী নালার ওপরকার সমস্ত সাঁকোও বাবার গড়া। বাবা বলত, 'আমি রাস্তা-মিস্ত্রি'। বাবা ছিল রাস্তা-মিস্ত্রিদের সর্দার, তারপর হয় টেকনিশিয়ন। সাঁকো,পাথর, রাস্তা,—আমাদের সংসারে এসব কথা ছিল দুধ রুটি নুনের মতোই ঘরোয়া, আর আমার সমস্ত ছেলেবেলা, আমার গোটা কৈশোরটা মনে হত যেন একটা অনন্ত সড়ক। হেঁটে যেতাম তার ওপর দিয়ে, ট্রেনে করে পাড়ি দিতাম, ঝাঁকুনি খেতে খেতে ছুটতাম লরিতে, তাই ছেলেবেলার ছবি

মনে হলেই দেখি আমি যেন কোথাও যাচ্ছি। যাচ্ছি বাবার পাতা রাস্তা দিয়ে, বাবার গড়া সাঁকো দিয়ে, যাচ্ছি বাবার পেছু পেছু, আর বাবা চলেছে দোচ্‌কা গরুর দড়ি ধরে।

রিবিন্‌স্ক শহরের কাছে বেসোনভ্‌কা গ্রাম থেকে আমরা চলে যাই তখনকার ইভানভ অঞ্চলের দক্ষিণে। বালিশ, তোষক, ওভারকোট আর ফেল্টবুট ভরা মস্তো এক সিন্দুক পৌঁছেছে স্টেশনে, এবার অলিন্দের কাছে মাটির ওপর রাখা কাঠের স্যুটকেস আর ঝুড়িগুলো পাঠাবার পালা। শূন্য ঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আমি মা-বাবার কথাবার্তা শুনছিলাম। ক্যাঁচকেঁচে একটা বাক্সের ওপর বসে তারা দোচ্‌কাকে নিয়ে কী করা হবে তাই ঠিক করছিল। জানলার ওপাশে দাঁড়িয়েছিল দাড়িওয়ালা এক চাষী, পায়ে গাছের ছালের জুতো, গায়ে রঙচটা জামা, তাতে ঝিনুকের বোতাম। হাতে তার ন্যাকড়ায় জড়ানো টাকা।

'বেচেই দিই,' বললে বাবা।

মা কেঁদে ফেললে।

বিরক্তিতে থুতু ফেললে বাবা।

'দড়ি ধরে তো আর গোটা তল্লাটটা পাড়ি দেওয়া যায় না।'

এই বলে অন্যমনস্ক হয়ে গেল বাবা।

মা কাঁদলে। আমিও ফোঁপালাম। আমাদের দোচ্‌কাকে যে বেচা চলে না। অমন গরু আর কখনো কিনতে পারব না...

বাবা দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলে:

'ঠিক আছে, দড়ি ধরেই নিয়ে যাব।'

আমি বাইরে ছুটে গিয়ে চেঁচিয়ে বললাম চাষীটাকে:

'চলে যাও চাচা, চলে যাও এখান থেকে। আমাদের দোচ্‌কাকে বেচব না। বাবা ওকে দড়ি ধরে নিয়ে যাবে।'

কিন্তু তখনো জানতাম না যে বাবা আমাকেও সঙ্গে নেবে

ঠিক করেছিল। মা যাবে ট্রেনে করে আর দোচ্‌কা গরু নিয়ে বাবার সঙ্গে আমায় পাড়ি দিতে হবে প্রায় শতখানেক কিলোমিটার পথ। প্রথমটা কাঁচা রাস্তা, পরে সড়ক। বয়স তখন আমার নয় বছর।

রওনা দিলাম আমরা...

২

আমার মনে হয় রওনা দিয়েছিলাম খুব ভোরে। কিন্তু এটাও হতে পারে যে ওই রকম ভোরে রওনা দিয়েছিলাম হয়ত অন্য কোনো সময়, অন্য কোনো উপলক্ষে; আজও পর্যন্ত মা জোর দিয়ে বলে যে রওনা দিয়েছিলাম বিকেলের দিকে, সূর্য তখন লাল হয়ে উঠেছিল। আমার কিন্তু একেবারেই অন্য একটা ছবি মনে পড়ে: ভোরের ঠাণ্ডা, মাঠে শিশির, সূর্য নিভে আসছে না, বরং তেতে উঠছে। যাচ্ছিলাম আমরা সোজা সূর্যের দিকে মুখ করে। বেশ মনে আছে, বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম সূর্য পর্যন্ত পেঁাছতে কতদিন লাগবে।

'এক মাসে হবে?' জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি।

বাবা বললে:

'এক বছরেও পেঁাছবি না। তাছাড়া কী দরকার। কেউ ওখানে যায় না। পাখিরাও পেঁাছতে পারে না, ডানা পুড়ে যাবে।'

'আর চাঁদে গেলে এক মাসে হবে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'উহুঁ। পথই নেই। আর গিয়ে লাভই বা কী। কী আছে ওখানে?'

'ভারি সুন্দর, জ্বলজ্বলে।'

'কেউ সে কথা ঠিক জানে না। চাঁদ যে অনেক দূরে।'

'কবে ঠিক জানা যাবে?'

'হয়ত একশ' বছর পরে, তাও সন্দেহ আছে। অলৌকিক ব্যাপার তো কিছু হয় না।'

হ্যাঁ, এটা সেইদিনই, এখন আর কোনো সন্দেহ নেই, সকালেই। বাবা বললে অলৌকিক ব্যাপার কিছু হয় না। কিন্তু বাবার কথা নস্যাৎ করে গোটা পথটা জুড়ে সেবার অলৌকিকের আসর বসেছিল। আর সেটা শুরু হয় সন্ধ্যার দিকে নয়, ঠিক সকালেই, যখন আমরা সোজা সূর্যের মুখোমুখি হাঁটছিলাম।

আমার মনে হচ্ছিল সূর্য যেন স্থির হয়ে আছে, ক্রোশ পাঁচেক গেলেই যেন তা হাত দিয়ে ছোঁয়া যাবে। দেখতে তা প্রকাণ্ড, কেমন যেন ভারি, রাস্তার ওপরেই ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, চেপ্টে গেছে তলাটা। তাই দেখাচ্ছিল যেন একটা গোলাপী তোরণ—ছুটে গিয়ে চৌকাট পেরলেই দেখা যাবে ওপাশে আঙিনা। নিশ্চয় অবাক করা সব গোলাপী ঘাস জন্মায় সেখানে। আর সেই ঘাসের ওপর দিয়ে মাঠে মাঠে নিশ্চয় হেঁটে বেড়ায় অপরূপ সব গোলাপী মানুষ।

আগে ছুটে গেলাম আমি, তাড়া দিলাম বাবাকে: চটপট পেঁছতে পারলে বেশ হয়। বাবা কিন্তু লম্বা লম্বা পা ফেললেও হাঁটছিল ধীরে ধীরে। আমার ব্যস্ততা দেখে কেবল ঠাট্টা করলে।

'আরে দাঁড়া দাঁড়া, হাঁপিয়ে যাবি। তখন বাড়ি ফেরার ঝোঁক ধরবি।'

আমিও টের পেলাম যে বাবাকে বোঝানো, সূর্যের আঙিনায় তার আগ্রহ জাগানো অসম্ভব। কোনো দিকে না তাকিয়ে হাঁটছিল সে। হাতে গরুর দড়ি। গরুকে নিয়ে যাওয়াই তখন তার কাছে প্রধান কথা।

শান্ত হয়ে আমি পিছিয়ে এলাম। আকাশে উঠে গেছে সূর্য, রঙটা তার তখনো না বদলালেও রাস্তা ছুঁয়ে আর নেই, তাই তার চৌকাট পেরনো কি আর সম্ভব হবে। আমার কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস ছিল একটু ছুটে গেলেই হত, অন্তত এক নজর সেই মাঠটা দেখা যেত। বাবার কিন্তু কেন জানি সে দিকে এতটুকু আগ্রহ ছিল না...

তবে মনমরা ভাবটা আমার বেশিক্ষণ রইল না। চারপাশে তাকাতেই একেবারে যাদুরাজ্যে পৌঁছে গেলাম। প্রথমে আমার চোখ টানল গরুর শিঙ দুটো—একেবারে গোলাপী। দোচ্‌কার গা-টাও হয়ে উঠেছে গোলাপী রঙের। বাবার টুপিটাও তাই। মাথা তুলে তাকালাম: মেঘগুলোও আগুনে গোলাপী। এমন কি বাতাসটাও মনে হল গোলাপীর ছোপ লাগা। চার পাশের সবকিছুই গোলাপী। হাঁটছিও গোলাপী রঙের মাঠের পাশ দিয়ে। হাত-পা আমার গোলাপ-রঙা। ফিরে তাকালাম আমি, সে চৌকাটটা পেরিয়ে এসেছি নাকি? কখন, কোথায়? কিন্তু পথটা একেবারে সোজা, মসৃণ, গ্রামটা পর্যন্ত একনাগাড়ে তাও গোলাপী।

কেবলি ওপরে উঠছিল সূর্য। আর এই অপরূপ নতুন জগতটা যতক্ষণ চেয়ে দেখছিলাম, ততক্ষণে সূর্যের দিকে তাকানো দুষ্কর হয়ে উঠল। আগুন নিভে শাদা হয়ে উঠল মেঘগুলো। চিকচিকিয়ে উঠল মাঠ। গরুর শিঙ থেকেও ঠিকরচ্ছিল শাদা আগুনের ছটা। রাস্তাটাও ঝকমক করছিল। কিন্তু সবচেয়ে জ্বলজ্বল করে চোখ ধাঁধিয়ে জ্বলছিল আকাশের সূর্যটা। আমার কিন্তু একটু অবাক লাগল না যে আমি, বাবা, দোচ্‌কা, চারপাশের গোটা পৃথিবীটা, অত চট করে আমরা গোলাপী থেকে ঝকঝকে হয়ে উঠেছি। তাই তো হওয়ার কথা। যাই বলো, অজান্তে নিশ্চয় আমরা কোথাও সেই

চৌকাটটা পেরিয়ে এসেছি। পেছনে রয়ে গেছে সেই গোলাপী তোরণটা, চলছি আমরা সূর্যের প্রকাণ্ড আঙিনা দিয়ে। এ এক অলৌকিক কাণ্ড বৈকি।

খুশি হয়ে ভাবলাম, বাবা ভুল বলেছে। দেখা যাচ্ছে সূর্য পর্যন্ত রাস্তা আছে। তাতে হাঁটা ভারি সহজ, ভারি মজার।

একটা বন পেরলাম আমরা, একটা গ্রাম, আরো একটা বন। অনেকক্ষণ থেকেই আকাশে স্বচ্ছ একটু মেঘের মতো চাঁদ দেখা যাচ্ছিল, হঠাৎ তা অদৃশ্য হল, গলে গেল যেন। ফের জিজ্ঞেস করতে লাগলাম বাবাকে, কোথায় গেল চাঁদটা, কোথায় লুকাল, কেন কেবল রাতেই তা আলো দেয়।

'কিসের চাঁদ?' অবাক হল বাবা, 'কোথায় তুই চাঁদ দেখলি?'

দেখালাম কোথায় কিছুক্ষণ আগেও একটু-একটু তা দেখা যাচ্ছিল।

'কোনো চাঁদ টাঁদ ওখানে ছিল না, স্বপ্ন দেখছিস?' চটে উঠল বাবা, 'বিরক্তি ধরে গেল তোর বোকা বোকা সব প্রশ্নে, চাঁদ, সূর্য... এখনো অনেকটা পথ হাঁটতে হবে, মুখ বুজে চল।'

আমি ভেবে পেলাম না, সত্যিই কি বাবা চাঁদটা দেখে নি। তবে হয়ত গোলাপী মাঠটাও তার চোখে পড়ে নি? বাবা যে গরু নিয়ে যাচ্ছে। সেইটেই তার কাছে প্রধান কথা। জিজ্ঞেস করে দেখব নাকি?.. কিন্তু ভয় হল। বাবা আমার প্রায়ই রেগে ওঠে। প্রায় প্রত্যেক দিনই তার কাছ থেকে চড় চাপড়টা আমায় খেতে হয়।

আরো একটা বন পেরলাম আমরা। বনে কোকিল ডাকছিল। 'কুহু-কুহু-কুহু'—একনাগাড়ে তিরিশ বার। তার মানে আরো তিরিশ বছর আমার আয়ু। তবে কোকিলটার জানানি ফলে নি। এর মধ্যেই ও বয়সটা আমি পেরিয়ে এসেছি। নাকি

আমার নয়, বাবার ভবিষ্যৎ বলেছিল পাখিটা? সেটাও ফলে নি। তারও বেশি দিন বেঁচে ছিল বাবা। তাহলে হয়ত অন্য কারো ভাগ্য গণেছিল কোকিলে, আমার বাবার মতো সে বেচারী আজ আর বেঁচে নেই। কেননা কোকিল যে ভুল করতে পারে না সে বিষয়ে আমি একেবারে নিঃসন্দেহ ছিলাম।

আরো একটা বন পেরলাম আমরা, নরম, বার্চ গাছে ভরা। বনের ওপাশে মাঠটায় শণচুলো কতকগুলো মেয়ে, দেখে মনে হয় আমার বয়সী, গোল হয়ে নাচছে। মাথায় সবার বনফুলের মালা। তখন দিব্যি গরম কাল, চারিদিকেই হলুদ বনফুলগুলো ফুটেছিল রাশি রাশি।

নিজেও আমি বনফুলের মালা গাঁথতে পারি, প্রায়ই গেঁথে দিতাম আমার চেনা সঙ্গিনীদের। এ মেয়েগুলোর জন্যেও গেঁথে দিলে হয়। অচেনা মেয়ে, তবে ভারি সুন্দর। জন্মেছে ওরা এইখানে, সূর্যের দেশে, মাঠে, ভোরের বেলা যা হয়ে ওঠে গোলাপী।

সকালে আমি তাড়াতাড়ি হাঁটতে চাইছিলাম, আর এখন ইচ্ছে হল, বাবা যেন আস্তে আস্তে পা ফেলে। নিশ্চয় হাঁপিয়ে গেছে বাবা। একটু থামলেই তো হয়? কিন্তু হেঁটেই চলল বাবা, মেয়েগুলোর দিকে ভ্রূক্ষেপও করলে না। গরু নিয়ে যাচ্ছে বাবা, ধীরে ধীরে হাঁটলেও পা ফেলছিল লম্বা লম্বা।

নিজেই আমি খানিকক্ষণের জন্যে দাঁড়ালাম। শুকনো ডালটা পিঠের আড়ালে লুকিয়ে তাকালাম মেয়েগুলোর দিকে। সারা জীবন যদি এখানে কাটাতে পারতাম! কিন্তু জীবন আমি কাটাতে পারি কেবল মা, বাবা, আর দোচ্‌কা গরুটার সঙ্গে। বাবা ওদিকে দোচ্‌কাকে নিয়ে যাচ্ছে কেবলি দূরে আর দূরে, সূর্যের আঙিনাটা দিব্যি ঢালাও আর প্রকান্ড হলেও বাবা গরুটাকে নিয়ে যাচ্ছে কোথায় যেন তার সীমানা

ছাড়িয়ে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমায় তার পেছু পেছু ছুটতে হল। মাঝে মাঝে অবিশ্যি ফিরে তাকিয়েছিলাম। মেয়েগুলো আমায় দেখতে পেয়ে হাত নাড়তে লাগল। আমায় ওদের দরকার। টের পেয়ে গেছে নাকি যে আমি মালা গাঁথতে পারি? হাত নেড়ে ডাকলে ওরা। কিন্তু আমি মাথা নেড়ে ছুটে গেলাম বাবার কাছে।

কোথায় এখন তারা, ওই মেয়েগুলো? গোলাপী মাঠ, শণচুলো ওই মেয়েগুলোকে সুখ দিও। কম পড়লে বরং আমার ভাগটা নিয়ে নাও, মায়াবী গোলাপী মাঠ!

৩

বড়ো সড়কে এসে উঠলাম সন্ধ্যায়। সাধারণ, নুড়ি বাঁধানো সড়ক, এখনো যা কোথাও কোথাও টিকে আছে। কিন্তু সে সময় এই সড়কও ছিল একটা বিরল ব্যাপার, আর আমার মনে হল দুনিয়ার সবচেয়ে বড়ো রাস্তা এটা। চুপ করে থাকতে না পেয়ে ফের জিজ্ঞেস করলাম বাবাকে:

‘এই সড়ক ধরে যদি কেবলি, কেবলি, কেবলি চলে যাই, তাহলে সমুদ্রে গিয়ে পেঁছিব?’

‘সমুদ্রে তোর দরকারটা কি?’ রেগে বললে বাবা, ‘ও যে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে। সারা জীবন হাঁটলেও পেঁছিবি না।’

আমার প্রশ্নগুলো বাবার সহ্য হত না। মাকে বলত, ‘কার ধরন পেয়েছে ওটা। কিছুই হবে না ওকে দিয়ে!’

কিন্তু প্রশ্ন না করে আমিও পারতাম না। প্রতিদিনই রাজ্যের প্রশ্ন উঠত আমার মনে। ছয় কি সাত বছর বয়সেই অবশ্য আমার জানা হয়ে গিয়েছিল কেন আর কীভাবে ছেলে জন্মায়:

বেশি বয়সের ছেলেরা আমায় সাগ্রহেই তা বুঝিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু পৃথিবী যদি গোল হয় তাহলে তার উল্টো পিঠে লোকে কী কায়দায় পা উঁচু করে মাথা দিয়ে হাঁটতে পারছে সেটা আমায় বলবে কে? আর স্বপ্নে যেমন হয়, ছুটতে ছুটতে হঠাৎ বাতাসে উড়ে যাওয়া চলবে না কেন? আর নীল সাগর জিনিসটাই বা কেমন?.. চাঁটির পর চাঁটি খেতাম, তাহলেও জিজ্ঞাসা করতে ছাড়তাম না। তারপর থেকে তিরিশ বছর কেটেছে, তাহলেও আগের মতোই এখনো পাখি দেখে ভাবি সত্যিই তো, খুব জোরে ছুট লাগিয়ে কেনই বা বাতাসে উঠে যেতে পারব না?..

দুনিয়ার সবচেয়ে বড়ো রাস্তাটা ঢুকল অন্ধকার ফার বনে। ঢুকবার মুখে বাবা থামল একটু জিরিয়ে নেবার জন্যে। গরু দুইবার জন্যে ছোট্ট গ্রামটায় গেল বাবা। আমি ততক্ষণ ধুনি জ্বালাবার মতো কুটোকাটা জোগাড় করলাম। দোচ্‌কাকে নিয়ে ফিরে এল বাবা। ঘণ্টা খানেক আগেও তার পালানটা ছিল ফুলো ফুলো, টান-টান, এখন তা চুপসে এসেছে। বাবার হাতে দুধ ভরা এক মস্ত পাত্র, রুটি। গরুর পায়ে ছাঁদন দড়ি বেঁধে গলায় একটা ঘণ্টি ঝুলিয়ে দিলে বাবা। তারপর পাঁচন দিয়ে তাড়া দিতেই লাফাতে লাফাতে দোচ্‌কা চলে গেল মাঠে। ঠুন ঠুন করে বাজতে লাগল ঘণ্টা। ছোট্ট একটু ধুনি জ্বালালে বাবা। ধারোষ্ণ দুধ খেলাম আমরা। ধীরে ধীরে জ্বলতে লাগল ধুনিটা। আকাশে ফুটল একের পর এক তারা। অন্ধকার হয়ে এল। দূরে কোথায় যেন বাজছিল দোচ্‌কার ঘণ্টিটা।

'ঘণ্টার শব্দটা খেয়াল রাখিস,' বলে ধুনির পাশে শুয়ে পড়ল বাবা।

হাঁটু জড়িয়ে বসে আমি কান পেতে রইলাম সুদূর

শব্দটায়, চেয়ে রইলাম আগুনটার দিকে। এও আরেকটা অলৌকিক ব্যাপার, এই আগুন। সর্বদাই তা নানান রকমের, রঙেও বটে, গড়নেও বটে। রক্তিম শিখাগুলো তার লাফিয়ে উঠছে, ফোঁস ফোঁস করছে, যেন নাচছে হাওয়ায়। গভীরে তার ফুটে উঠছে কখনো-বা মিনার, কখনো কোন রূপকথার গাছ, কখনো হঠাৎ মানুষের মুখ। এমন আশ্চর্য, এমন ছমছমে, এমন সুন্দর যে চোখ ফেরানো যায় না। বাবা ঘুমচ্ছে, আমি একলা বসে আছি। ধুনি থেকে ছিটকে বেরিয়ে কোথায় উড়ে যাচ্ছে ফুলকিগুলো। সত্যি কোথায় উড়ে গেল? আর আমার মাথার ওপরে, আমার চারপাশের এই জগতটাই বা কী জিনিস? কী জিনিস এই অন্ধকার ফার বনটা, দুনিয়ার প্রধান রাস্তাটা যেখানে ঢুকেছে? আকাশে জ্বলজ্বল করা ওই তারাগুলো কী? মাঠে কার ঘণ্টা বাজছে অমন মৃদু মৃদু?..

ঘণ্টা কিন্তু তখন আর বাজছিল না। লাফিয়ে উঠতেই আমাদের দোচ্‌কাকে দেখতে পেলাম। আমার কাছ থেকে তিন পা দূরে দাঁড়িয়ে সেও তাকিয়ে ছিল আগুনটার দিকে।

'দোচ্‌কা, দোচ্‌কা!' আস্তে করে ডাকলাম আমি।

বাবাও লাফিয়ে উঠল।

'ও, পেট ভরেছে তাহলে গিন্নির গাই,' বললে বাবা। গরুটাকে সে এই বলেই সাধারণত ডাকত, 'নে শুয়ে পড়, শুয়ে পড়।'

দোচ্‌কার গা চাপড়ালে বাবা, দোচ্‌কাও বাধ্যের মতো শুয়ে পড়ল, আর শোয়ার পর ঠিক মানুষের মতোই দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। সে তো আর জানত না কী হয়েছে, কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তাকে। মা-ই তার দেখাশোনা করত, নিশ্চয় মায়ের জন্যে মন কেমন করছে তার...

‘একটু ঘুমিয়ে নে,’ বললে বাবা, ‘রাতে হাঁটন দেব। দিনের বেলা বড়ো গরম, তখন ঘুমনোই ভালো।’

আমি অবশ্য আগেই একটু ঘুমিয়ে নিয়েছিলাম। ধুনিটা ফোঁস ফোঁস করে জ্বলছে কেবল মাঝখানটায়। ধারগুলো নীল হয়ে এসেছে, কাঁপছে। কালচে মেরে নিভে গেছে অঙ্গারগুলো।

পাত্রটায় দুধ বাকি ছিল অনেক। একটা ঢাকনাও ছিল তার। অঙ্গারগুলোকে স্তূপ করে আমি তার ওপর ঢাকনি দেওয়া পাত্রটা বসিয়ে দিলাম। দুধ উথলে ঢাকনিটা ঠেলে উঠতেই আমি একটা লাঠিতে করে ঢাকনাটা খুলে ফেললাম, তারপর সেই লাঠিটা দিয়েই নিভন্ত আগুনগুলোকে সরিয়ে দিলাম দূরে। দুধটা থিতিয়ে এল। ফের ঢাকনি চাপালাম ওটায়। গরম ছাইয়ের ওপর ওটা এখন ধুঁকবে। চাকা চাকা হলদে সর পড়া জ্বাল দেওয়া দুধ আমি ভালোবাসি। আমাদের দোচকার দুধে তা হত ভারি চমৎকার। আমাদের গরুর রঙটার কথা ভাবলে যে আমার তপ্ত দুধের মিষ্টি রঙের কথা মনে পড়ত সে তো অকারণে নয়।

আঁচে মা দুধ বসিয়ে রাখত অনেকক্ষণ, কখনো কখনো গোটা দিন। কিন্তু আমার হাতে সময় কম। ঘণ্টা দুয়েক কোনো রকমে কাটল, তার মধ্যে বার কয়েক ঘুমিয়েও পড়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত আর ধৈর্যে কুলাল না। পাত্রটা তুলে নিয়ে ঠান্ডা ভেজা ভেজা ঘাসের মধ্যে রেখে তা ঠান্ডা করলাম, তারপর স্তন্যপানের মতো করে ঠোঁট লাগালাম তপ্ত পাত্রটায়। খেয়ে গেলাম আমি, তৃপ্তির সঙ্গে খেয়েই চললাম। তবে সবটা কি আর শেষ করা যায়।

উঠে বাকিটুকু খেলে বাবা।

'আহ চমৎকার,' তালু দিয়ে মুখ মুছে বাবা বললে, 'সাবাস ছেলে। তা এবার কিন্তু রওনা দিতে হয়। ধুনিটা নিবিয়ে ফেল।'

খালি পায়ে ছাইগুলো নেড়ে দেখলাম। বেশ গরম। মাঝখানটায় তখনো ধিক ধিক করছে। লাঠি দিয়ে বাড়ি মারতে লাগলাম সেখানটায়। হঠাৎ জ্বলে উঠল ধুনিটা, চমকে ফুঁসে উঠল। এবার বাড়ি মারলাম ধারের ছাইগুলোয়। সেগুলোও চনচন করে জ্বলজ্বলিয়ে উঠল যেন এক রূপকথার ঘটনা। এক ঝাঁক ফুলকি উঠে এসে আমার আপাদমস্তক ছেয়ে ফেললে। ভয় পেয়ে ডেকে উঠল দোচ্‌কা।

'ও ভাবে নয়,' বলে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে বাবা সূর্যাস্তের মেঘের মতো রক্তিম অঙ্গারগুলোয় জল ছিটতে লাগল।

শোঁ-শোঁ শব্দ উঠল। শেষ হয়ে গেল রূপকথা।

তবে ফের পথে নামলাম আমরা...

৪

না, মা-ই ভুল করেছে। এখন আমার নিশ্চিত মনে পড়ছে যে আমরা রওনা দিয়েছিলাম সকালে। সূর্যের আঙিনাটা আমরা পেরিয়ে আসি দিনের বেলায়। জানি না কোথায় রয়ে গেল সেই গোলাপী মাঠ আর মাথায় মালা জড়ানো মেয়েগুলো। সে আঙিনায় কীভাবে ঢুকলাম, কীভাবেই বা বেরিয়ে এলাম কেউ বলতে পারবে না, কখনো তা জানা হবে না আমার। তবে আশা রাখি স্বপ্নে তা আমায় আরো একাধিকবার দেখা দেবে,

তখন নিশ্চয় সেই রেখাটা দেখে নেব ভালো করে, যার পর থেকেই রূপকথার শুরু।

আর এখন আমার চোখে ভাসছে কেবল তারা আর কুয়াসা, নুড়ি বাঁধানো পিছল পথ, অন্ধকার ফার বনের ভেতর দিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো রাস্তায় নৈশ যাত্রা।

আমার নাকের সামনে দেখা যাচ্ছে গরুর লেজটা, দুটো পায়ে তালে তালে খুরের শব্দ উঠছে। মাঝে মাঝে যেন পাতলা কাগজের ভেতর দিয়ে সামনে ফুটে উঠছে গরুর শিঙ, আর তার ওপরে বাবার টুপি। রাত কিন্তু ফুরিয়ে গেল, কুয়াসা তাকে তাড়িয়ে দিলে। তার মধ্যে আমরা হারিয়ে গেলাম, শাদা কুয়াসায়, এবারেও যেন পেরিয়ে এলাম কোন একটা চৌকাট। তবে কখন সেটা ঘটল সেটা এবার আমি মনে রেখেছি: রাস্তাটা নেমে গিয়েছিল ঢালুতে, কেবলি ঢালুতে, আমরাও নেমে যেতে লাগলাম কুয়াসায়, যেন পুকুরে নামছি, প্রথমটা ডুবে গেল হাঁটু পর্যন্ত, তারপর বুক, শেষ কালে মাথাটাও। প্রথমে তলিয়ে গেলাম আমি, টের পেলাম কুয়াসার রঙ শাদা, একেবারে দুধের মতো। মনে হল যেন মুঠো ভরে ভরে তা তুলে নেওয়া যায়। প্রথমটা এই শাদার রাজ্যে কিছুই দেখা গেল না, শোনা যাচ্ছিল কেবল ভেজা-ভেজা নুড়ির ওপর খুরের শব্দ। সামনে দোচ্‌কার পা পেছলাচ্ছিল। বাবা হাঁক দিলে তাকে। আমারও অসুবিধা হচ্ছিল হাঁটতে।

'কিছুই দেখতে পাচ্ছি না বাবা!' চেঁচিয়ে বললাম আমি।

'কী যে তুই বলিস!' বললে বাবা। 'সবই দেখা যাচ্ছে। ঐ তো তারা, বন। কুয়াসা জমেছে তলের দিকে।'

একটু লাফ দিলাম আমি, সত্যিই ওপরে ঝিকমিক করছে তারা। আরেকবার চোখে পড়ল গরুর শিঙ আর বাবার টুপি।

মনে হল যেন তা অনেক দূরে। ছুটতে গেলাম সামনে, সঙ্গে সঙ্গেই নাক ঠুকরে গেল গরুর লেজে। পিছিয়ে এসে আরেকবার লাফালাম। ঝলমল করে উঠল তারা। কিন্তু তা দেখতে হলে অনবরত লাফাতে হয় আমায়। মাথা পর্যন্ত কুয়াসায় ডুবে আছি আমি। বাবা আর দোচ্‌কা গলা পর্যন্ত। কিন্তু কেবলি ঢালুতে নেমে যাচ্ছিল পথটা, বাবাও শীগগিরই গজগজ করে উঠল:

'ঈস, একেবারে ডুবিয়ে ছাড়লে!'

আমার লাফঝাঁপগুলোতেও আর ফল দিচ্ছিল না।

'কী শাদা কুয়াসা,' বলে উঠলাম আমি।

'শাদা আবার কোথায়?' গজগজ করলে বাবা, 'কুয়াসা যেমন হয় তেমনি কুয়াসা। কালচে।'

'বারে, এ তো শাদা!'

পা পিছলে গেল বাবার, মুখখিস্তি করে উঠল। আমিও আর জেদ করলাম না।

পরে রাস্তাটার কথা ভেবে প্রশ্ন জেগেছিল, সত্যিই কি শাদা কুয়াসা হয়? হয়ত আমার দৃষ্টিভ্রম? সত্যি সত্যিই হয়ত তা কালচে? রাতে শাদা কুয়াসা হয় কি? জানি না। রাতের বেলা অমন ঘন কুয়াসায় আর কখনো হাঁটি নি। কিন্তু এই যে কুয়াসাটা আমার স্মৃতিতে ভেসে ওঠে, সেটা সর্বদাই শাদা, দুধের মতো। সেটা আমি হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখেছি, মুঠো মুঠো তুলে নিয়েছি, চুয়ে পড়েছে তা আঙুলের ফাঁক দিয়ে। অন্তত তখন তাই হয়েছিল: হাতের তালুর ওপর তা রেখেছি, জলের মতো তা গড়িয়ে গেছে নিচে, পড়েছে আমার কুর্তায়, প্যাণ্টে, গোল গোল নুড়িগুলোকে ধুয়ে ঝকঝকে করেছে...

বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো রাস্তাটা উঠল উঁচুতে। লাফাতেই

পলকের জন্যে তারার ঝিলিক দেখলাম। আরেকবার লাফাবার ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু এমনিতেই তখন তারা দেখা যাচ্ছিল। কেটে গেল কুয়াসা, ভেজা পাথর থেকে প্রথম ফুলকি ঠিকরল তারার। শুকনো রাস্তায় উঠে গা ঝাড়া দিলাম আমরা। কুর্তাটা ছুঁয়ে দেখলাম—ভেজা।

'সকাল হতে দেরি নেই,' শীতার্ত কণ্ঠে বললে বাবা।

পুবের দিকে আকাশ বরাবর একটা যেন ফরসা খাল, শাদাটে কী একটা গড়িয়ে যাচ্ছে নিচে।

আন্দাজ করলাম, কুয়াসা।

উঁচু জায়গাটা পেরিয়ে এল রাস্তা, সামনে দেখা গেল সেই শাদা জিনিসটাকে, জায়গায় জায়গায় তা ময়দার তালের মতো তুলতুলে। ফের হাঁটু, বুক, মাথা ডুবে গেল কুয়াসায়, মুখের ওপর টের পাচ্ছিলাম হাওয়ার ঝাপটা। সে হাওয়ায় পুবের দিকে সরে যাচ্ছিল কুয়াসা। মাঝে মাঝে তার ভেতরে ফরসা এক একটা ফাঁক গড়ে উঠছিল, ভেজা পাথর থেকে ঠিকরচ্ছিল তারার ফুলকি। সেই সময় যেন স্বচ্ছ কাগজের ভেতর দিয়ে ফুটে উঠছিল গরুর শিঙ, বাবার টুপি...

আর বিশ্বের সেরা রাস্তাটা আমাদের কেবলি এগিয়ে দিতে লাগল সামনে। হাঁটতে হাঁটতেই ঘুমিয়ে পড়ছিলাম আমি। হাতে শুকনো ডাল নিয়ে হাঁটি আর ঘুমই। হঠাৎ জেগে উঠে গরুর খুরের শব্দ আর শুনতে পাই না, শিউরে উঠি। চারিদিকে কালো বন, কুয়াসার শাদা শাদা ছোপ, ফরসা হয়ে আসা আকাশে সুদূর তারা। সভয় আনন্দে গা ছমছম করে ওঠে, প্রায় চেঁচিয়ে উঠি আর কি, ভেজা পাথরের ওপর দিয়ে ছুটে গিয়ে বাবা আর গরুর সঙ্গ ধরি, ফের খুসি হয়ে উঠি। ভয় কেটে যায়, ফের ঘুমিয়ে পড়ি,

তারপর দলছুট ভেড়ার ছানার মতো সঙ্গ ধরতে ছুটি আবার।

ভোরের বেলা যখন সবচেয়ে ছোট্ট তারাগুলোও নিভে গেল, তখন গাঢ় হতে শুরু করল কুয়াসা... আগের মতোই তা হয়ে রইল নিরেট। আর তখন, নিজেরই অজান্তে আমি আরো একটা চৌকাট পেরিয়ে আসি।

বাবাও ক্লান্ত হয়েছিল, হাঁটতে হাঁটতেই ঢুলছিল। সেটা আমি টের পেলাম যখন একবার ঘুমের মধ্যেই বাবাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যাই, হঠাৎ সজাগ হতেই কানে এল গরুর খুরের শব্দ আসছে পেছন থেকে। বাবা এসে আমার সঙ্গ ধরলে, কিন্তু কোনো কথা বললে না। মাথাটা তার বুকের ওপর ঝুলে পড়েছিল। ফের আমি পেছনে গিয়ে সারি বাঁধলাম, তারপর হঠাৎ শিউরে উঠে জেগে উঠলাম। একেবারে ফরসা হয়ে গেছে তখন, যে কোনো মুহূর্তে সূর্য উঠবে। অবশিষ্ট কুয়াসাগুলো কুণ্ডলী পাকাচ্ছে আমার পায়ের কাছে। এসে পড়েছি একটা ধুলোভরা আঁকাবাঁকা গেঁয়ো পথে। ধুলোর ওপর ছোটো ছোটো ধূসর শিশিরবিন্দু, যেন পুঁতি বসানো। বিরল কুয়াসার মধ্য দিয়ে দেখা গেল অদূরের বার্চ গাছ। তারা আর তখন ছিল না, তবে ফুটে উঠল মিলিয়ে আসা অর্ধচন্দ্র, তবে কাল যে জায়গাটায় দেখেছিলাম সেখানে নয়। একটা পায়ের শব্দ, একটা গলার স্বরও শোনা গেল না এই শূন্য জগতটায়। কাল রাতে যখন আমি পিছিয়ে পড়েছিলাম, তখনকার মতোই আমি একা, একেবারে একলা। কোথায় হারিয়ে গেছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো রাস্তাটা, সেই সঙ্গে বাবা আর দোচ্‌কা। প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি... কুয়াসায় ভেসে এল আমার চিৎকারের সংক্ষিপ্ত, সন্নিহিত প্রতিধ্বনি, তাতে ভয় বেড়ে গেল আরো।

সামনে ছুটতে লাগলাম আমি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হল বন, স্যাঁৎসেঁতে অন্ধকার বন। আগের জায়গায় ফিরে এলাম আমি, চেঁচালাম আরো ভয় পেয়ে, তারপর ছুটতে লাগলাম ঠিক উল্টো দিক ধরে। নিশ্চয় বিশ্বের সেই সেরা রাস্তাটা এখানেই আছে কোথাও, সেটা খুঁজে বার করে ছুটে গিয়ে নাগাল ধরব বাবার।

হঠাৎ ধুলোয় শুধু আমার নিজের পায়ের ছাপ চোখে পড়ল। কিন্তু বাবা কি দোচ্‌কা কেউই এ পথ দিয়ে আসে নি। তার মানে একা আমিই কখন বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো রাস্তাটা থেকে সরে এসেছি। চোখের জল ফেলে ছুটতে লাগলাম আরো জোরে।

ছুটতে ছুটতেই আমি উঠে গেলাম একটা সাঁকোয়, তারপর একেবারে থমকে গেলাম। ডাইনে বাঁয়ে সামনে কেবল নদীর ধূসর ঝিকিমিকি। ঠিক জীবন্ত একটা সত্তার মতো তার ওপর চাপ বাঁধছে কুয়াসা, কুণ্ডলী পাকাচ্ছে, বয়ে যাচ্ছে, গলে যাচ্ছে। সাঁকোর মাঝখানটা ভেঙে পড়েছে। জলে, নদীগর্ভ থেকে উঁচিয়ে আছে খোঁচা খোঁচা তক্তা আর কাঠ। ভাঙনটা খুব বড়ো রকমের নয়, মিটার দুয়েক হবে, তাহলেও ভাঙন বৈকি, হাঁ করে আছে তা এক অতল গহ্বরের মতো। কী করে পেরিয়ে এলাম ওটা। লাফিয়ে এসেছিলাম নাকি? নাকি কিছুটা তক্তার পথ তখনো টিকে ছিল যা আমার শেষ পদক্ষেপের পরই ধ্বসে পড়ে? নাকি ভালো মানুষ কেউ আমায় ব'য়ে নিয়ে আসে? কিন্তু এটা তো আর স্বপ্ন নয়। আমি তখন একেবারে জেগে! আমার পায়ের নিচেই দেখছি ভাঙা সাঁকো!..

'কী করে তুই পেঁাছলি ওখানে?' শোনা গেল বাবার শঙ্কিত কণ্ঠস্বর।

অপর পারে সে যেন মাটির সঙ্গে গেঁথে দাঁড়িয়ে আছে, নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছে না। তার পাশেই দোচ্‌কা দাঁড়িয়ে আছে আমার দিকে চেয়ে। 'লাফিয়ে গিয়েছিলি তুই?' জিজ্ঞেস করলে বাবা।

কিছুই জবাব দিলাম না আমি, দাঁড়িয়ে রইলাম হতবাক হয়ে।

'আর আমি ভাবছিলাম তুই বুঝি পেছিয়ে পড়েছিস। খুঁজে বেড়ালাম তোকে। ব্যাপারটা কী তোর?'

আমার দিকে মুখ বাড়িয়ে ডেকে উঠল দোচ্‌কা।

'ওরে তুই দোচ্‌কা, লক্ষ্মীমন্ত গরু আমাদের!' হেসে উঠলাম আনন্দে।

'পাগলা!' বললে বাবা, 'পড়ে মরতিস যে।'

'আচ্ছা বাবা, দুনিয়ার সেই সবচেয়ে বড়ো রাস্তাটা কোথায় গেল?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

থুতু ফেলে পা দাপালে বাবা।

'ফের তুই ওই সব শুরু করেছিস! দাঁড়িয়ে থাক ওখানে। আমি হেঁটে পেরনর একটা ব্যবস্থা করছি। কোন শালা সাঁকো ভেঙে গেছে, এখন করো মেরামত।'

প্যাণ্ট খুলে জলে নামল বাবা। দেখতে লাগলাম কীভাবে বাবা পা দিয়ে নদীর তল পরখ করে করে এগুচ্ছে। মনে হল নিশ্চয় আমরা আমাদের নতুন বাড়ির কাছাকাছি এসে গেছি। কিন্তু কোথায় সেই নতুন বাড়ি সেটা আমার তখনো জানা ছিল না...

আর কোথায় শেষ হল দুনিয়ার সবচেয়ে বড়ো রাস্তাটা, কোথায় আমি আরো একটা চৌকাট পেরিয়ে তা ফেলে এলাম, সেটাও আমার জানা হল না আর কখনো।

৫

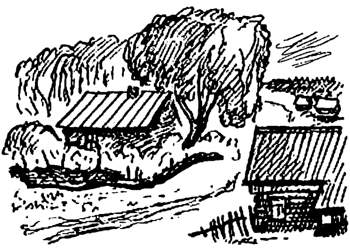
আর এখন এই সবটাই কেবল আমার স্বপ্নে ভাসে। শাদা কুয়াসা, ভেজা নুড়ি, তপ্ত দুধ-বরণী দোচ্‌কা সবই দেখি। বসে থাকি ধুনির কাছে, ধুঁইয়ে ওঠে তা, ফটফট শব্দ করে, ফুলকি ছিটায় আমার দিকে। গোলাপী মাঠ পেরিয়ে, নিষিদ্ধ দেশ উজিয়ে আমি হাঁটি সূর্যের সীমাহীন আঙিনা দিয়ে, আমার দুনিয়ার সবচেয়ে বড়ো রাস্তাটা যে এখনো কত লম্বা, কত চৌকাট এখনো পেরতে হবে, কত দেখব, জানব, আর আশ্চর্য সব ঘটনা বলব লোককে।

স্বপ্নে ভাসে, আবার ভাসেও না। জীবন আমার কেবলি বয়ে চলেছে, আমি হাঁটি আর চারিদিক চেয়ে চেয়ে দেখি। 'এদিক ওদিক চাইবি না'—ধমক দিয়েছিল আমার বাবা, 'প্রশ্ন করবি না, যত সব উদ্ভট খেয়াল'। তাহলেও এদিক ওদিক চেয়ে দেখি, জিজ্ঞাসা করি, খেয়াল পেয়ে বসে। না বাবা, আমি যে অন্য রকম হয়ে বেড়ে উঠেছি সে তো আর তোমার দোষ নয়।

এক একটা চৌকাট পেরিয়ে যাই নতুন চৌকাটে। সংখ্যায় তা কত কে গুণবে। শুধু ভাবি সেই চৌকাটটা কবে পেরলাম, যার পরে সবকিছুই লোককে গল্প করে জানানর ইচ্ছেটা জাগল। হয়ত সত্যিই ছিল সে চৌকাটটা, হয়ত ছিল না। তাহলেও কোথায় সেটা? হাতে একটা শুকনো ডাল নিয়ে হয়ত বা তখনি কি সেটায় পা দিই নি?

হয়ত ঠিক তখনি নয়... সে যাই হোক, কখনোই যে ভুলতে পারব না কীভাবে বাপের সঙ্গে আমাদের দোচ্‌কা গরুটিকে নিয়ে আমরা হেঁটেছি, কেবলি হেঁটেছি। যতই

হোক, সে রাস্তাটা বৃথা যায় নি, লোকেদের কাছে তার সবকথা বলা হয় নি তাই বন্ধুদের বাল্যকালে ভ্রমণের আমন্ত্রণ জানিয়েছি। বন্ধুরা, আর যারা সে ভ্রমণে যেতে রাজী সবাইকে। তা নইলে কি হয়। নিশ্চয় যে বেড়াতে হয় গোলাপী মাঠে, একবার অন্তত দেখা চাই কীভাবে সাধারণ পাথরের চকমকি ঠুকে সত্যিকারের ফুলকি বার করে তারা।



ভিক্তর তেলপুগভ। ১৯১৭ সালে মস্কোয় জন্ম। ফাসিবিরোধী যুদ্ধে প্যারাশুটিস্ট সৈনিক, পরে সাংবাদিক, লেখক, ছোটো লিরিক কাহিনীর ওস্তাদ। বেশি লেখেন আজকের দিনের লোক, বিশেষ করে তরুণদের কথা। বলেন, 'তরুণদের চরিত্রে সর্বদাই সেই দিকগুলো দেখতে চাই যাতে বর্ষীয়ান পুরুষেরা গর্ব ও মুগ্ধ বোধ করবে, কেননা সেইখানেই তো তাদের শ্রম স্বপ্ন ও প্রয়াসের ফলশ্রুতি।'

পড়াশুনার বাস

১৮ নং বাসটা যায় বুতিস্কির্ এলাকা থেকে শহরের কেন্দ্র হয়ে নদী তীরের রাস্তা বরাবর। ভারি আমার ভালো লাগে এই রুট দিয়ে যেতে। বুতিস্কির্ এলাকায় ছাত্রাবাস আছে অনেক, সকালে বাসটা ভরে যায় মুখর, হাসি-খুশি তরুণ দলে। প্রায় সবাই যায় নগর কেন্দ্রে, সবারই হাতে বই, ব্যাগ, পোর্টফোলিও। প্রথম স্টপেই ছাত্ররা প্রায় আধখানা বাস দখল করে বসে, আর শ্যামভবনটার কাছে বাসটা পরিণত হয় চাকায় বসানো মৌচাকে, অবিরাম গুঞ্জন ওঠে ভেতরটায়, খসখস করে পাতা, যেন দূরে কোথাও উড়ে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে সবাই...

কাজে যাবার সময় এ বাসটা ধরতে পারলে আমার মেজাজ থাকে সারাদিন ভালো।

আজ, ঠিক সেইরকম দিন! উঠেছিলাম সকাল সকাল, তাড়াহুড়া না করেই পৌঁছন গেল দব্রলিউবভ আর রুস্তাভেলি রাস্তার মোড়ে, আমাদের নীলবরণা সুন্দরীটি রওনা দেয় সেইখান থেকেই।

উঠে বসি, তাকিয়ে দেখি, মুখচেনা হলেও পুরো চেনা যারা নয়, মাথা নেড়ে অভিবাদন জানাই তাদের। দৈনন্দিন ছবি, তবু ঠিক পুনরাবৃত্তি নয়: জানলার কাছে কী নিয়ে যেন তর্ক চলছে, কী যেন প্রমাণ করতে চাইছে কারা, সোরগোল তুলে কার কথায় যেন আপত্তি করছে সদানন্দ এক ঝাঁক তরুণতরুণী। হাসি-খুশি এই গোলমাল, এই হৈচৈ, খোলা খাতা আর বই হাতে এই চিড়িয়াগুলোর সান্নিধ্যে চট করে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া নতুন লোকের পক্ষে কঠিন বৈকি...

সাভেলোভস্কি ইস্টিশন স্টপের কাছে বাসে উঠলেন এক বৃদ্ধা, অবাক হয়ে চারিদিক চেয়ে দেখে বিশেষ কাউকে উদ্দেশ না করেই সেয়ানার মতো বললেন:

‘এ কোথায় এসে পড়লাম রে বাপু?’

‘বসুন মা এইখানে, জানলার কাছে। গোলমালটায় কিছু মনে করবেন না, আমাদের বাসটা যে পড়াশুনা করে,’ বললে খুশি-চোখ গাঢ়-চুলের একটি মেয়ে, জানলার কাছের সীটটায় সেই বসে সর্বদাই।

উচ্চবাচ্য না করে বসে পড়লেন বৃদ্ধা, কিন্তু মুখটা তাঁর কেমন কোমল আর আত্মমগ্ন হয়ে উঠল। যেন হাসছেন। এমন শান্ত সংযত হাসি আমি দেখেছি কেবল ভারি বুড়ো আর ভারি ভালোমানুষ লোকেদের মুখে।

বাস চলল এগিয়ে। খুশি-চোখ গাঢ়-চুল যে মেয়েটি তার সীট ছেড়ে দিয়েছিল, অনেকক্ষণ থেকেই তাকে আর দেখা যাচ্ছে না। বৃদ্ধাও কী একটা স্টপে নেমে পড়লেন।

তারপর আরেকটি মেয়ে, মনে হচ্ছিল যেন পাঠ্যপুস্তকে একেবারে ডুবে আছে, হঠাৎ সামনের দরজা দিয়ে একজন পঙ্গুকে উঠতে দেখে চট করে নিজের নিবিড় জায়গাটি ছেড়ে দিলে।

কে একজন আরেকজনকে তিন রুবলের ভাঙানি দিলে, যা দিয়ে সে তার ভাষায় 'সরকারের দেনা শোধ' করবে (বাসটায় কোনো কনডাকটর নেই, যাত্রীরা নিজেরাই বাক্সে পয়সা ফেলে টিকিট ছিঁড়ে নেয়)।

কে একজন আরেকজনকে শিল্পপ্রদর্শনীতে যাবার পথটা বোঝাচ্ছে, স্বল্প বাষ্পাচ্ছন্ন শার্সির ওপর তার ছকটা পর্যন্ত সে এঁকে দিলে...

কান পেতে চোখ মেলে বসে থাকি আমি, আর গাঢ়-চুল মেয়েটির মুখ থেকে যে কথাগুলো যেন বা অলক্ষ্যে খসে পড়েছিল,—'আমাদের বাসটা যে পড়াশুনা করে'—তার গভীর অর্থটা যেন একটু একটু করে ধরতে পারি।

কথাগুলোকে নিয়ে আমি গানের মতো, কবিতার মতো গুনগুন করি:

আমাদের বাসখানা
করে পড়াশুনা...

হয়ত বললে হাসি পাবে তাহলেও আমার কিন্তু মনে হয় যেন বাসের ড্রাইভার পর্যন্ত গাড়িখানা চালাচ্ছে ভারি সযত্নে, মস্‌ৃণ গতিতে, ধাক্কা নেই, ঝাঁকুনি নেই: যেন বলতে চায়, আহা শান্তিতে ঢুলন্‌ক বন্‌ড়োরা, নিশ্চিন্তে বই পড়ন্‌ক ছেলেমেয়েগন্‌লো, লিখন্‌ক তাদের নোট, পড়াশন্‌না করন্‌ক বাসখানা...

আর ড্রাইভারের কেবিনে, এটা আমি নিঃসংশয়ে জানি, তার সানস্ক্রীনের সঙ্গে চেপে রাখা আছে বীজগণিত কিংবা ইংরেজি ভাষার কোনো পাঠ্যপন্‌স্তক।

বাসটা যে আমাদের পড়াশন্‌না করে!

হাঁটা পথ

আমি প্রায়ই গাঁয়ে থাকি, সেটা রাশিয়ার কেন্দ্রাঞ্চলের খন্‌ব মনোরম একটি জায়গায়।

...সন্‌নির্মল নদী, তন্দ্রাচ্ছন্ন সবন্‌জ সরোবর, রোদ্দন্‌র, ব্যাঙের ছাতা, আর বন্‌নো বৈঁচিতে ভরা বনপ্রান্তর। আছে ঘন্‌রে বেড়াবার মতো জায়গা, নির্জনে বসে থাকার মতো ঠাঁই, যে আগে কখনো এখানে আসে নি, তাকে দেখাবার মতো দ্রষ্টব্য।

কখনো কোনো বন্ধন্‌ এখানে অতিথি এলে আমি নির্ঘাৎ তাকে টেনে আনি এই বনে, এই সব মাঠে, নির্মল স্বচ্ছ ঝরনাগন্‌লোয়। গর্ব করে দেখাই, যেন নিজেরই

বাড়ি দেখাচ্ছি, সে বাড়িতে এখনো পুরোপুরি বাস শুরু না হলেও সত্যিকারের মানব সুখের উষ্ণতায় তা শ্বসিত।

...রহস্যময় খাদের তল দিয়ে অবিরাম কোথায় যেন ছুটে চলেছে তুহিন ভের্তুশিংকা নদী। নিবিড় গুখোভস্কি বন, তার প্রান্তে মাথা তুলেছে বেরেন্দেইয়ের অপূর্ব আরাম কেদারা, বার্চ গাছেরই এক রকম জাত এরা, একটা গুঁড়ি থেকেই বেড়ে উঠে তার কান্ডগুলো দিয়ে গড়ে তোলে কোন রূপকথার রাজার এক প্রকান্ড সিংহাসন। লিকানভ খাদের ওপাশে উইলো ঝোপঝাড়ের মধ্যে হরিণ দেখা যাবে যে কোনো দিন, যে কোনো সময়, সগর্বে উ'চু করে তোলা মাথায় তাদের পল্লবিত শিঙের মুকুট।

কিন্তু এই সব দর্শনীয়ের চেয়েও নবাগতকে আমি বিশেষ করে দেখাতে চাই পায়ে হাঁটা একটি তরতরে বনপথ, সমস্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে এটি আমার বেশি প্রিয়।

খাল বিলের মধ্যে দিয়ে তা এগিয়ে যায়, ডিঙিয়ে চলে পুরনো গাছপালার পড়ে থাকা গুঁড়িগুলো, হরিণদের জলখাবার জায়গাটার ওপরকার কাঠি ঝাড় বেয়ে হারিয়ে যায় ঝোপগুলোর মধ্যে, মেয়েলী নদীর চ্যাপটা চ্যাপটা পাথর বরাবর লাফিয়ে আসে এককে ঠ্যাঙে, পিছলে যায় প্রথম শীতের টলমলে তুষারের ওপর দিয়ে, ঢুকে পড়ে জানুয়ারির গভীর তুষারস্তূপের মধ্যে, মার্চের বরফগলা নীলচে জলের মধ্যে দিয়ে পা ফেলে ছপছপিয়ে।

শীতে গ্রীষ্মে দিনে রাতে ছোটাছুটি করে হাঁটা পথটা, এ-ওকে ডাকাডাকি করে খিলখিলিয়ে হাসে, বনময় ছড়ানো

বড়ো বড়ো গোল পাথরগুলোর সঙ্গে লুকোচুরি খেলে, দৌড়ের পাল্লা দেয় বার্চ আর ম্যাপল গাছগুলোর সঙ্গে, ছোটে আর চাপড় মারে গাছপালার ঝুমঝুমি কাণ্ডগুলোয়। এক মিনিট থেমে যেন কান পাতে বনের স্তব্ধতায়, বার দুয়েক ডাকাডাকি করে এর ওর সঙ্গে, তারপর ফের ছুট দেয় টিপি থেকে টিপিতে, পাথর থেকে পাথরে...

দুটি গাঁ গ্লুখোভো আর ভের্তুশিনোর যোগাযোগ ঘটিয়েছে পথটা।

এ গাঁ থেকে ও গাঁয়ে যেতে অন্য রাস্তাও আছে। যেমন যাওয়া যায় কাঁচা রাস্তাটা দিয়ে হেঁটে, অথবা পথ-চলতি গাড়িতে (শুধু সময়মতো হাত তুলতে হবে, যাতে ড্রাইভার গাড়ি থামাতে পারে)। তবে গ্লুখোভো থেকে ভের্তুশিনো যেতে হলে এই প্রাণোচ্ছল লম্ফমান হাঁটা পথটার চেয়ে সহজ সেরা পথ মেলা ভার। এ পথটা পাতা হয়েছে গ্লুখোভো গাঁয়ের ছেলেমেয়েদের পায়ে পায়ে, রোজ সকালে তারা এই পথ দিয়েই তাড়াহুড়ো করে যায় ভের্তুশিনো গাঁয়ের স্কুলে।

সর্বদাই তাদের তাড়াহুড়ো, সর্বদাই একটু দেরি হয়ে যায়, সর্বদাই পৌঁছয় ঠিক সময়ে...

যেমন আজ দূর থেকেই শোনা যাচ্ছে ওদের দ্রুত গমনের সোরগোল। নিশ্চয় তাড়াহুড়ো করে চলছে, ফের দেরি হয়ে গেছে, ফের ছুটে পৌঁছবে ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে। সবারই কাঁধে বইভরা ফুলো ব্যাগ, গলায় বাঁধা অরুণবরণ পাইওনিয়র রুমাল, মাথার ওপর হৈমন্তী বার্চ আর ম্যাপল গাছের মর্মর শব্দ।

...এক্ষুণি ওরা পৌঁছবে স্কুলে, বসবে ডেস্কের

সামনে, খুলে ধরবে বই, আর ছোকরা মাস্টার ওদের বোঝাবে যে দুই বিন্দুর মধ্যে হ্রস্বতম ব্যবধান হল সরল রেখা।

আমি বাজি রেখে বলতে পারি—কথাটা পুরোপুরি সত্যি: গ্লুখোভো থেকে ভের্তুশিনো যাবার হাঁটা বনপথটায় আমারও জুতোর দাগ আছে। আমাদের এ দুই গাঁয়ের মধ্যে এর চেয়ে সংক্ষিপ্ত ও সোজা পথ আর নেই, নেই এর মতো অপূর্ব পথ!..



ভাসিলি বেলোভ। ১৯৩৩ সালে জন্ম। 'তিন চড়ার পারে' নামে বড়ো ও ছোটো গল্পের সংকলন বেরবার পর খুব নাম করেন। সমালোচকের মতে 'লেখক সাধারণ কৃষকের মধ্যে বিশ শতকের ষাটের দশকের মানুষের প্রাণ সঞ্চার করতে পেরেছেন, যে মানুষ এ যুগের সমস্ত অভিজ্ঞতায় প্রাজ্ঞ, তার সমস্ত যন্ত্রণায় ব্যথিত।'

ল্যুবা-ল্যুবুশ্কা

১

সূর্য অস্ত যাবার পরেও রাতের শান্ত মাঠ বেয়ে বাড়ি যাবার সময় মাথার ওপর ওড়াওড়ি করে কাঁদে ভীরু টিটিট্টির পাখিগুলো। মাঠের নিচু জায়গাগুলোয় কুয়াসা জমতে দেখা যায়, সারা মাঠ জুড়ে ডাকে গঙ্গাফড়িঙ, মনে হয় যেন ঘাসগুলো কাঁচ হয়ে ঝমঝম করছে বাতাসে, আর তখন এইসব ঢালু মাঠ আর ঝঙ্কৃত গোচরগুলো দিয়ে ভালো লাগে হাঁটতে, ভালো লাগে ঘাসের নরম চাপড়ায় পা ফেলতে।

কেন অমন করুণ সুরে কাঁদে টিটিট্টিরগুলো? কিছু-ছু বোঝে না এরা, ঝুঁটি তোলা এই মেঠো পাখিগুলো। কেবলি চেঁচায় আর মাথার ওপর দিয়ে ওড়ে আর ভাবে বুঝি আমায় ওদের বাসা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু রোদ্দুর আর শুকনো ঘাসের গন্ধ ঝরানো এই কুমারী হাতগুলোয় ওদের ভয় পাবার কী আছে?

ঘরের ভেতরটা আলো-আলো, যেন এখনো রাত হয় নি,

কেবল গাছ গাছালির ওপাশ থেকে কেবল তার একটু হালকা নিঃশ্বাস ভেসে এসেছে। বেঞ্চিগুলোর তলে, চুল্লির ওপাশে যেন ঠিক কেউ লুকিয়ে আছে, টেবিলের ওপর এক রহস্যময় মিহি সুরেলা তান ধরেছে সামোভার। সে গানে কী না শোনা যায়! টেবিলের ওপাশে বেঞ্চিতে বসে কান পেতে শুনলেই মুহূর্তের জন্যে প্রাণ হিম হয়ে যাবে জানুয়ারির তুষার ঝড়ের শীসে, তারপর সামোভার আস্তে বেজে উঠবে বিয়ে-বাড়ির ঠুনঠুন ঘণ্টায়, চুপ করে যাবে, তারপর গেয়ে উঠবে এক অজানা মেয়েলী দলের না গাওয়া কোন গান,—একেবারে সেই প্রথম গানটি যা এত ভালো, এই আলো-আঁধারিতে এতই ধরা-ছোঁয়ার বাইরে যে কিছুতেই মনে থাকে না।

আঙিনা থেকে দুধ দু'য়ে আসে মা। খোলা দরজার ওপাশে বারান্দায় দুধ ঢালে সে, শোনা যায় তার হিশেবী কলকল ধ্বনি, ধপ করে মেঝেতে লাফিয়ে পড়ে বেড়াল, বুড়ো হলেও ছুটে আসে, ঝোঁক ধরে, ওম-ওম দুধ খেতে চায়। গান গেয়েই যায় সামোভার, পুরো খাওয়া হয় না চায়ের কাপটা, নরম গেঁয়ো কার্পেটের ওপর নিঃশব্দে নামে খালি পা দুখানা।

'মা? তোমায় নিয়ে কী যে করি। বলেছিলে আমি না আসা পর্যন্ত সবুর করবে। আমি নিজেই দুইতাম।'

'হায়-হায়-হায়!' যেন মেয়ের অনুযোগ কানে যায় নি, ভান করা কান্না-কান্না গলায় মা বলে, 'দুধ পড়ে গেল যে কলসী থেকে। আয় পাজীটা, খেয়ে নে।'

মেঝেয় পড়া দুধটার কাছে জমিয়ে বসে বেড়াল। ফটক বন্ধ করে মা, সামোভার থেকে গরম জল নিয়ে দুধের বালতিটা ধোয়, তার মুখ থেকে টেনে তোলা পল্লবটাকেও ধোয়।

'লুবা, ও লুবুশকা? ঘুমতে যা লক্ষ্মী, রাত তো কম হয় নি।'

বারান্দার জানলাটা গজ কাপড়ের পর্দা দিয়ে আঁটা, তার ভেতর দিয়ে গলে আসে একটা মশা। অন্ধকারে কোথায় সেটা ওড়ে, তার করুণ গুঞ্জন কখনো কাছিয়ে আসে, কখনো সরে যায়, আর তার তালে তালে শিয়রে এসে লাগে ঘুমের ক্লান্ত ছোঁয়া। মুখে হাসি নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে লুবা। বাস্তবের শেষ অনুভূতিটা সরে আসে স্বপ্নে আর ছাদের ওপর একের পর এক বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে ভেঙে যায়, যেন বইয়ের পাতায় সারি সারি ডট্।

ভোরের দিকে মাঠ আর গাছগুলোর মাথায় নিবে গেল বিজলীর শেষ ঝলক। গ্রামেরা ঘুমায়, ধুমায়মান ঠান্ডা নদীটা। বনের মধ্যে অনেক দূরে নিজের বাচ্চাটাকে দেখতে না পেয়ে ডেকে উঠল একটা ঘোড়া, তন্দ্রালু সাড়া দিলে রাতের রাখাল। সারা গ্রাম চুপচাপ, কিন্তু কিশোরীর স্বপ্নে সে নীরবতা নেই। মস্ত এক উৎসবের স্বপ্ন দেখছে লুবা, অনেক লোক সেখানে, ঝিলমিল করছে অসংখ্য রিবন, দূর থেকে ভেসে আসছে এক আকুল করা দুর্বোধ্য সঙ্গীত, ঝলক দিচ্ছে যত অচেনা, তবু কেমন যেন চেনা চেনা সব মুখ, কাকে যেন খুঁজছে লুবা, কিন্তু কিছুতেই পাচ্ছে না তাকে, সবুরও আর করা যায় না। না-বোঝা গানটার দিকে ছোটে লুবা, শক্তিতে আর কুলায় না, ভিড়ের মধ্যে চেয়ে দেখে হঠাৎ ওর হিম হয়ে এল বুক, একেবারে কাছিয়ে এসেছে সে, এক্ষুণি এক্ষুণি সে কাউকে দেখতে পাবে, আর সব কিছু সুন্দর হয়ে উঠবে। কেবলি সব ভেসে যাচ্ছে তার চোখের সামনে দিয়ে, এই কী একটা ঝলক দিলে। আহ্, শুধু তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি, গরম লাগছে তার, নিঃশ্বাস

বন্ধ হয়ে আসছে—তারপর হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গেল একটা মধুর উৎকণ্ঠ যন্ত্রণায়।

জানলা থেকে গজ কাপড়ের পর্দাটা খসালে লম্বা, চওড়া এক ঝলক প্রভাতী আলো আছড়ে পড়ল ভেতরে। স্বপ্ন তখন আর নেই, কিন্তু তার আমেজটা ছিল, তেমনি একটা শঙ্কা আর মাধুর্যে কী যেন লুকিয়ে রয়েছে তার বুকে। কী স্বপ্ন দেখছিল সে? উৎসব? অনেক লোক? না, তা নয়, অন্য কী একটা। কোথায় যাবার জন্যে যেন তাড়াতাড়ি করছিল সে, কী যেন দেখতে চাইছিল সে, কী একটা যেন ঝলক দিয়ে মিলিয়ে গেল। কিন্তু কী সে দেখতে চাইছিল, কার মুখ ঝলক দিয়েছিল? না, বরং ও কথা সে ভাববে না, পোষাক পরতে পরতে সে ভাবতে চাইল অন্য কিছু, কিন্তু থেকেই গেল স্বপ্নে অনুভব করা সেই উদ্বেগ আর আনন্দটা, উঠে এল তা দৈনন্দিন বাস্তবের মধ্যে।

* * *

চারিদিকে বহুদূর ছড়িয়ে গেছে আকাশ, উত্তাপে তিরতির করছে। আধখানা বিশ্ব জুড়ে বেগুনী-পাড় মেঘ আর ঝাপসা নীল, সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত সূর্য ভেসে বেড়ায় তাতে, আর সবুজ মাটিতে নিঃশ্বাস ফেলে বাতাস। আড্ডা দেয় নদীর নীল জলে, তারপর হঠাৎ আলগোছ ছোঁয়ায় সযত্নে চামর বুলিয়ে দেয় লোকের মুখে।

পিঠের ওপর বিদ্ঘুটে লেজ তুলে বহুক্ষণ গাঁয়ে ছুটে এসেছে গরুগুলো, দাঁড়িয়ে আছে পুরনো গোয়ালের ঠাণ্ডায়, আর গোয়াল ঘিরে রোদের মধ্যে উড়ছে ভিমরুলগুলো।

গাঁয়ের মধ্যে মোরগের পেছু পেছু ঘুরছে মুরগীগুলো, নয়ত রাস্তায় টাটকা ছাইয়ের মতো তপ্ত ধুলোয় পেট ঠেকিয়ে

বসে আছে। এত গরমে ডাকতেও আলস্য হচ্ছে মোরগের। রাস্তার কাছে নুয়ে পড়া গম গাছগুলো থেকে আসছে তপ্ত সুরভি।

ঝাড়া রাইয়ের একটা গাড়ি যখন সাঁকোর ওপর ঘড়ঘড় করে এসে থেমে গেল, চুপ করে গেল তখন সাঁকোর ঘাসগুলোও।

ল্যুবা লাগামগুলো বাঁধলে গাড়ির সামনের কাঠে, হাত আড়াল করে চাইলে সূর্যের দিকে। তারপর লাফিয়ে নেমে এক মুহূর্তের জন্যে ছুটল নদীতে। এইখানে ঠিক সাঁকোর কাছেই দু'ভাগ হয়ে গেছে নদীটা, হোগলা ভরা চরটার প্রান্ত লুকিয়ে গেছে সাঁকোর নিচেই।

'উঃ, তেষ্টায় প্রাণ গেল!' আগ্নেয়ুশ্‌কাও ছুটল নদীর দিকে, জুতো খুলে অসংকোচে অনাবৃত করলে তার তুষার-ধবল পা।

দুই সখীতে জল ছিটলে খানিক, তারপর সাঁকোর নিচের মস্তো পাথরটার ওপর বসলে।

'ভারি গরম আগ্নেয়ুশ্‌কা... জানিস, কাল রাতে যে একটা স্বপন দেখেছি না...'

'ফের তোর ওইসব শহর টহর নিশ্চয়। তুই যে কী ল্যুবা, কেবলি যত রাজ্যের উড়ু-উড়ু ভাবনা তোর।'

'ভাবনা আমি করি না...'

'করিস, কিছু একটা হলেই অমনি যত খেয়াল তোকে পেয়ে বসে। আর এই দ্যাখ আমি, কিছুই ভাবি টাবি না। ইচ্ছে হল, প্রাণ ভরে কেঁদে নিলাম। তারপর সারা সপ্তাহ ধরে ফের হাসাহাসি।' জলের মধ্যে পা দোলাতে দোলাতে গেয়ে উঠল আগ্নেয়ুশ্‌কা:

> সই লো এতো সায়র নয়
> সায়র নয় — নদী।

সই লো এতো নাগর নয়,
ক্যাবলা কুলনিধি।

তারপর স্বচ্ছ জলে হাঁটু ছলবলিয়ে ছুটে উঠল ঘাসঢাকা পাড়ে।

'ল্যুবা দ্যাখ দ্যাখ, আসছে আমাদের নাগরটি, একেবারে কনে-দেখা সাজ করেছে।'

চেক কাটা শার্ট চড়িয়ে জুতো পায়ে সাঁকোর ওপাশ থেকে এগিয়ে এল আফ্রিখা। রেলিঙের ফাঁক দিয়ে থুতু ফেললে সে, আগ্নেয়ুশ্কা আর ল্যুবার সঙ্গে করমর্দন করে এপায়ে ওপায়ে ভর দিতে লাগল।

'কী, গাড়ি হাঁকাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করলে সে।

'হাঁকাচ্ছি।' বললে আগ্নেয়ুশ্কা, 'তুমি তো আড্ডা মেরে বেড়াচ্ছ, আর মাল বইতে হচ্ছে আমাদের। তা এত সাজের ঘটা যে?'

'গ্রাম সোভিয়েতে গিয়েছিলাম, একটা সার্টিফিকেট দরকার ছিল।'

'আর আমি ভাবছিলাম বিয়ে রেজেস্ট্রি করতে গিয়েছিলে।'

'আগ্নেইকা, ফাজলামি ঘুচিয়ে দেব।'

'ভেবেছিলাম, আফ্রিখার বিয়েতে এবার আমি আর ল্যুবা যা নাচব না...'

'ভালো হচ্ছে না বলছি!'

'ভেবেছিলাম...'

আগ্নেয়ুশ্কার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে আফ্রিখা, কোমর জড়িয়ে ধরলে। চেঁচাতে লাগল আগ্নেয়ুশ্কা, কিন্তু কিছু ঠাহর করতে না করতেই উল্টে পড়ল মাটিতে, আফ্রিখাও মনের সুখে তাকে চাপতে আর চটকাতে লাগল, তারপর নিজের কৃতিত্বে তৃপ্ত হয়ে ছেড়ে দিলে। দম আটকে এসেছিল

আগ্নেয়ুশ্‌কোর, তাহলেও তক্ষুণি সে লাফিয়ে উঠল যেন কিছুই হয় নি, শুধু মুখখানা হয়ে উঠল আরো লাল টকটকে।

'ভেবেছিলাম...'

তেড়ে যাবার একটা লোক দেখানি ভঙ্গি করলে আফ্রিখা, ছুটে পালাল আগ্নেয়ুশ্‌কা, তারপর ফের কাছে সরে এল।

'লুবা, তুই অন্তত আমার পাশে দাঁড়াতে পারতিস।'

কটাক্ষে লুবার দিকে চেয়ে সিগারেট ধরালে আফ্রিখা:

'ও হো, প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম, লিপিনোর মেয়েরা তোমাদের একটা চিরকুট পাঠিয়েছে আমার হাত দিয়ে। আজ ওরা আসর বসাচ্ছে, তোমাদের নেমন্তন্ন করেছে। আমাকেও ডেকেছিল, বলেছি আমাদের মেয়েরা যদি যায় তাহলে আমিও যাব। যাওয়া যাক, কী বলো?'

'চল যাই লুবা, এ্যাঁ?' লাফিয়ে উঠল আগ্নেয়ুশ্‌কা, 'অনেকদিন লিপিনোয় যাই নি। জাবলোতিয়ে গাঁয়ের ছেলেরাও হয়ত আসবে।'

'হ্যাঁ আসবে,' সমর্থন করলে আফ্রিখা, 'অ্যাকর্ডিয়ন নিয়ে আসবে বলে কথা দিয়েছে।'

'জাবলোতিয়ের ছেলেরা এল তো কী হল? আমি লিপিনো, জাবলোতিয়ে, কোনো গাঁয়ের কাউকেই কখনো দেখি নি। আর ওই গালভরা চুটকি গান এখানেই কত শুনেছি।'

'তা চিরকুট-টা তো নাও,' বললে আফ্রিখা, 'তোমাদের যা ইচ্ছে, আমি একলাই যাব। যদি মত পালটায় এসো।'

খালের পাশ বরাবর গাছে ছাওয়া হাঁটাপথটা ধরে গাঁয়ের দিকে চলে গেল আফ্রিখা। চিরকুটটা খুললে লুবা। চৌখুপি কাটা স্কুলের খাতা থেকে ছিঁড়ে নেওয়া একটা পাতায়

লেখা ছিল অতটার সময় লিপিনোর অমুক বাড়িতে আসার নেমন্তন্ন।

'যাওয়া যাক, কী বলিস আগ্নেয়ুশ্‌কা?'

আগ্নেয়ুশ্‌কা লাফিয়ে উঠল গাড়িতে, লাগাম খুলে নিয়ে তড়বড় করে বললে:

'তোর শাদা স্যান্ডেল জোড়া আমায় পরতে দিবি, এ্যাঁ?'

২

বনপ্রান্তের উষ্ণ মাঠগুলো দিয়ে, বালি ভরা নদী আর বিলবেরি ছাওয়া ঢিপি উজিয়ে, কখনো সরে গিয়ে কখনো ফের এসে মিলে, মাটি আঁকড়ে আছে লিপিনো যাবার রাস্তাটা। গ্রীষ্মের মধ্যে বার দুই কেউ এ রাস্তা দিয়ে যাবে দু'-চাকার গাড়িতে, ভয় পাইয়ে দেবে থপথপে-পা বড় বড় পাখিগুলোকে, এবং ফের স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তুলবে চাকার দুটো খাত আর তাদের মাঝখান দিয়ে পায়ে হাঁটা পথ।

তরুণ পায়ের কাছে আট কিলোমিটার ফুর্তির পথটা আর কতটুকু?

খবরের কাগজে স্যান্ডেল জোড়া মুড়ে খালি পায়ে সবার আগে ছুটছে শক্ত-ঠেঙে আগ্নেয়ুশ্‌কা, চাপড় মারছে মশায়, মাঝে মাঝে নিচু হয়ে ছিঁড়ছে লাল লাল বুনো বৈঁচি। পরনে তার কালো হাল-ফ্যাশনী স্কার্ট, লাল ব্লাউজ, জ্যাকেটটা সে চাপিয়েছে আফ্রিখার জিম্মায়। আফ্রিখা পেছনে কোথায় থেকে গিয়ে হয়ত উইলো ডাল কাটছে কি অন্য কিছু করছে।

বনের ওপারে ইতিমধ্যেই পাটে বসেছে সূর্য। বিচালির গন্ধ ছড়াল, তারপর দিনের রোদে তেতে ওঠা র‍্যাস্‌পবেরির সুবাস, তারপর ফার কাঠের লকড়িস্তূপ থেকে রজনের ঝাঁঝ।

শুকিয়ে আসা নদীটা পেরবার সময় ল্যুবাও তার কালো স্কার্টটা একটুখানি তুললে, অমনি ঝাঁক বেঁধে ছুটে এল মশা। আগ্নেয়ুশ্‌কার মাথায় সব সময় পোকা নড়ে, আফ্রিখার ঢঙ নকল করে সে গান ধরলে:

গেয়ে ওঠো ভাই ফুর্তি করে
গানের মতো গান,
কন্যেরা সব বনের পারে
থাকুক পেতে কান।

আগ্নেয়ুশ্‌কার গলাটি ভালো, বিশেষ করে বনের মধ্যে শুকনো পাইনকুঞ্জে যখন তা প্রতিধ্বনি তোলে।

সখার সাথে নদীর তীরে
বেড়াই হেঁটে হেঁটে,
পটিয়েছি দুই কুমারীরে
একটু বেঁটে বেঁটে।

একেবারে আড়াল নিলে সূর্য, একটু নরম হয়ে উঠল ঘাস, আর আরো ঝাঁক বেঁধে ছেঁকে ধরল মশা।

'উঃ, কামড়ে জ্বালালে একেবারে।' তারপর ফের পুরুষালী গলায় গেয়ে উঠল আগ্নেয়ুশ্‌কা:

বিড়ি খেয়েই দিন কেটেছে,
আজ সিগারেট পীজিয়ে,
সুন্দরীটির নাক ছিল না,
উঠল হঠাৎ গজিয়ে।

পেছনে বাঁকের ওপাশ থেকে আফ্রিখার হাঁক শোনা গেল:

'এই মেয়েরা! এখান দিয়ে সোজাসুজি চলো, তাড়াতাড়ি হবে।'

হাঁটতে হাঁটতেই ব্যাঙের ছাতার মাথাগুলো ভাঙতে

ভাঙতে আফ্রিখা ওদের সঙ্গ ধরলে এসে, জ্যাকেটটা দিলে আগ্নেয়ুশ্‌কাকে।

সোজাসুজি হাঁটাপথটা ধরলে ওরা, এটা আফ্রিখার জানা ছিল। সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে চমৎকার উইলো ছড়িটা দোলাতে দোলাতে চলল আফ্রিখা। ছড়িটা ঘিরে পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে কাটা ছালের একটা শাদা ডোরা। মশাগুলো এখন তাকে কামড়াচ্ছিল না।

ঘাস কেটে নেওয়া একটা মাঠে পেঁছল পথটা। তার মাঝখানে বিচালি ঠাসা একটা চালা। ছোট্ট নদীটার ওপারে গোচর, তারও ওপাশে লিপিনো গ্রামের বড়ো ক্ষেতটা কুয়াসায় শাদা হয়ে আছে। নদীতে পেঁছে আফ্রিখা কান পেতে শুনল। গাঁয়ের দিক থেকে কোনো শব্দই কানে এল না। পা ধোয়ার জন্যে জলে নামল ল্যুবা।

'লজ্জা করছে, এসে হাজির হয়েছি সবার আগে ভাগে,' বললে সে। কিন্তু সেই সময়েই গ্রামটার দিক থেকে প্রথমটা নিচু সুরে, তারপর সজোরে বেজে উঠল অ্যাকর্ডিয়ন।

আগ্নেয়ুশ্‌কার ভাবভঙ্গি একেবারে বদলে গেল:

'আফ্রিখা, নাও মুখ ফেরাও, চেয়ে দেখবে না কিন্তু।'

'আহা, ভারি আমার রাজ-কন্যে এসেছেন,' বলে মাঠের ওপর বসলে আফ্রিখা, নির্বিকারভাবে মুখ ফিরিয়ে সিগারেট খেতে লাগল, আর সেই ফাঁকে আগ্নেয়ুশ্‌কা আর ল্যুবা তাদের মোজা পরে নিলে।

ঘন কুয়াসায় নদীটা ঢাকা, একটা মেঠো পাখি ডেকে উঠল। হঠাৎ লিপিনো গ্রামের অ্যাকর্ডিয়ন গেল থেমে। কিন্তু ল্যুবা জানত যে বাজনাটা থেমেছে কেবল অলপক্ষণের জন্যে, এখন ঠিক সেই মুহূর্তটা, যখন এ বাড়ি ও বাড়ি ছোটাছুটি করছে মেয়েরা, আর ছোকরারা বসে আছে কোনো

কুটিরে ভিড় করে। আরো মিনিট পাঁচেক গেলেই রাস্তায় যে বাচ্চারা এখন কানামাছি খেলছে তারা খেলা থামিয়ে নিশ্চল হয়ে ঈর্ষার দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখবে বড়োদের।

* * *

এ মোড় থেকে ও মোড় পর্যন্ত রাস্তাটা যেন মুকুলিত হয়ে উঠেছে। রাতের আলো-আঁধারিতে কালো কালো হয়ে উঠেছে ছেলেগুলোর মূর্তি, আর অ্যাকর্ডিয়ন-বাজিয়ে এমন চমৎকার করে বাজাচ্ছিল যে হঠাৎ বুকের মধ্যে কেমন যেন করে উঠল লুব্যার। আগ্নেয়ুশ্‌কারও। গাঁয়ের অন্য দিকটার মাঠ দিয়ে এল জাবলোতিয়ের দল। প্রথমে তারা গোটা গাঁটা ঘুরলে। লিপিনোর ছেলেরা তাদের পথ ছেড়ে দিলে সম্মান করে। তারপর ঘুরে এসে তারা থামল রাস্তার মাঝামাঝি একটা বড়ো বাড়ির সামনে। ছেলেরা যতক্ষণ নমস্কার বিনিময় করছিল, মেয়েরা ততক্ষণে একটু দূরে বার্ড-চেরি গাছের নিচে তাদের প্রসাধন সেরে নিলে।

ভিড় করে মস্ত একটা বৃত্ত রচনা করলে ছেলেরা, লুব্যা আর আগ্নেয়ুশ্‌কাও গেল সেখানে। অ্যাকর্ডিয়ন-বাজিয়েটি তাড়াতাড়ি জুতোর হিল দিয়ে সিগারেটটা নিবিয়ে স্ট্র্যাপটা গলিয়ে দিলে কাঁধের ওপর। নাচতে গেল জাবলোতিয়ের দুটি ছোকরা। এই সময় আরেকটা বৃত্তে নিজেদের অ্যাকর্ডিয়ন-বাজিয়ের সঙ্গতে নাচছিল লিপিনোর মেয়েরা: আফ্রিখা চলে গেল সেই দলটায়, লুব্যা আর আগ্নেয়ুশ্‌কা রয়ে গেল।

এক মুহূর্তের জন্যে চোখ বুজলে লুব্যা। প্রায়ই জলদে ফিরছিল যন্ত্রটা, পর্দার ওঠা-নামা জনতার মাথার ওপর দিয়ে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে বার্ড-চেরি গাছটার কাছে, লোকজনের

গুঞ্জন মিশে যাচ্ছে একটা অখণ্ড স্বননে, সবকিছুই কেমন উষ্ণ, সশঙ্ক, যেন তার দেখা সেই স্বপ্নটাই। চোখ মেললে ল্যুবা, হঠাৎ উত্তেজনায় আড়ষ্ট হয়ে গেল সে: অনতিদীর্ঘ অচেনা কালো ভুরু একটি ছেলে তাকিয়ে আছে সোজা তার দিকেই। দাঁড়িয়ে ছিল সে পাশেই, সঙ্গে সঙ্গেই মুখ ফিরিয়ে নিলে। মুখ ফিরিয়ে নিলে ল্যুবাও, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ফের অনুভব করল সেই দৃষ্টিটা, টের পেল সে লাল হয়ে উঠছে, মাথার রুমাল ঠিক করতে লাগল তাড়াতাড়ি, আগ্নেয়ুশ্‌কার কথা কানে যাচ্ছিল না।

'ল্যুবা, চল যাই নাচি, শুনছিস?' তাড়া দিচ্ছিল তাকে আগ্নেয়ুশ্‌কা, 'আমরাই বা কম কিসে? চল যাই।'

ভিড় ঠেলে আগ্নেয়ুশ্‌কা চলে গেল সোজা অ্যাকর্ডিয়ন-বাজিয়ের কাছে, বাজনাটা সে কমিয়ে আনল, আর ফিসফিস করে আগ্নেয়ুশ্‌কা যা বললে তাতে সায় দিলে মাথা নেড়ে। কিন্তু কিছুই এ সব চোখে পড়ল না ল্যুবার, কিছুই কানে গেল না। ও যেন ল্যুবা নয়, যেন ল্যুবা আছে দু'জন, একজন এইখানে দাঁড়িয়ে, আরেক জন কে জানে কোথায়। পাশের লোকটার দিকে চাইবার সাহস হল না তার, সে কিন্তু সমানেই দাঁড়িয়ে রইল পাশেই।

বৃত্তের মধ্যে এগিয়ে গেল আগ্নেয়ুশ্‌কা—গরবিনী, প্রাণোচ্ছল, সঙ্গে সঙ্গেই সবারই দৃষ্টি পড়ল তার দিকে। অ্যাকর্ডিয়ন-বাজিয়েও অন্য সুর ধরলে, একটু থামল আগ্নেয়ুশ্‌কা, তারপর অনাবিল কণ্ঠে গেয়ে উঠল:

নেতিয়ে গেলি সুরের ডালি,
নরমে ধর তান,
গলাতে তোর জোর ফুরালি
গাইতে অত গান।

সঙ্গে সঙ্গেই জমাট হয়ে উঠল বৃত্তটা, পেছনকার লোকেরা সবাই দেখতে চাইছিল, সবাই এল ভিড় করে। এই দলটায় ল্যুবার সামনে দাঁড়িয়ে আগ্নেয়ুশ্কা ফের গেয়ে উঠল:

সখি লো চৈৎ নয় কো আষাঢ়,
বুনলেই গাছ হয় না থাকে থাকে,
সখি লো, শোন আমরা নাচার,
ভালোবাসা যায় না যাকে তাকে।

বরাবরই আগ্নেয়ুশ্কা নাচে ভালো, বিশেষ করে বাজনাটা যদি হয় মনের মতো। একটু সাহস হল ল্যুবার, যদিও আগের মতোই কী একটা মধুর উদ্বেগে গাল তার তখনো লাল হয়েই ছিল। ভাবলে সে, যা হবার হোক, আগ্নেয়ুশ্কাকে ডোবানো চলে না, তাকেও নামতে হবে।

আয় লো সখি শুনিয়ে দে গান,
আমাদের কেউ শোনাবে না,
দুঃখের দিন, যতই সে হোক
চিরটা কাল আর রবে না।

আয়রে ল্যুবা, আয় এগিয়ে
সখি রে তুই, হাত দে হাতে,
আমরা দু'জন অনাথিনী
নাচব দু'জন একই সাথে।

গান শেষ করে আগ্নেয়ুশ্কা গিয়ে দাঁড়াল ল্যুবার জায়গায়। ল্যুবা নামল আসরে।

এত লোকের সামনে ল্যুবা আর কখনো আগে নাচে নি, অত অনায়াসে তার পায়ে অমন তাল ওঠে নি আগে, সবচেয়ে ভালো ভালো সব ছড়াও কখনো অমন করে ভেসে ওঠে নি তার স্মৃতিতে। নাচতে নাচতেই সে দেখল তার দিকে

চেয়ে আছে চওড়া-কাঁধ সুপুরুষ ছেলেটি, দেখল কীভাবে আফ্রিখার সঙ্গে সিগারেট খাচ্ছে সে।

শেষ পাক নেচে ল্যুবা আগ্নেয়ুশ্কার সঙ্গে বেরিয়ে এল আসর থেকে।

আস্তে আস্তে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগল তারা। আগের মতোই বেজে যাচ্ছে দুটি অ্যাকর্ডিয়ন। নিঝুম হয়ে গেছে সারা গাঁ, শুধু বড়ো বাড়ি দুটির কাছে লোকের ভিড়। শিশির পড়তে শুরু করেছে। কোন একটা মোরগ ডেকে উঠল, ক্যাঁচক্যাঁচ করে উঠল কাদের একটা ফটক। আগ্নেয়ুশ্কা কী বলছিল সেটা ল্যুবার কানে যাচ্ছিল না, তার ইচ্ছে হচ্ছিল কেঁদে ওঠে, গেয়ে ওঠে, নয়ত টিলাটা থেকে শাদা কুয়াসার ওপর দিয়ে উড়ে যায়।

গাইছে, বিলাপ করছে, হেসে উঠছে জাবলোতিয়ে দলের প্রাণোচ্ছল অ্যাকর্ডিয়ন, চিৎকার করছে বিনিদ্র ছেলেগুলো, সমবেত সঙ্গীতে একের পর এক জন্ম আর মৃত্যু হচ্ছে ছড়ার।

ইস কী সুন্দর গ্রাম এই লিপিনো। আর কোথায় এই রহস্যময় জাবলোতিয়ে গ্রামটা? হয়ত এখান থেকে কিলোমিটার আটেক হবে, হয়ত আরো দূরে, কখনো ল্যুবা যায় নি সেখানে।

মাঝ রাত অনেকক্ষণ পেরিয়ে যাবার পর আসর একটু নিবল, পাতলা হয়ে এল ভিড়, একটা অ্যাকর্ডিয়ন থেমে গেল, আফ্রিখা আগ্নেয়ুশ্কার কাছে এসে বাড়ি ফেরার প্রস্তাব দিলে। কার সঙ্গে আফ্রিখা সিগারেট খাচ্ছিল সে কথা জিজ্ঞেস করার কী ভীষণ যে ইচ্ছে হয়েছিল ল্যুবার সে কথা সে দুনিয়ার কাউকে বলবে না।

আর আগ্নেয়ুশ্কা যেন ইচ্ছে করেই সারা রাস্তাটা কেবল বলে গেল জাবলোতিয়ে দলটার কথাই।

৩

সূর্যোদয় থেকে সূর্যোদয়ে ল্যুবার গ্রীষ্ম গড়িয়ে গেল হেমন্তে। রঙ চটে এলিয়ে পড়ল বুনো বৈঁচি, শেষ হল ঘাস কাটা, ফসল তোলা, জানলার কাছে লাল হয়ে উঠল রোয়ান গাছ, কিন্তু লিপিনো গাঁয়ের সেই রাতটার মতো জগত তখনো ভরে রইল এক গভীর মধুর ব্যাকুলতায়।

কেবলি জাবলোতিয়ে গাঁয়ের সেই কালো-ভুরু ধূসর-চোখ ছেলেটির কথা ভাবত ল্যুবা। দিনের ভেতর বহুবার করে সে তাকাত লিপিনো গাঁয়ের দিকে। লিপিনো যাবার পথটা যেখানে বনের মধ্যে হারিয়ে গেছে সেখানে ছিল দুটি খড়ের গাদা আর একটা ফার গাছের প্রকান্ড, ছুঁচলো, কালচে চুড়ো। তবে এ দুটো জিনিসের দিকে তাকাবার আগে ল্যুবা চোখ বুলিয়ে নিত খোঁচা খোঁচা অরণ্যবৃত্তের অন্য জায়গাগুলোয়। ভারি একঘেয়ে সেটা, বহুদূর তা একই ভাবে চলে গেছে একটানা, তারপর ঘুরে ঘুরে চোখ যখন আবার এসে পড়ত ওই খড়ের গাদায়, তখন ফের ল্যুবার বুক মুচড়ে উঠত এক করুণ মন-কেমন-করায়।

শীগগিরই বৃষ্টি শুরু হল, খড়ের গাদার কালচে-সবুজ রঙ বদলে গেল হলুদ ধূসরে, কিন্তু ফার গাছটা তার ময়ূর-রঙা সবুজ চুড়োয় হয়ে উঠল আরো সুস্পষ্ট।

আলাপের মধ্যে তার সামনে যখন লিপিনো বা জাবলোতিয়ে গাঁয়ের কথা উঠত, তখন ভারি আকুল হয়ে উঠত ল্যুবা, কিন্তু বুক তার সবচেয়ে বেশি ঢিপঢিপ করত সেই সন্ধ্যায় পরা তার নিজের পোষাকটা দেখলে। কালো স্কার্ট আর ক্রেপ-দে-শিন ব্লাউজটা থাকত দেরাজের মধ্যে। অকারণেই তা বার করে এনে ইস্ত্রি করত ল্যুবা।

ও পোষাক পরে সে যাবে কোথায়।

লিপিনো গ্রামে ফুর্তির আসর আর বসে নি, আর জাবলোতিয়ে গাঁয়ে তো মেয়ে দূরের কথা ছোকরারাও যেত না। নিজেদের গাঁয়ের আসরগুলো লুব্যার এমনিতেও খুব ভালো লাগত না, এখন তা হয়ে উঠল একেবারে নীরস।

তবে আগ্রেয়ুশ্‌কা কিন্তু নাচতে ছুটত প্রতি শনিবারেই: আফ্রিখার ডাক পড়েছে সৈন্য-তালিমিতে যাবার জন্যে। দু'জনেই ওরা লিপিনোর আসরটার কথা বহুদিন ভুলে গেছে। তাহলেও দেখা হলে বোকাসোকা আফ্রিখাকেও লুব্যার মনে হত মিষ্টি, লক্ষ্মী, বুকে ওর জেগে উঠত সেই করুণ আকুলতা, বিশেষ করে যখন সিগারেট খেত সে। ওরা একটা কাঠি জ্বালিয়েই সিগারেট খেয়েছিল সেদিন। নিশ্চয়ই চেনা জানা আছে দু'জনের মধ্যে।

একদিন লুব্যা ভোরে জেগে উঠল এক সুখ-স্বপ্নের সানন্দ উষ্ণতায়। ফের সেই মস্তো উৎসবের স্বপ্ন দেখেছে সে, আকুল করা এক দুর্বোধ্য বাজনা বেজেছে, হাতছানি দিয়েছে তাকে, আর প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে দিয়ে লুব্যা এগিয়ে গেছে সেই ধূসর জাবলোতিয়ে চোখ দুটির দিকে, এগিয়ে **গেছে কোনো রকম লজ্জা না করে,** দেখেছে সে, জানে সে, এ **সেই। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল** তার, পরের মুহূর্তেই **নীরবে কাঁদতে লাগল সে। এটা ঘটে** লিপিনো আসরের তিন মাস পরে, বৃষ্টির ফলে নদী তখন বসন্ত কালের মতো জলময়, অতটা অধীরতার সঙ্গে না হলেও বসন্তকালের মতোই সঙ্গমের জন্যে ডাকাডাকি করছিল মেঠো পাখিগুলো, চিমনি থেকে ধোঁয়া লুটিয়ে যাচ্ছিল শিশির আর সবজীভুঁইগুলোর ওপর দিয়ে।

এ সময় ন্যাড়া ন্যাড়া গাছগুলোর মধ্যে শিস দেয় উড-গ্রাউজ, বাতাসের নিদ্রালু নিঃশ্বাস আড়ষ্ট হয়ে যায় ফার গাছের থাবায়, সমস্ত দিগন্ত জুড়ে ধুধু করে একটা শাদাটে আবছায়া, শুরু হয় হৈমন্তী মাটির রাজকীয় বিশ্রাম।

* * *

লুবা আর আগ্নেয়ুশ্‌কাকে গতকাল সন্ধ্যাতেই আলু খুঁড়ে তোলার জন্যে পাঠিয়েছিল ব্রিগেডিয়ার। তাদের রবার বুট আর বেলচেয় কাদা লেগে আছে, স্যাঁৎসেঁতে ঠাণ্ডায় অসাড় হয়ে উঠেছে আঙুল। আগ্নেয়ুশ্‌কার মাথায় বাঁধা রুমাল থেকে বেণী বেরিয়ে পড়েছে, সজোরে মাটিতে বেলচা চালিয়ে পাক দিয়ে সে আলু গাছগুলো তুলছিল। আলুগুলো ছোটো ছোটো, গায়ে মরচে রঙা দাগ। কুড়িয়ে সেগুলো ঝুড়িতে ফেলছিল লুবা, ঘন ঘন সোজা করে নিচ্ছিল কুঁজো পিঠ। দুপুরের খাওয়া নাগাদ তিন বস্তা আলু উঠল কোনোক্রমে। জিরিয়ে নেবার জন্যে আগ্নেয়ুশ্‌কা বসল একটা বস্তার ওপর।

'ফের আফ্রিখার দেখা নেই অনেকক্ষণ।'

সখীর দিকে চাইলে লুবা:

'আফ্রিখার জন্যে তোর এত ইয়ে কেন?'

'এমনি, ওর যে আলু নিয়ে যাবার কথা...'

'ওই দ্যাখ আসছে। নাম করতেই হাজির। ফের গিয়েছিল কোথায় যেন?'

মাড়াই চালার ওপাশ থেকে সত্যিই রেনকোট খসখস করে এগিয়ে এল আফ্রিখা, বসলে আগ্নেয়ুশ্‌কার পাশে।

'সব গোছগাছ হয়ে গেল,' বললে সে ফুর্তির সুরে, 'সৈন্য তালিমি! বিশ তারিখে রওনা দেব।'

আগ্নেয়ুশ্‌কার প্রথমটা বিশ্বাস হল না, বললে, 'ইয়ার্কি

করো না।' তারপর আফ্রিখার দিকে কেমন একটা অন্য দৃষ্টিতে চেয়ে চুপ করে রইল।

'সত্যি আফ্রিখা?'

'কী দায় পড়েছে তোমাদের মিছে কথা বলার? জাবলোতিয়ের কস্তিয়ার সঙ্গে আমায় ডেকে পাঠিয়েছিল গ্রাম সোভিয়েতে।'

কেন জানি গাল আরক্ত হয়ে উঠল ল্যুবার, বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল।

'জাবলোতিয়ে?' আস্তে করে জিজ্ঞেস করলে সে, 'কে ও?'

'আরে মনে নেই, সেই যে বিশেষ লম্বা নয়, লিপিনোয় আমরা একসঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমরা সমবয়সী, একসঙ্গেই রওনা দেব। বিদায় বাসরের দিন ও আসবে আমার কাছে।'

'ল্যুবা, কী হল তোর, ল্যুবা?' ল্যুবার পেছু পেছু ছুটল আগ্নেয়ুশ্‌কা।

...কিছুই দেখছিল না ল্যুবা, কিছুই তার কানে গেল না, সোজাসুজি সে চলে এল গ্রামে। বাড়িতে আয়নার কাছে পিনে গাঁথা ক্যালেণ্ডারটায় চোখ পড়তে আরো বিচলিত হয়ে উঠল সে: এর মধ্যেই আজ সতের।

* * *

ল্যুবার কাছে এই তিন দিন মিশে গেল এক হয়ে, ভারি ছোট্ট তা, ভারি সুখের, শঙ্কাভরা, আনন্দময়। আগ্নেয়ুশ্‌কো আসত রোজ। ল্যুবার পোষাকগুলো দেখত সে, আর আগেই গোটা ব্যাপারটা ধরতে পেরে রাজ্যের খবর দিত তাকে: আফ্রিখার মা বিয়ার চোলাই করেছে, ধোয়া-পাকলা করেছে মেঝে, আফ্রিখা নিজেই বিশ তারিখের জন্যে ভেড়া জবাই করেছে, বিদায় বাসরে কস্তিয়ার সঙ্গে আসবে লিপিনোর আরো দুটি ছেলে।

উনিশ তারিখে প্রায় সারা রাত চোখ বুজল না ল্যুবা।

সকালে ক্র্যানবেরি তোলার জন্যে মা চলে গেল জলায়, সারা দিন সে রইল একা। তারপর এল আগ্নেয়ুশ্‌কা। মুহূর্তের মধ্যেই সে কাঠকুট কেটে জ্বালিয়ে তুলল ইস্ত্রিটা।

'জানিস ল্যুবা, আমার নীল ফিতেটা যে কোথায় হারাল, না খেয়ে না দেয়ে সারাদিন খুঁজলাম, কোথাও পেলাম না।'

'আরে ও নীল ফিতেটা তো এখানে।'

আনন্দে লাফিয়ে উঠল আগ্নেয়ুশ্‌কা, টুক করে সে চুমু খেলে ল্যুবার গালে। বড়ো বড়ো চোখের পাতা নামিয়ে ধীরে ধীরে বিনুনী বাঁধছিল ল্যুবা। আগ্নেয়ুশ্‌কা এসে তার শাদা শাদা বাহু দিয়ে ল্যুবার কাঁধ জড়িয়ে ধরে একেবারে কানে কানে ফিস ফিস করলে:

'জানিস ল্যুবুশ্‌কা, আফ্রিখা বলছে টেবিলে আমি যেন তার পাশে বসি। আমি বলেছি ল্যুবা যদি অন্য পাশটায় বসে, তাহলে বসব, নইলে আমার সাহস হবে না বাপু। আত্মীয়স্বজন সবাই দেখবে যে। কী বলিস বয়েই গেল, দেখুক গে। আরে দ্যাখ দ্যাখ, কে যেন আসছে।' জানলার দিকে ছুটে গেল আগ্নেয়ুশ্‌কা, 'আফ্রিখাদের বাড়ি যাচ্ছে! ল্যুবা, ওই দ্যাখ।'

ল্যুবা কিন্তু ঠিক সেই সময়েই হঠাৎ মুখ ঢাকলে হাত দিয়ে, উঠে দাঁড়াল পোশাকের আলমারিটার কাছে, ঘুরে গেল সম্মোহিতের মতো। আগ্নেয়ুশ্‌কার আগেই ও দেখেছিল তাকে। গ্রীষ্মের উষ্ণ হাওয়ার মতো অনাস্বাদিত এক বিপুল সুখে তার শেষ রক্ত বিন্দু পর্যন্ত রিনরিন করে উঠল।

* * *

আফ্রিখাদের বাড়ির একাংশ শীতকালের উপযোগী, আরেকটা গ্রীষ্মকালের। গ্রীষ্মকালের ঘরটায় জুটেছে যত ছেলে ছোকরা, শীতকালেরটায় টেবিল জুড়ে বসেছে আত্মীয়স্বজন আর রিক্রুটেরা, আফ্রিখার সঙ্গেই যারা সৈন্য

তালিমিতে যাচ্ছে। গ্লাসে গ্লাসে মদ ঢালা হয়ে গেছে, তাহলেও বসেই রইল সবাই, আফ্রিখা ছুটল আগ্নেয়ুশ্‌কা আর ল্যুবাকে আনতে। পরনে তার নতুন স্যুট, মাথা ছাঁটা, একেবারেই যেন অন্য লোক। ল্যুবাদের বাড়িতে ছুটে ঢুকল সে:

'এত দেরি হচ্ছে কেন তোমাদের? তোমরা ছাড়া সবাই এসে গেছে। ল্যুবা, কিছু ডিশ আর চামচে দাও, আমাদের কুলচ্ছে না।'

তোয়ালেয় ডিশ চামচে জড়িয়ে নিল আগ্নেয়ুশ্‌কা, তারপর তিন জনেই বেরুল ঘর থেকে। অলিন্দের পৈঠা দিয়ে ওঠবার সময় অতিথিদের কথাবার্তা কানে এল ল্যুবার, কানে এল অ্যাকর্ডিয়নের বাজনা, সেটা বাজছিল গ্রীষ্মকালের ঘরটায়।

আফ্রিখার পেছু পেছু ঘরে ঢুকল ওরা।

'এই তো, এই তো! সুন্দরীরা আমাদের। মান্যি করে বলছি, বসো, বসো!' টেবিলের ওপাশ থেকে সানন্দে কলরব করে উঠল আফ্রিখার বাবা।

আগেই খানিকটা টেনেছিল সে; সঙ্গে সঙ্গেই সবাই নড়ে চড়ে উঠল, ল্যুবাও গিয়ে বসল আচ্ছন্নের মতো। আর সবাই যখন গেলাসে গেলাসে ঠোকাঠুকি করে মুখর আলাপ শুরু করলে, তখন একটি বার সে তাকালে কস্তিয়ার দিকে, কস্তিয়াও ঠিক সেই সময়েই চোখ মেলে ছিল তার দিকেই, হাসছিল। লাল হয়ে উঠল ল্যুবা, রঙীন সুরার পানপাত্রটি নামিয়ে রেখে সে যেন গলে যেতে লাগল তার অগাধ সুখ, পুলক, আকুলতায়।

লাল ফৌজের পথ যে টানা,
জওয়ান ভায়েরা,
পথ সে জবর,
তোমরা খানিক ফুর্তি লোটো
মেয়েরা মায়েরা
চল্লিশ বছর।

গ্রীষ্মকালের ঘরটার মাঝখানে দাঁড়িয়ে গান গাইলে আফ্রিখা, কিন্তু ফের অ্যাকর্ডিয়ন ফোলালে বাজনদার, ফের পায়ে তালি মেরে হিল ঠুকে ঘুরলে আফ্রিখা, তারপর থেমে পা দিয়ে তাল দিতে দিতে ধরলে:

রাগ করো না গেরস্ত,
নাচের দাপে সমস্ত
কাঁপেই যদি ছাদ-মেঝে,
শেষ নাচটা আজকে যে।

বাপ, আগ্নেয়ুশ্‌কা, লিপিনোর ছোকরাগুলো সকলের সঙ্গেই নাচলে আফ্রিখা। শুধু আসরে নামল না কস্তিয়া। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল সে, ছাঁটা মাথার লজ্জায় টুপিটাও খোলে নি।

লোক হয়েছিল অনেক। অ্যাকর্ডিয়ন আর চুটকি গানের ভেতর দিয়ে শোনা যাচ্ছিল হাসাহাসি, কথাবার্তা, সব কিছু একাকার হয়ে যাচ্ছিল এক উৎসবের গমগমে, তার মধ্যেই কে যেন শুরু করে দিলে চুমু চুমু খেলা।

টালি বাঁধানো চুল্লিটার ওপাশে কম্বল ঝুলিয়ে একটা ছোট্ট কোণ গড়া হল। সেই অন্ধকারে রইল কিছু বেঞ্চি আর টুল। ল্যুবা দেখল আফ্রিখা আর আগ্নেয়ুশ্‌কাও চুমু চুমু খেলা শুরু করেছে সবচেয়ে অন্ধকার আর নিভৃত একটা জায়গায়; লোক দেখানোর জন্যে কিছু ফিসফিস করছিল তারা। খানিক পরেই আলোয় বেরিয়ে এল আফ্রিখা, কস্তিয়ার কাছে গিয়ে কী যেন বললে তার কানে কানে। কস্তিয়া চলে গেল আঁধার জায়গাটায়। ল্যুবা জানত, এইবার আগ্নেয়ুশ্‌কা আসবে। যেতে বলবে ওখানে, ওর কাছে, অপরূপের শুরু হবে এবার, যার জন্যে ল্যুবা দিন গুণেছে, স্বপ্ন দেখেছে।

মিনিট পাঁচেক পরে এল আগ্নেয়ুশ্‌কা। সখীর দিকে আদরের দৃষ্টিতে চেয়ে সে চোখ দিয়ে দেখাল যেখানে কস্তিয়া অপেক্ষা করছে। যেন স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে হেঁটে গেল ল্যুবা, বসলে চেয়ারে। অসঙ্কোচে, সোহাগভরে তার তপ্ত হাত চেপে ধরল কস্তিয়া।

আলোর জায়গাটায় কোথায় যেন ফের নাচ শুরু করেছিল আফ্রিখা:

মাঠের মধ্যে ঢেঙা-ঢেঙী,
গাছের কলি ভাঙাভাঙি,
পুঁতলে কলি, দিলে জল,
রইল পড়ে কন্যাদল।

৪

তুষারপাত হল সকালে। তার শুভ্রতা ঠিক ল্যুবার প্রেমের মতোই অমলিন: আফ্রিখাদের বাড়ির চালে, ঢেকে যাওয়া শাদা রাস্তায়, যেখানেই তাকাও একটু ময়লা, একটি দাগও চোখে পড়বে না কোথাও।

আর হঠাৎ সেই বরফের ওপর ফুটল চাকার দুটো গভীর দাগ, ফুটল কালো হয়ে। আফ্রিখাদের বাড়ি থেকে তা চলে গেছে নদী ঘাটা পর্যন্ত, সেখান থেকে মাঠে, তারপর হারিয়ে গেছে চারিপাশের নিঝুম ঠাণ্ডায়, হারিয়ে গেল দীর্ঘ তিনটি বছরের মতো।

শুধু তিন বছরই যেন হয়!

অলিন্দে দাঁড়িয়ে ল্যুবা আর আগ্নেয়ুশ্‌কা তাকিয়ে ছিল মাঠের দিকে। ঘেঁষাঘেঁষি করে তারা ভাবছিল শুধু একই কথা।

কতদিন চলে যায়, সৈন্য তালিমির পালা শেষ করে ঘরে আর ফেরে না ছেলেরা।

'চল যাই ল্যুবুশ্কা...'

ল্যুবার শাদা হয়ে ওঠা মুখখানা আগ্নেয়ুশ্কা মুছে দিলে রুমাল দিয়ে, কপাল থেকে সরিয়ে দিলে বেণীর খানিকটা অলকচূর্ণ, নিজের চোখের জলের দিকে খেয়াল ছিল না তার।

অলকচূর্ণে হীরের টুকরোর মতো জ্বলজ্বল করছিল গলন্ত তুষারকণা।



ফাজিল ইসকান্দের। ১৯২৯ সালে জন্ম আবখাজিয়ায়। গোর্কি সাহিত্য ইনস্টিটিউট শেষ করেন। গদ্যে পদ্যে সব্যসাচী, কবিতা ও গল্প-সংকলন আছে অনেক। সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ, পরিহাসপ্রিয়তা, ঘটনার অপ্রত্যাশিত বাঁক ইত্যাদির ফলে পাঠকদের কাছে তিনি খুব জনপ্রিয়।

হারকিউলিসের ত্রয়োদশ কীর্তি

স্কুল এবং স্কুলের পরেও যত গণিতবিদকে আমি দেখেছি, তাঁরা সবাই বেশ অগোছালো, নরম ধাত, যদিও যথেষ্ট প্রতিভাবান। তাই পিথাগোরাসের প্যাণ্ট চারিদিকেই চৌখশ বলে যে কথাটা চলে সেটা পুরোপুরি সঠিক কিনা সন্দেহ।

হয়ত পিথাগোরাসের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা তাই ছিল, কিন্তু তাঁর অনুগামীরা নিশ্চয় সেটা একেবারে ভুলে গেছে, নিজেদের বাহ্যিক চেহারায় তারা বিশেষ একটা নজর দেয় না।

তাহলেও আমাদের স্কুলে যিনি অঙ্ক শেখাতেন, তিনি ছিলেন সবার চেয়ে বেশ তফাৎ। তাঁর মেজাজ নরম একথা একেবারেই বলা যেত না, বেশভূষার শিথিলতা তো দূরের কথা। জানি না তাঁর প্রতিভা ছিল কিনা, এখন সেটা স্থির করা খুবই দুঃসাধ্য। তবে আমার ধারণা, নিশ্চয় ছিল।

নাম তাঁর খার্‌লাম্পি দিওগেনোভিচ্‌। পিথাগোরাসের মতোই তিনি ছিলেন গ্রীক। আমাদের ক্লাসে তিনি আসেন নতুন স্কুল-বর্ষ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে। তার আগে আমরা এঁর কথা কিছুই শুনি নি, জানতামই না যে এরকম গণিতবিদ সম্ভব।

সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আমাদের ক্লাসকে এমন চুপচাপ করিয়ে দিলেন, যেটা আদর্শস্থানীয়। সেটা এমনি ছমছমে যে মাঝে মাঝে স্কুলের হেডমাস্টার ভয়ে ভয়ে দুয়োর খুলে দেখতেন আমরা আছি কিনা, স্টেডিয়মে পালিয়ে যাই নি তো।

স্টেডিয়মটা ছিল স্কুলের কাছেই, এবং অবিরাম, বিশেষ করে বড়ো বড়ো প্রতিযোগিতাগুলোর সময় তা বিদ্যাদানের ব্যাপারে বেশ বাধা ঘটাত। হেডমাস্টার এমনকি উপরিওয়ালা কারো কাছে লিখেওছিলেন যেন স্টেডিয়মটা অন্য কোনো জায়গায় সরিয়ে নেওয়া হয়। বলতেন, স্টেডিয়মটা ছাত্রদের অস্বস্তি ঘটাচ্ছে। আসলে স্টেডিয়ম নয়, আমাদের অস্বস্তি ঘটাত স্টেডিয়মের জমাদার ভাসিলি খুড়ো, বইপত্তর সঙ্গে না নিলেও ঠিক সে চিনতে পারত আমাদের, বছরের পর বছর কাটলেও রাগ তার কমত না।

সৌভাগ্যক্রমে আমাদের হেডমাস্টারের আর্জিতে কেউ কান দিলে না, স্টেডিয়ম স্বস্থানেই বহাল রইল, শুধু কাঠের বেড়ার বদলে উঠল ইঁটের দেয়াল। তাই আগে যারা শুধু বেড়ার ফাঁক দিয়ে খেলা দেখত, তাদেরও এবার দেয়াল ডিঙতে হল।

তাহলেও, খামোকাই হেডমাস্টার ভাবতেন যে আমরা অঙ্কের ক্লাস ফাঁকি দিয়ে পালাব। এটা কেউ ভাবতেই পারত না। সেটা হত দুই ঘণ্টার ফাঁকে হেডমাস্টারের পেছনে গিয়ে চুপচাপ তাঁর টুপিটা খুলে নেওয়ার মতো অকল্পনীয়, যদিও টুপিটা দেখে দেখে আমাদের অরুচি ধরে গিয়েছিল। শীত গ্রীষ্মে বরাবর তিনি ওই টুপিটাই পরতেন, যেন ম্যাগ্নোলিয়ার মতো ওটা চিরহরিৎ। আর সর্বদাই কিসের যেন ভয় পেতেন তিনি।

বাইরে থেকে মনে হতে পারত যে তিনি সব চেয়ে বেশি ভয় পান শিক্ষা বিভাগের কমিশনকে, আসলে কিন্তু তিনি ভয়

করতেন আমাদের সহকারী অধ্যক্ষকে। ইনি এক দানবীয়া মহিলা। একদিন তাঁকে নিয়ে আমি বাইরনী ঢঙে কোনো কবিতা লিখব নিশ্চয়, তবে আপাতত আমি বলতে চাই অন্য কথা।

বলাই বাহুল্য, অঙ্কের ক্লাস থেকে আমরা কোনোক্রমেই পালাতে পারতাম না। আদৌ যদি কখনো ফাঁকি দিতাম তবে সাধারণত সেটা গানের ক্লাস।

খারলাম্পি দিওগেনোভিচ ক্লাসে এলেই সবাই চুপ হয়ে যেত, সেটা চলত ঘণ্টা না পড়া পর্যন্ত। মাঝে মাঝে অবশ্য তিনি হাসাতে চাইতেন আমাদের, তবে সে হাসি স্বতঃস্ফূর্ত নয়, খোদ মাস্টারের বানানো ওপর থেকে হাসি। তাতে শৃঙ্খলার হানি না হয়ে বরং শৃঙ্খলাই প্রমাণিত হত, যেভাবে উল্টো দিক থেকে প্রমাণিত হয় জ্যামিতি।

ব্যাপারটা হত এই রকম। ধরা যাক, কোনো একজন ছাত্রের দেরি হয়েছে ক্লাসে আসতে, মানে ঘণ্টা পড়ার পর আধ সেকেণ্ড, খারলাম্পি দিওগেনোভিচ কিন্তু তার মধ্যেই ক্লাসে ঢুকছেন। বেচারী ছাত্রটির এখন ধরণী দ্বিধা হও অবস্থা। মানে ধরণী দ্বিধা হতেই সে রাজী থাকত যদি আমাদের মাস্টারদের কমনরুমটা না থাকত ঠিক আমাদের ক্লাসেরই নিচের তলায়।

অন্য কোনো মাস্টার হলে এরকম তুচ্ছ জিনিসে নজরই দিত না, কেউ হয়ত বা কড়া ধমক দিত, কিন্তু খারলাম্পি দিওগেনোভিচের তা স্বভাবই নয়। এ রকম ক্ষেত্রে তিনি দরজায় দাঁড়িয়ে রেজিস্টার খাতাটা এ-হাত ও-হাত করে ছাত্রটির প্রতি সম্ভ্রমে গদগদ হয়ে দরজার দিকে ইঙ্গিত করতেন।

ছাত্রটি ইতস্তত করত, তার হতবুদ্ধি মুখ থেকে বোঝা যেত যে মাস্টারের পেছন পেছন কোনোক্রমে অলক্ষ্যে ঢুকে পড়াই

তার বাসনা। খারলাম্পি দিওগেনোভিচের মুখে কিন্তু ফুটত একটা সানন্দ আতিথেয়তা, ভদ্রতা, সেই মুহূর্তের অসাধারণত্বের চেতনায় যা খানিকটা সংযত। তিনি ভাব করতেন যেন ছাত্রটির আগমন আমাদের গোটা ক্লাস এবং ব্যক্তিগতভাবে তাঁর নিজের কাছে একটা বিরল উৎসবস্বরূপ, কেউ ভাবেই নি যে সে আসতে পারে, এবং তা সত্ত্বেও যখন এল তখন কার এমন সাহস হবে যে কিছুটা দেরি হওয়ার জন্যে তাকে ভর্ৎসনা করবে: বিশেষ করে তিনি, একজন সামান্য শিক্ষক, সেটা তো কল্পনাই করতে পারেন না, অবশ্যই তিনি ক্লাসে ঢুকবেন এমন অসামান্য ছাত্রটির পরে, এবং নিজ হাতে দরজাটি বন্ধ করে জানিয়ে দেবেন যে সমাদৃত অতিথিটিকে যখন পাওয়া গেছে তখন চট করে ছাড়ছি না।

ব্যাপারটা চলে কয়েক সেকেণ্ড, শেষ পর্যন্ত ছাত্রটি অপ্রস্তুতের মতো দরজায় সেঁধোয়, হোঁচট খেতে খেতে যায় নিজের সিটের কাছে।

খারলাম্পি দিওগেনোভিচ তার পিঠের দিকে চেয়ে থাকবেন এবং যুৎসই কোনো মন্তব্য করবেন। যেমন হয়ত বলবেন:

'প্রিন্স অব ওয়েলস!'

হো হো করে হেসে ওঠে ক্লাস। প্রিন্স অব ওয়েলস লোকটি কে তা আমরা না জানলেও এটা বুঝতাম যে আমাদের ক্লাসে তিনি কখনো আসতে পারেন না। এখানে তাঁর করার কিছু নেই, কেননা প্রিন্সদের প্রধান কাজই হল হরিণ শিকার করে বেড়ানো। আর হরিণে যদি তাঁর অরুচি ধরে থাকে এবং কোনো একটা স্কুলে যাবার ইচ্ছে হয়, তাহলে নিশ্চয় তাঁকে নিয়ে যাওয়া হত বিদ্যুত স্টেশনের কাছে এক-নম্বর স্কুলে, কেননা এটি হল আদর্শ বিদ্যালয়। আর একান্ত যদি আমাদের স্কুলেই তিনি আসতে চাইতেন, তাহলে অনেক আগেই তা

আমাদের জানিয়ে দেওয়া হত এবং তৈরি করে তোলা হত তাঁর আগমনের জন্যে।

সেই জন্যেই আমরা হাসতাম, জানতাম যে আমাদের ছাত্রটির মোটেই প্রিন্স হওয়া সম্ভব নয়, ওয়েলসের প্রিন্স তো দূরের কথা।

কিন্তু ততক্ষণে চেয়ারে বসতেন খারলাম্পি দিওগেনোভিচ। মুহূর্তের মধ্যে চুপ করে যেত ক্লাস। শুরু হত পড়া।

মাথাটা তাঁর প্রকাণ্ড, দেখতে বেঁটেখাটো, পরিপাটী পোষাক, নিখুঁত করে দাড়ি কামানো, শান্ত কর্তৃত্বে তিনি গোটা ক্লাসটাকে মুঠোয় ধরে রাখতেন। রেজিস্টার বই ছাড়াও তাঁর ছিল একটি নোট খাতা — প্রশ্নাদির পর তাতে তিনি কী সব লিখে রাখতেন। কাউকে তিনি কখনো যে ধমকেছেন, বা পড়ার জন্যে উপদেশ দিয়েছেন বা মা-বাপকে স্কুলে ডেকে পাঠানোর ভয় দেখিয়েছেন, তা আমার মনে পড়ে না। এসব জিনিসে তাঁর কোনো দরকার ছিল না।

পরীক্ষার সময় অন্যেরা যা করতেন সেভাবে ছাত্রদের মাঝখান দিয়ে আসা যাওয়া তিনি করতেন না, উঁকি দিতেন না তাদের ডেস্কে, যে কোনো খসখস শব্দেই সতর্কের মতো মাথা ফেরাতেন না। উনি শুধু শান্তভাবে কিছু একটা পড়তেন, কিংবা একটা মালা নিয়ে বেড়ালের চোখের মতো হলদে হলদে গুটিগুলো নাড়াচাড়া করতেন।

তাঁর কাছে নকল করে লাভ হত না, কেননা টোকা উত্তর তিনি দেখেই চিনতে পারতেন, ঠাট্টা করতেন। তাই টুকতাম আমরা কেবল একেবারে নিরুপায় হলে।

মাঝে মাঝে তাঁর মালা বা বই রেখে তিনি বলতেন:

'সাখারভ, ও জায়গাটা ছেড়ে আভদেয়েঙ্কোর কাছে গিয়ে বসো।'

সাখারভ উঠে দাঁড়িয়ে খারলাম্পি দিওগেনোভিচের দিকে চাইত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে। ছেলে সে পয়লা নম্বর, বুঝত না কেন তাকে গিয়ে বসতে হবে আভদেয়েঙ্কোর কাছে, পড়াশুনায় যে ভালো নয়।

'আভদেয়েঙ্কোকে একটু কৃপা করো, ওর ঘাড়টা ভেঙে যেতে পারে।'

বোকার মতো আভদেয়েঙ্কো চাইত খারলাম্পি দিওগেনোভিচের দিকে, যেন বুঝতে পারছে না, অথবা সত্যিই হয়ত বুঝতে পারছে না কেন সে ঘাড় ভেঙে বসবে।

'আভদেয়েঙ্কো ভাবছে সে বুঝি রাজহাঁস,' একটু বুঝিয়ে বলেন খারলাম্পি দিওগেনোভিচ, 'কালো রাজহাঁস,' যোগ করেন এক মিনিট পরে, ইঙ্গিতটা আভদেয়েঙ্কোর রোদপোড়া গোমড়া মুখের প্রতি, 'সাখারভ, নিজের কাজ করে যাও।'

বসে পড়ে সাখারভ।

'তুমিও,' আভদেয়েঙ্কোর দিকে ফেরেন তিনি কিন্তু গলার স্বরে অলক্ষ্য কী একটা বদল ঘটে গেছে, কাঁটায় কাঁটায় প্রয়োজনীয় ডোজের উপহাস মিশেছে তার সঙ্গে, 'ঘাড় যদি না ভাঙে... কালো রাজহাঁস!' দৃঢ় সিদ্ধান্ত টানেন তিনি, যেন এই পুরুষালী আশা প্রকাশ করছেন যে নিজে নিজেই উত্তর লিখতে পারার শক্তি খুঁজে পাবে আভদেয়েঙ্কো।

খাতার ওপর রাগতভাবে ঝুঁকে পড়ে শুরিক আভদেয়েঙ্কো, অঙ্ক কষার জন্যে কী পরিমাণ মেধা ও ইচ্ছা শক্তি সে প্রয়োগ করছে তা দেখাতে চায়।

খারলাম্পি দিওগেনোভিচের প্রধান অস্ত্র ছিল লোককে হাস্যাস্পদ করা। যে ছাত্র স্কুলের কোনো একটা নিয়ম ভেঙেছে সে আলসে নয়, অপদার্থ নয়, গুণ্ডা নয়, নিতান্ত হাস্যাস্পদ একটি লোক। সঠিকভাবে বললে ঠিক হাস্যাস্পদ নয়—তা

হতে অনেকেরই আপত্তি থাকত না, আসলে হাস্যাস্পদ অভিমানী, যে বোঝে না যে সে হাস্যাস্পদ অথবা বোঝে সেটা সবার পরে।

আর মাস্টার যখন কাউকে হাস্যাস্পদ করে তোলেন, তখন সঙ্গে সঙ্গেই ছাত্রদের দলগত জোট ভেঙে পড়ে, হেসে ওঠে গোটা ক্লাস। সবাই হাসে একজনকে লক্ষ করে। যদি একজন হাসত, তাহলে যে করে হোক সেটা সামলানো যেত। কিন্তু গোটা ক্লাসকে হেসে উড়িয়ে দেওয়া তো সম্ভব নয়। আর হাস্যাস্পদ বলে যদি কেউ ধরা পড়ে, তখন ইচ্ছে হয় যে-করেই হোক দেখাই যে হাস্যাস্পদ হলেও অমন চূড়ান্ত রকমের হাস্যকর নই।

প্রশ্রয় খারলাম্পি দিওগেনোভিচ কাউকে দিতেন না। হাস্যাস্পদ হয়ে ওঠা সম্ভব ছিল সবার পক্ষেই। বলাই বাহুল্য আমিও সে ভাগ্য এড়াতে পারি নি।

সেদিন বাড়ির জন্যে যে অংক দেওয়া হয়েছিল সেটা আমি কষি নি। অংকটা ছিল কোন একটা গোলা কী একটা গতিতে কতক্ষণ ধরে কোন দিকে যেন যাচ্ছে তাই নিয়ে। অন্য গতিতে প্রায় অন্য একটা দিকে গেলে কত কিলোমিটার তা পাড়ি দিত সেইটে বার করতে হবে।

মোটের ওপর অংকটা ছিল ভারি গোলমেলে আর বিদ্ঘুটে। কিছুতেই উত্তর মেলাতে পারছিলাম না। প্রসঙ্গত বলে রাখি, তখনকার দিনের পাঠ্যপুস্তকগুলোর উত্তরমালায় সব সময় সঠিক উত্তর থাকত না, নিশ্চয় অন্তর্ঘাতকদের কাজ। অবিশ্যি বেঠিক উত্তর মিলত খুবই কালেভদ্রে, কেননা ততদিনে প্রায় সব অন্তর্ঘাতকই ধরা পড়ে গিয়েছিল। তবে বোঝাই যাচ্ছে দু'-একজন তখনো রয়ে গেছে।

তাহলেও কিছুটা সন্দেহ আমার ছিল। অন্তর্ঘাতকেরা

অন্তর্ঘাতক হোক, কিন্তু সেই যে বলে, নিজে যেন ভুল না করি।

তাই পরের দিন স্কুলে এলাম ঘণ্টা বাজার এক ঘণ্টা আগে। আমরা পড়তাম দ্বিতীয় শিফ্‌টে। সবচেয়ে ফুটবল-পাগলেরাও ততক্ষণে এসে জমেছে। একজনের কাছে অঙ্কের কথাটা জিজ্ঞেস করলাম, দেখা গেল সেও কষতে পারে নি। বিবেক আমার একেবারে শান্ত হয়ে গেল। দুটো টিমে ভাগ হয়ে আমরা ফুটবল খেললাম ঘণ্টা না পড়া পর্যন্ত।

ক্লাসে ঢুকলাম। হাঁপাতে হাঁপাতে ক্লাসের পয়লা নম্বর সাখারভকে জিজ্ঞেস করলাম:

'কি, অংকটা কষেছিস?'

'হ্যাঁ কষেছি,' বললে সে।

বলার সময় অল্প একটুখানি ঘাড় নাড়লে অর্থবোধকভাবে, বুঝিয়ে দিলে জিনিসটা কঠিন ছিল বটে, তবে কষা গেছে।

'কষলি মানে? উত্তর তো ভুল।'

'না, উত্তর ঠিকই আছে,' বলে তার বুদ্ধিমান সাধু-সাধু মুখের ওপর এমন বিশ্রী একটা নিশ্চয়তা নিয়ে সে আমার দিকে মাথা নাড়লে যে, সেই মুহূর্তে আমি তার সৌভাগ্যের জন্যে তাকে হিংসে করতে লাগলাম। তা সত্ত্বেও কিছু সন্দেহ প্রকাশ করার ইচ্ছে আমার ছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ও মুখ ফিরিয়ে নিলে, ফলে পড়ন্ত মানুষের বাতাস খামচে ধরার শেষ সম্ভাবনাও সে কেড়ে নিলে আমার কাছ থেকে।

পরে বোঝা গেল ঠিক সেই সময় দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন খারলাম্পি দিওগেনোভিচ, কিন্তু আমি তাঁকে দেখি নি, অঙ্গভঙ্গি করেই যাচ্ছিলাম, যদিও তিনি দাঁড়িয়েছিলেন প্রায় আমার পাশেই। শেষ পর্যন্ত টনক নড়ল ব্যাপারটা কী, সভয়ে বই বন্ধ করে আড়ষ্ট হয়ে গেলাম।

খারলাম্পি দিওগেনোভিচ চেয়ারে বসলেন।

ভয় পেয়েছিলাম আমি, নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছিলাম এই জন্যে যে প্রথমে ফুটবল-খেলোয়াড়ের সঙ্গে একমত হলাম যে অংকটা ঠিক নয়, তারপর পয়লা নম্বরের সঙ্গে একমত হতে পারলাম না যে অংকটা ঠিক। ফলে এখন খারলাম্পি দিওগেনোভিচ আমার ছটফটানি দেখে নিশ্চয় আমাকেই প্রথম ডাকবেন।

আমার পাশে বসেছিল শান্তশিষ্ট একটি ছেলে, নাম তার আডল্‌ফ্‌ কমারভ। এখন সে নিজেকে বলে আলিক, এমন কি খাতাতেও লেখে আলিক, কেননা যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, সে চাইত না যে কেউ তাকে আডল্‌ফ্‌ হিটলার বলে ক্ষেপায়। তাহলেও সবাই তার আগেকার নামটা জানত, দরকার পড়লে তাকেও সেটা জানিয়ে দিতে ছাড়ত না।

আমি কথা কইতে ভালোবাসতাম, আর ও থাকত চুপচাপ। আমাদের একসঙ্গে বসানো হত এই জন্যে যাতে আমাদের প্রভাব পড়ে পরস্পরের ওপর, কিন্তু আমার ধারণা, ফল তাতে কিছুই হয় নি। দু'জনেই যা ছিলাম তাই রয়ে গেলাম।

এখন দেখলাম যে সেও অংকটা কষেছে। খাতা খুলে সে বসে ছিল — ছিমছাম, রোগা, চুপচাপ; ব্লটিং পেপারের ওপর হাত রেখে বসে থাকায় তাকে দেখাচ্ছিল আরো চুপচাপ। এ তার এক বদ অভ্যাস, ব্লটিং পেপারের ওপর হাত রেখে বসে থাকা, কিছুতেই তার এ অভ্যাসটা আমি ছাড়াতে পারি নি।

'হিটলার খতম,' ফিসফিসিয়ে বললাম তাকে। বলাই বাহুল্য সে কোনো জবাব দিলে না, তবে হাতটা অন্তত ব্লটিং পেপার থেকে সরিয়ে নিলে, তবু যা হোক খানিকটা স্বস্তি পাওয়া গেল।

খারলাম্পি দিওগেনোভিচ ইতিমধ্যে ক্লাসকে অভিনন্দন

জানিয়ে চেয়ারে বসেছেন। কোটের হাতাটা সামান্য টানলেন তিনি, ধীরে ধীরে মুখ আর নাক মুছলেন রুমালে, তারপর কেন জানি চেয়ে দেখলেন রুমালটায়, পকেটে পুরলেন সেটা। তারপর কবজি থেকে ঘড়ি খুলে রেখে রেজিস্টারের পাতা ওলটাতে লাগলেন। ফাঁসি দেবার সময় জল্লাদেও বোধ হয় এতটা সময় নেয় না।

অনুপস্থিতদের নামে দাগ দিয়ে তিনি ক্লাসের দিকে তাকিয়ে খুঁজতে লাগলেন কাকে বলি দেবেন। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল আমার।

'আজ ক্লাসের ভার কার?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন তিনি। নিঃশ্বাস ফেললাম আমি। দম নিতে পারার জন্যে মনে মনে ধন্যবাদ জানালাম তাঁকে।

দেখা গেল সে ছেলেটা আসে নি, ফলে মনিটরকে দিয়েই বোর্ড মোছালেন খারলাম্পি দিওগেনোভিচ। যখন সে মুছছিল তখন খারলাম্পি দিওগেনোভিচ তাকে বোঝাতে লাগলেন, যে দিন যার ভার সে না এলে মনিটরের কী করা উচিত। আমার আশা হল এই উপলক্ষে তিনি স্কুলের কোনো ঘটনা বা ঈশপের কোনো কাহিনী, খোদ গ্রীক পুরাকথার কোনো গল্প বলবেন। কিন্তু কিছুই তিনি বললেন না, কেননা বোর্ডের ওপর শুকনো ন্যাতা ঘষার ক্যাঁশ ক্যাঁশ শব্দটা খুবই বিছছিরি লাগছিল, তাই অপেক্ষা করতে লাগলেন মনিটরের বাধ্যতামূলক কাজটা কখন শেষ হয়। শেষ পর্যন্ত বসলে মনিটর।

নিথর হয়ে গেল ক্লাস। কিন্তু এই সময় দরজা খুলে গেল, দেখা দিলেন ডাক্তার আর নার্স।

'মাপ করবেন, এটা কি পাঁচ-ক?' জিজ্ঞেস করলেন ডাক্তার।

'না,' অমায়িক বিরূপতায় বললেন খারলাম্পি

দিওগেনোভিচ, কী সব নিরাময় ব্যবস্থার জন্যে তাঁর ক্লাসটা নষ্ট হবে এটা তাঁর পছন্দ হচ্ছিল না। আমাদের ক্লাসটাকে যদিও প্রায় পাঁচ-ক-ই বলা যায়, কেননা এটা হল পাঁচ-খ, তাহলেও তিনি এমন দৃঢ়ভাবে 'না' বললেন যেন আমাদের মধ্যে কোনো মিলই নেই।

আরেকবার 'মাপ করবেন' বলে কেন জানি খানিকটা দ্বিধাভরে দরজা বন্ধ করলেন ডাক্তার।

আমি জানতাম যে এখন টাইফাস ইনজেকশন দেওয়া হচ্ছে। কতকগুলো ক্লাসে দেওয়া হয়ে গেছে। ইনজেকশনের কথা আগে জানানো হয় না, যাতে কেউ পালাতে না পারে, অসুখের ছুতো করে বাড়ি বসে না থাকে।

ইনজেকশনে আমার ভয় নেই, কেননা ম্যালেরিয়ার ইনজেকশন আমি নিয়েছি গাদা গাদা, সেটাই সবচেয়ে বিছছিরি ইনজেকশন।

আর হঠাৎ কিনা তুষার-ধবল স্মক পরা অপ্রত্যাশিত আশাটা আমাদের ক্লাসটাকে আলোকিত করেই অদৃশ্য হচ্ছে। এ আমি হতে দিতে পারি না।

''ক' ক্লাসটা কোথায় আমি দেখিয়ে দিয়ে আসব?' বললাম ভয়ের তাড়ায় বেহায়া হয়ে।

এ স্পর্ধা কিছুটা সঙ্গত বোধ হওয়ার দুটি যুক্তি ছিল। আমি বসতাম দরজার কাছেই এবং প্রায়ই খড়ি বা অন্য কিছুর জন্যে আমাকেই পাঠানো হত শিক্ষকদের ঘরে। তাছাড়া পাঁচ-ক ক্লাসটা ছিল স্কুল আঙিনার অন্য একটা দালানে, মেয়ে ডাক্তারটির পক্ষে সত্যিই চিনে যাওয়া কঠিন হতে পারত, কেননা আমাদের স্কুলে তিনি আসেন খুবই কম, কায়েমীভাবে কাজ করেন এক-নম্বর স্কুলে।

'যাও,' বলে সামান্য ভুরু তুললেন খারলাম্পি দিওগেনোভিচ।

যথা সম্ভব আত্মসংযত করে আনন্দ চেপে আমি ছুটে বেরলাম ক্লাস থেকে।

আমাদের তলার করিডরেই মেয়ে ডাক্তার আর নার্সের নাগাল পেয়ে চললাম তাদের সঙ্গে সঙ্গে। বললাম:

'পাঁচ-ক ক্লাসটা আপনাদের দেখিয়ে দেব চলুন।'

ডাক্তার এমনভাবে হাসলেন যেন ইনজেকশন দিচ্ছেন না, লজেন্স বিলি করছেন।

'আমাদের ইনজেকশন দেবেন না?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'তোমাদের দেব পরের ঘণ্টায়,' তেমনি হেসেই জবাব দিলেন ডাক্তার।

'পরের ঘণ্টায় আমরা যে মিউজিয়মে যাব,' বলে ফেললাম খানিকটা নিজের কাছেই অপ্রত্যাশিতভাবে।

একথা ঠিক যে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে আঞ্চলিক মিউজিয়মে গিয়ে আদিম মানুষের স্মৃতিচিহ্নগুলো দেখার একটা কথা চলছিল ক্লাসে। কিন্তু ইতিহাসের শিক্ষিকা সেটা কেবলি পিছিয়ে দিচ্ছিলেন কেননা হেডমাস্টারের ভয় হচ্ছিল যে আমরা সেখানে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে যেতে পারব না।

মানে গত বছর আমাদের স্কুলের একটা ছেলে সেখান থেকে কোন এক আবখাজ সামন্তের ছোরা চুরি করে। ইচ্ছে ছিল ফ্রন্টে পালিয়ে যাবে। তা নিয়ে ভয়ানক হৈচৈ শুরু হয় এবং হেডমাস্টারের ধারণা হয় যে ব্যাপারটা ঘটেছে শুধু এই জন্যে যে ক্লাসটা দু'জন করে সারি বেঁধে না গিয়ে গিয়েছিল ভিড় করে।

আসলে ছেলেটা আগে থেকেই মতলব করে রেখেছিল। ছোরাটা সে তক্ষুণি নেয় নি, প্রথমে সেটা সে গুঁজে রাখে মিউজিয়মে দেখানো প্রাকবিপ্লব গরিব চাষীর কুঁড়ের চালায়,

তারপর মাস কয়েক পরে যখন সব শান্ত হয়ে যায়, তখন সে মিউজিয়মে আসে ওভারকোটের আস্তর ছেঁড়া করে এবং শেষ পর্যন্ত ছোরাটি হাতায়।

'কিন্তু আমরা তোমাদের যেতে দেব না,' ডাক্তার বললেন রহস্য করে।

'কী বলছেন আপনি,' বললাম উদ্বিগ্ন হয়ে, 'আঙিনায় আমরা দল বাঁধব, মিউজিয়মে যাব শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে।'

'শৃঙ্খলাবদ্ধ?'

'হ্যাঁ, শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে,' বললাম গুরুত্ব দিয়ে, ভয় ছিল যে হেডমাস্টারের মতো উনিও হয়ত আমাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে মিউজিয়মে যেতে পারার ক্ষমতায় বিশ্বাস করবেন না।

'তা, কী বলো গালোচ্‌কা, পাঁচ-খ ক্লাসেই যাওয়া যাক, সত্যিই যদি মিউজিয়মে চলে যায়,' বলে থামলেন উনি। ধবধবে স্মক আর টুপি পরা এই সব ফিটফাট মেয়ে ডাক্তারদের আমার বরাবরই ভারি ভালো লাগে।

'কিন্তু আমাদের যে বলা হয়েছে পাঁচ-ক প্রথমে,' জিদ ধরলে ওই গালোচ্‌কা। কড়া চোখে চাইলে আমার দিকে। বোঝাই যায় যে মেয়েটি প্রাণপণে দেখাতে চাইছে যে সেও সাবালিকা।

আমি তার দিকে ফিরেও চাইলাম না, দেখিয়ে দিলাম যে কেউ তাকে সাবালিকা বলে ভাববেও না।

'তাতে কী এসে যায়,' বলে ডাক্তার ফিরতি পথ ধরলেন।

'খোকার তাহলে বীরত্ব দেখাবার তর সইছে না, তাই না?'

'আমি ম্যালেরিয়া-রোগী,' বললাম নিজের স্বার্থটা চাপা দেবার জন্যে, 'হাজার বার ইনজেকশন নিয়েছি।'

'তাহলে ম্যালেরিয়া-রোগী, চলো যাওয়া যাক।'

যখন বুঝলাম যে উনি আর মত ঘোরাবেন না, তখন ছুটে গেলাম আগে ভাগে, যাতে ওঁদের আসার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক না থাকে।

ক্লাসে যখন ঢুকলাম তখন বোর্ডের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল শুরিক আভদেয়েঙ্কো, তিন ধাপে অংকটা তার সুন্দর হস্তাক্ষরে বোর্ডে কষা থাকলেও সে জিনিসটা বোঝাতে পারছিল না। রাগ-রাগ গোমড়া মুখে সে দাঁড়িয়ে আছে বোর্ডের সামনে, ভাবটা এমন যেন আগে সবই জানত কিন্তু এখন যুক্তিগুলো ঠিক মনে পড়ছে না।

ভাবলাম, 'ভাবনা নেই শুরিক, তুই জানিস না এখনো, তোকে আমি বাঁচিয়ে দিয়েছি।' ইচ্ছে হচ্ছিল উদার এবং সদাশয় হয়ে উঠি।

'সাবাস আলিক,' বললাম কমারভকে, 'এমন কঠিন অংক তুই কষে দিলি।'

আলিককে ধরা হত চলনসই বুদ্ধিমান। বকুনি খেত সে কম, প্রশংসা পেত আরো কম। ফলে কানের ডগা তার কৃতজ্ঞে লাল হয়ে উঠল। ফের সে ঝুঁকে পড়ল তার খাতার ওপর, নিখুঁতভাবে হাতটি রাখলে ঠিক ব্লটিং পেপারের ওপর। তবে ওটা যে ওর অভ্যেস।

হঠাৎ দরজা খুলে গেল, লেডি ডাক্তার ক্লাসে ঢুকলেন তাঁর গালোচ্‌কাটিকে নিয়ে। একথা সেকথা বলে জানালেন যে ছেলেদের ইনজেকশন দিতে হবে।

'ঠিক এখুনি দেওয়াই যদি অবশ্যপ্রয়োজনীয় হয়,' খারলাম্পি দিওগেনোভিচ বললেন আমার দিকে চেয়ে, 'তাহলে আমার আপত্তি করার কিছু নেই।' তারপর শুরিকের দিকে মাথা নেড়ে বললেন:

'আভদেয়েঙ্কো, সীটে গিয়ে বসো।'

খড়ি রেখে শুরিক চলে গেল তার সীটে, তখনো সে ভাব করছিল যেন অংকটা সে বুঝে সুঝেই কষেছিল।

চঞ্চল হয়ে উঠল ক্লাস, কিন্তু খারলাম্পি দিওগেনোভিচ ভুরু তুলতেই সবাই চুপ করে গেল। নোট খাতাটা তিনি পকেটে পুরে রেজিস্টার বন্ধ করে জায়গা ছেড়ে দিলেন ডাক্তারের জন্যে, নিজে বসলেন ছাত্রদের একটি ডেস্কে। কেমন বিষণ্ন আর একটু যেন আহত দেখাচ্ছিল তাঁকে।

ডাক্তার এবং সহকারী মেয়েটি ব্যাগ খুলে টেবিলের ওপর রাখতে লাগল বয়াম বোতল আর হিংস্রের মতো ঝকঝকে যন্ত্রগুলো।

'এবার কে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী?' বললে ডাক্তার।

হিংস্রের মতো সিরিঞ্জে সেরাম ভরে সুঁইটা ওপর দিকে করলেন।

কথাটা তিনি বলেছিলেন ফুর্তির সুরেই, কিন্তু কেউ হাসল না, সবাই চেয়ে রইল সুঁইটার দিকে।

'তালিকা ধরে ডাকা যাক,' বললেন খারলাম্পি দিওগেনোভিচ, 'কেননা সবাই এখানে বীরপুরুষ।'

রেজিস্টার খুললেন তিনি।

'আভদেয়েঙ্কো,' বলে মাথা তুললেন খারলাম্পি দিওগেনোভিচ।

বিহ্বলের মতো হেসে উঠল ক্লাস। ডাক্তারও হাসলেন যদিও বুঝতে পারলেন না কেন আমরা হাসছি।

টেবিলের কাছে গেল আভদেয়েঙ্কো—ঢ্যাঙা, বেঢপ, মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল কিছুতেই ও ঠিক করতে পারছে না কোনটা হওয়া ভালো, পড়ায় লাস্ট বয় নাকি ইনজেকশনে ফার্স্ট বয়।

হাতের আস্তিন গুটিয়ে সে ডাক্তারের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়াল, তখনো একই রকম বেঢপ, কোনটা ভালো সে বিষয়ে একই রকম অনিশ্চিত। তারপর, ইনজেকশন নেওয়া হয়ে গেলেও তার মুখে আনন্দ দেখা গেল না, যদিও গোটা ক্লাস তাকে হিংসে করছিল।

আলিক কমারভ ক্রমেই ফ্যাকাশে হয়ে উঠছিল। এবার তার পালা। ব্লটিং পেপারের ওপর তখনো সে হাত রেখে থাকলেও বোঝা গেল তাতে বিশেষ উপকার হচ্ছে না।

আমি তাকে একটু সাহস দেবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু লাভ হল না। প্রতি মুহূর্তেই তার মুখ হয়ে উঠতে লাগল ফ্যাকাশে আর কঠোর, একদৃষ্টে সে চেয়ে রইল সুঁইটার দিকে।

'মুখ ফিরিয়ে নে, দেখিস না,' বললাম আমি।

'না দেখে পারছি না,' বললে সে আর্ত ফিসফিসানিতে।

'প্রথমে তেমন লাগবে না। আসল ব্যথাটা হবে যখন সেরাম ঢোকাবে,' বলে ওকে তৈরি করে তুলতে লাগলাম আমি।

'আমি রোগা,' জবাবে ফিসফিস করলে সে, শাদা শাদা ঠোঁট দুটো প্রায় নড়লই না, 'লাগবে আমার খুব।'

'কিচ্ছু হবে না,' বললাম আমি, 'শুধু হাড়ে না লাগলেই হল।'

'শরীরে আমার কেবলি হাড়,' হতাশ হয়ে ফিসফিস করলে সে, 'নির্ঘাৎ সুঁই লাগবে হাড়ে।'

'তুই গা ঢিল করে দিবি,' বললাম ওর পিঠে চাপড় মেরে, 'তাহলে লাগবে না।'

উত্তেজনায় পিঠ ওর হয়ে উঠেছিল তক্তার মতো শক্ত।

'গা আমার এমনিতেই ঢিলে,' কিছুই না বুঝে জবাব দিলে সে, 'তাতে আবার রক্ত কম।'

'রোগাদের রক্তহীনতা হয় না,' প্রচণ্ড আপত্তি করলাম আমি, 'রক্তহীন হয় ম্যালেরিয়া রোগীরা, কেননা ম্যালেরিয়া রক্ত শুষে নেয়।'

আমার ছিল পুরনো ম্যালেরিয়া রোগ, কত ডাক্তারেই না চিকিৎসা করেছে, কিছুই পেরে ওঠে নি। দুরারোগ্য এই ম্যালেরিয়া নিয়ে খানিকটা গর্বই হত আমার।

আলিকের যখন ডাক পড়ল ততক্ষণে তার হয়ে এসেছে। কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, সেটাও বোধ হয় ওর খেয়াল ছিল না।

ডাক্তারের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়াল ও, মুখ একেবারে ফ্যাকাশে, চোখ কাচের মতো। আর যখন ইনজেকশন দিলে তখন হঠাৎ একেবারে মড়ার মতো শাদা হয়ে গেল সে, যদিও শেষ মাত্রায় ফ্যাকাশে হয়ে ছিল সে আগেই। এতই সে ফ্যাকাশে হয়ে গেল যে মুখে ওর ছুলি ফুটে উঠল, যেন ছিটকে এসে লেগে গেছে কোত্থেকে। আগে কেউ ভাবেই নি যে মুখে ওর ছুলি আছে। ওর যে চাপা ছুলি আছে সেটা মনে করে রাখব বলে ঠিক করলাম। কাজে লেগে যেতে পারে, যদিও ঠিক কী কাজে লাগবে সেটা আপাতত জানতাম না।

ইনজেকশনের পর সে প্রায় লুটিয়ে পড়ছিল আর কি, তবে ডাক্তার ওকে ধরে চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। চোখ ওর উলটে আসছিল, সবারই আমাদের ভয় হল বুঝি ও মারা যাচ্ছে।

'অ্যাম্বুলেন্স!' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি, 'ছুটে গিয়ে ফোন করব!'

খারলাম্পি দিওগেনোভিচ সরোষে চাইলেন আমার দিকে আর চট করে ডাক্তার একটা স্মেলিং সলট ধরলেন তার নাকের কাছে—মানে খারলাম্পি দিওগেনোভিচের নয়, আলিকের নাকে।

প্রথমটা ও চোখ খুললে না, তারপর হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দিব্যি এসে বসল নিজের জায়গায়, মনেই হবে না যে মাত্র কিছুক্ষণ আগে মরতে বসেছিল।

'টেরই পেলাম না,' ইনজেকশন নিয়ে বললাম আমি, যদিও টের পেয়েছিলাম যথেষ্টই।

'সাবাস ম্যালেরিয়া-রোগী,' বললেন ডাক্তার।

তাঁর সহকারিণী হেলা ফেলা করে পিঠ ডলে দিলে আমার। বোঝা গেল পাঁচ-ক ক্লাসে যেতে দিই নি বলে ও এখনো রেগে আছে আমার ওপর।

'আরেকটু ডলুন,' বললাম আমি, 'সেরামটা চারিয়ে দেওয়া দরকার।'

রেগে মেগেই পিঠ ডললে সে। বেশ লাগল স্পিরিট ভেজা তুলোর ঠান্ডা ছোঁয়া, আর আমার ওপর রেগে থাকলেও সে যে আমার পিঠ ডলতে বাধ্য হচ্ছে, এটা লাগল আরো ভালো।

শেষ পর্যন্ত সব শেষ হল। তাঁর গালোচ্‌কাটির সঙ্গে ডাক্তার জিনিসপত্র গুটিয়ে চলে গেলেন। ক্লাসে রয়ে গেল শুধু স্পিরিটের মিষ্টি আর সেরামের বিশ্রী গন্ধটা। সীটে এসে বসল ছাত্ররা, উশখুশ করতে লাগল, কাঁধের হাড় নেড়ে সন্তর্পণে পরখ করতে চাইল ইনজেকশনের জায়গাটা এবং কষ্ট সহ্য করার পুরস্কার স্বরূপ পরস্পর কথাবার্তা জুড়লে।

'জানলাটা খুলে দাও,' নিজের সীটে এসে বললেন খারলাম্পি দিওগেনোভিচ। উনি চাইছিলেন যে ক্লাস থেকে

গন্ধটার সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালী স্বাধীনতার আমেজটাও বেরিয়ে যাক।

মালাটা নিয়ে উনি চিন্তিতভাবে হলদে গুটিগুলো নাড়াচাড়া করলেন। ক্লাস শেষ হতে আর বিশেষ বাকি ছিল না। এ রকম অবস্থায় সাধারণত উনি গ্রীক পুরাকথার কোনো একটা শিক্ষামূলক ঘটনা শোনাতেন।

'গ্রীক পুরাকথায় আছে যে হারকিউলিস বারোটি কীর্তি সাধন করেন,' বলে থামলেন তিনি। টুক-টুক—দুটি গুটি উনি ডাইনে থেকে বাঁয়ে সরালেন। 'একজন তরুণের ইচ্ছে হল সে গ্রীক পুরাকথা সংশোধন করবে,' বলে ফের থামলেন। টুক-টুক।

'দ্যাখো দিকি, কী সাহস ওর।' ওই তরুণ লোকটি সম্পর্কে মনে মনে ভাবলাম আমি, কেননা গ্রীক পুরাকথা সংশোধন করার অধিকার কারো নেই। অন্য কোনো পুরাকথা হলে হয়ত শুধরে নেওয়া যেত, কিন্তু গ্রীক পুরাকথার বেলায় ওটি চলে না, কেননা বহু আগেই তা সব আগাগোড়া দেখে নেওয়া হয়েছে, কোনো ভুলই থাকতে পারে না।

'সে ঠিক করলে হারকিউলিসের ত্রয়োদশ কীর্তিটা সে সাধন করবে,' বললেন খারলাম্পি দিওগেনোভিচ, 'আর খানিকটা সে করতেও পেরেছিল।'

ওঁর গলার স্বর থেকে সঙ্গে সঙ্গেই আমরা টের পেলাম যে কীর্তিটা নিশ্চয় খুব খেলো আর বাজে, কেননা হারকিউলিসের যদি ত্রয়োদশ কীর্তি স্থাপনের প্রয়োজন হত, তাহলে নিজেই সেটা সে করত, সুতরাং বারোটি করেই যখন সে থেমেছে, তখন সেইটেই যথেষ্ট, সংশোধন নিয়ে আর কারো নাক গলাতে আসার মানেই হয় না।

'হারকিউলিসের কীর্তিগুলো ছিল বীরের কীর্তি। আর এ ছেলেটির কীর্তিটা হয়েছে কাপুরুষতা থেকে...' কী

একটা ভাবলেন খারলাম্পি দিওগেনোভিচ, তারপর যোগ করলেন, 'এক্ষুণি জানা যাবে, কেন সে এ কীর্তি করলে...'

টুক। এবার শুধু একটি গুটি গেল ডাইনে থেকে বাঁয়ে। আঙুল দিয়ে গুটিটা তিনি ঠেলেছিলেন বেশ জোরেই, আর গেল কেমন বিশ্রী ভাবেই। অমন একটা গুটির বদলে আগের মতো দুটো গুটি গেলেই বরং ভালো হত।

টের পেলাম বাতাসে যেন বিপদের গন্ধ। যেন গুটি ঠক করে উঠল না, একটা ফাঁদ বন্ধ হয়ে গেল খারলাম্পি দিওগেনোভিচের হাতে।

'...আমার মনে হয় আমি সেটা আন্দাজ করতে পেরেছি...' বলে তাকালেন আমার দিকে।

টের পেলাম সে দৃষ্টি দেখা মাত্রই বুকটা আমার ঢিপঢিপ করতে লাগল একেবারে পিঠের কাছে।

'তুমি এসো তো...' বলে ইঙ্গিতে তিনি ব্ল্যাকবোর্ডটা দেখালেন।

'আমি?' টের পেলাম গলার স্বর আমার উঠছে একেবারে পেট থেকে।

'হ্যাঁ, নির্ভীক ম্যালেরিয়া-রোগী, তুমিই,' বললেন উনি।

বোর্ডের কাছে অনিচ্ছায় গেলাম আমি।

'অংকটা কী করে কষলে বোঝাও তো,' শান্তভাবে বললেন উনি এবং টুক-টুক দুটি গুটি চলে গেল ডান থেকে বাঁয়ে। আমি এখন ওঁর মুঠোয়।

সারা ক্লাস আমার দিকে চেয়ে অপেক্ষা করছিল। অপেক্ষা করছিল কখন আমি গুবলেট করি এবং চাইছিল যেন গুবলেটটা করি যথাসম্ভব অনেকক্ষণ ধরে ওদেরকে মজা পেতে দিয়ে।

চোখের কোণ দিয়ে তাকালাম বোর্ডটায়, যা লেখা আছে

তা থেকে ধাপগুলোর কারণ অনুমানের চেষ্টা করলাম। কিন্তু কিছুতেই পেরে উঠলাম না। তখন রেগে মেগে মুছতে লাগলাম বোর্ডটা, যেন শুরিকের লেখাটায় আমার মাথা গুলিয়ে দিচ্ছে, মনঃসংযোগ করতে পারছি না। তখনো আমার আশা ছিল এই বুঝি ঘণ্টা পড়বে, নাকচ হয়ে যাবে মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু ঘণ্টা পড়ল না, বোর্ডই বা মোছা যায় আর কতক্ষণ। আগেই হাস্যাস্পদ হয়ে ওঠার চাইতে ন্যাকড়াটাই বরং রেখে দিলাম।

'আমরা শুনব বলে বসে আছি,' আমার দিকে না তাকিয়েই বললেন খারলাম্পি দিওগেনোভিচ।

'গোলাটা,' ক্লাসের উল্লসিত নীরবতার মধ্যে চাঙ্গা গলায় কথাটা বলেই চুপ করে গেলাম।

'তারপর,' অমায়িকভাবে কিছুটা অপেক্ষা করে বললেন খারলাম্পি দিওগেনোভিচ।

'গোলাটা,' গোঁ ধরে পুনরুক্তি করলাম আমি, ভেবেছিলাম এই সঠিক কথাটা সজোরে উচ্চারণ করতে পারলেই সমান সঠিক আরো কতকগুলো কথা জুগিয়ে যাবে আপনা থেকেই। কিন্তু কথাটা বলতেই কী একটা কঠিন বাঁধন যেন আমায় চেপে ধরল। ধাপগুলোর কারণ ধরার জন্যে প্রাণপণে মনঃসংযোগ করলাম, ঝটকা মেরে ছিঁড়তে চাইলাম ওই অদৃশ্য বাঁধনটা।

'গোলাটা,' আতঙ্কে আর বিতৃষ্ণায় ঠক ঠক করে কেঁপে পুনরুক্তি করলাম আবার।

চাপা হাসির শব্দ উঠল ক্লাসে। টের পেলাম যে সংকট মুহূর্ত সমাগত, ঠিক করলাম হাস্যাস্পদ হবার চেয়ে বরং হার মানাই ভালো।

'গোলাটা কি গিলে ফেললে,' সহৃদয় কৌতূহলে জিজ্ঞেস করলেন খারলাম্পি দিওগেনোভিচ।

এমন সহজে জিজ্ঞাসা করলেন যেন শুধাচ্ছেন আমি কুলের আঁটি গিলেছি কিনা।

'হ্যাঁ, গিলেছি,' চট করে বলে দিলাম আমি, ফাঁদটা টের পাচ্ছিলাম, তাই ঠিক করলাম অপ্রত্যাশিত জবাব দিয়ে ওঁর ফন্দি ভণ্ডুল করে দেব।

'তাহলে সামরিক শিক্ষককে খবর দিতে হয়, তোমার পেট থেকে গোলা বার করে নিক,' বললেন খারলাম্পি দিওগেনোভিচ। ক্লাস কিন্তু ততক্ষণে হাসতে শুরু করে দিয়েছে।

হাসছে সাখারভ, হাসির মধ্যেও চেষ্টা করছে যাতে তাকে পয়লা নম্বর ছাত্র বলেই দেখায়। হাসছে এমন কি শুরিক আভদেয়েঙ্কো, ক্লাসের সবচেয়ে মনমরা ছেলে, যাকে কিনা ব্ল্যাকবোর্ডে নির্ঘাৎ মৃত্যু থেকে বাঁচিয়েছি আমিই। হাসছে কমারভ, যাকে আজকাল আলিক বলে ডাকা হলেও আসলে তো সে আডল্‌ফ্‌ই।

ওর দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছিলাম, ক্লাসে আমাদের সত্যিকারের এক লালচুলো না থাকলে ওকেই অনায়াসে লালচুলো বলে ধরা যেত, কেননা চুল ওর লাল বলে চালানো যায়, মুখও ছুলি ভরা, যদিও তার নামের মতো সে ছুলি সে চেপে রাখে। কিন্তু ক্লাসে আমাদের সত্যিকারের এক লালচুলো থাকায় ওর সেই রংটা কেউ খেয়াল করে না। আরো ভাবছিলাম যে দিন কতক আগে আমাদের ক্লাসের দরজা থেকে ক্লাসের নম্বর লেখা ফলকটা যদি না খসাতাম, তাহলে লেডি ডাক্তার হয়ত আমাদের ঘরে ঢুকতেন না এবং কিছুই এসব ঘটত না। বাস্তবের সঙ্গে ঘটনার যে একটা সম্পর্ক আছে, সেটা ঝাপসা আন্দাজ করতে পারলাম আমি।

ক্লাসের সমবেত হাসাহাসির মধ্যে ঘণ্টা পড়ল, যেন মৃত্যু

ঘণ্টা। খারলাম্পি দিওগেনোভিচ রেজিস্টারে নম্বর দিলেন, নোট খাতাতেও কী যেন লিখে নিলেন।

সেই থেকে আমি হোমটাস্কের ওপর গুরুত্ব দিতে শুরু করি, না-কষা অংক নিয়ে কখনো ফুটবল খেলিয়ের পরামর্শ নিই নি। যার যেটা আসে আরকি।

পরে আমি লক্ষ্য করেছি প্রায় প্রত্যেকেই হাস্যাস্পদ হতে ভয় পায়। সবচেয়ে ভয় পায় নারী ও কবিরা। এত বেশি ভয় পায় বলেই মাঝে মাঝে হাস্যাস্পদ হয়ে দাঁড়ায়। অন্য দিকে আবার সুকবি বা সু-ললনারা লোককে যেমন হাস্যাস্পদ করে তুলতে পারে তেমন আর কেউই পারে না।

অবশ্যই হাস্যাস্পদ হবার ভয় বেশি রাখাটা খুব বুদ্ধির পরিচয় নয়, কিন্তু একেবারেই ভয় না থাকাটা আরো খারাপ।

আমার ধারণা, রোম ধ্বংস পায় এই জন্যে যে সম্রাটেরা তাদের নির্বোধ দাম্ভিকতায় লক্ষ করতে ভুলে যায় যে তারা হাস্যকর। সময় থাকতে কিছু বিদূষক জোগাড় করতে পারলে (ভাঁড়ের মুখ থেকে হলেও সত্য কথা শোনা উচিত) হয়ত তারা আরো কিছু দিন টিকত। তার বদলে এই ভরসা করে রইল যে কিছু একটা ঘটলে রোমকে বাঁচাবে হাঁসেরা। কিন্তু ঝাঁপিয়ে এল বর্বরেরা, সম্রাট আর তাদের হাঁস সমেত ধ্বংস করলে প্রাচীন রোম।

আমার অবশ্য তার জন্যে মোটেই দুঃখ নেই, তবে আমি চাই সকৃতজ্ঞচিত্তে খারলাম্পি দিওগেনোভিচের পদ্ধতি উঁচু করে তুলতে। তিনি আমাদের ধূর্ত শিশুপ্রাণগুলিকে পোক্ত করে তুলেছিলেন হাসি দিয়ে, নিজেদের সম্পর্কেই উচিত মতো রসবোধ রাখতে শিখিয়েছিলেন। আমার মতে এটি খুবই সুস্থ একটা জিনিস, এটাকে তুচ্ছ করার যে-কোনো প্রচেষ্টারই আমি দৃঢ় বিরোধী।



মাইয়া গানিনা। মস্কোর মেয়ে। যন্ত্র নির্মাণ টেকনিক্যাল কলেজ শেষ করেন, কারখানায় কাজের সঙ্গে সঙ্গে গোর্কি সাহিত্য ইনস্টিটিউটে পড়া চালিয়ে যান। প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয় ১৯৫৪ সালে। লিখেছেন 'সরযের কাহিনী' উপন্যাস, 'আম্না' নাটক এবং বহু গল্প-সংকলন। ঘুরেছেন অনেক, বিশেষ করে সাইবেরিয়া ও দূর প্রাচ্যে। লেখেন জটিল পেশার মানুষদের নিয়ে, জীবন যাদের সহজ সরল নয়, স্বকীয়তা ও উজ্জ্বলতা আছে চরিত্রে। উদ্‌ঘাটন করতে চান আধুনিক মানুষের মানসিক জটিলতা।

নির্বাণের পথ

১

রাস্তাটা এখান থেকে চলে গেছে পিয়াঁজের দিকে। থেমে দম নিলে সে, তারপর পোষাক-ভরা ন্যাপ-স্যাকটা নামিয়ে বসল তার পাশে। নিজের অলক্ষ্যেই অভ্যাসবশে ঘন ঘন কেশে সে চাইল সেইদিকটায়, যেদিকে আফগানিস্তান। প্রাচ্যে সে এই প্রথম, যদিও সারা জীবন এখানে আসার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে থেকেছে; দেখতে চেয়েছে ছেলেবেলা থেকে সে যা কল্পনা করেছে সবই ঠিক সেই রকম কি না। তারপর এসে গেল হঠাৎ, যখন কোথাও যাবার কথাই ওঠে না, আর দেখল সবই সেই রকমই। আর এই যে এগারো দিন ধরে সে হাঁটছে, তাতে দৃশ্যপট তার পরিচিত হয়ে উঠলেও মাঝে মাঝে সে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখত শাদা সূর্য, হলদে পথ, ডালিম

গাছের চকচকে সবুজ পাতার মধ্যে লাল লাল কলি, পথ চলতি বুড়োর শুকনো বাদামী পা।

সেও বুড়ো, বায়াত্তর চলছে তার, কিন্তু দেহটা তার এখনো জোয়ান, কোঁকড়া শাদা চুলে ভরা বুকখানা দিব্যি পেশল, গুটিয়ে তোলা সুতী ট্রাউজারের নিচে টেনিস খেলোয়াড়ের মোটা ডিমওয়ালা শক্ত শক্ত পা। স্বভাবতই এর মধ্যেই রোদ-পোড়া হয়ে উঠেছে সে, কেননা দিনের বেলা সে হাঁটত প্রায় খালি গায়ে। তাতে রঙ হয়ে উঠেছে ইউরোপীয় ধরনের লালচে, এখানকার মতো শুকনোটে নয়।

চাখানায় আর নালাগুলোর কাছে যে সব বুড়োরা বসে আছে তাদের চেয়ে চেয়ে দেখলে সে, মাথায় তাদের রঙীন ময়লা পাগড়ি, যাদুঘরের ছবির মতো সূক্ষ্ম মুখরেখা। আত্মতৃপ্তিমেশা একটা বিস্ময় বোধ করল সে এই দেখে যে অসম্ভব বুড়ো ওরা, যদিও বয়সে নিশ্চয় তার চেয়ে ছোটো, মুখভরা তাদের অজস্র বলিরেখা, যেন রোদ্দুরে তাদের দেহ দুধ ফোটার মতো ফুটে তারপর ঠাণ্ডা হওয়ায় সর পড়েছে।

প্রথম পাঁচ দিন পথ চলতি ট্রাকের ড্রাইভাররা তার উদ্দেশে চেঁচাত, 'উঠে পড়ো দাদু!' তারপর ট্রাকগুলো ফিরতে লাগল ওপর থেকে। ড্রাইভাররা তাকে চিনতে পেরে চেঁচাত, 'এখনো হাঁটছ? হাঁটো, হাঁটো! বিরক্তি ধরে গেলে বলো।'

বিরক্তি তার ধরল না প্রথমত এই জন্য যে, দেহ তার তখনো বলবান, রোদ্দুরে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে সে ভালোবাসত। দ্বিতীয়ত এই যে দীর্ঘ পথটার শেষ সে এখনো দেখতে পাচ্ছে না, এ পথটা তার কাছে একটা ব্রতের মতো, তার মৃত পুত্রের উদ্দেশে একটা তর্পণ। সাত বছর তার ছেলে এখানে একেবারে ওপরকার এক চুড়োয় ফ্রণ্টিয়ার পোস্টের কম্যাণ্ডার হিশেবে কাজ করেছে। মারা গেছে সম্প্রতি। যে জীপে করে

সে যাচ্ছিল সেটা স্কিড করে পড়ে যায় পিয়াঁজ নদীতে। আরোহীদের কাউকেই পাওয়া যায় নি, না তার ছেলে, না ড্রাইভার, না সহকারী কম্যান্ডারের স্ত্রী, কাউকে না। শুধু দুর্ঘটনার এক সপ্তাহ পরে, ভাঁটিতে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে আফগানিস্তানের তীরে এসে ঠেকে গাড়ির ফ্রেমটা।

ছেলের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে বৃদ্ধ চলে আসে দোশাম্বেতে, তারপর পামিরের পাহাড়তলি থেকে হাঁটতে শুরু করে পায়ে হেঁটে, স্থির করে ছেলে যে ঘাঁটিতে কাজ করত সেখানে পৌঁছবে এবং সেখানেই কিছু দিন থাকবে। হয়ত অবিশ্বাস্য, অচিন্তনীয় পথটার কষ্ট দিয়ে, ক্রমাগত হেঁটে হেঁটে সে তার শোক চাপতে চাইছিল, হয়ত বার্ধক্যের ফলে একটু মতিচ্ছন্নতা ঘটেছে, কী করতে নেমেছে তার সঠিক ধারণা তার ছিল না। কিংবা হয়ত সত্যিই কোনো সুষ্ঠু যুক্তি ছিল তার।

২

খুবানি গাছের ছায়ায় সরে গেল সে, মোড়ক খুলে একটা চাপাটি আর ভাঁজ করা প্ল্যাস্টিক কাপ বার করলে। খিদে পেয়েছিল বলে নয়, মাত্র ঘণ্টা খানেক আগেই সে চাখানায় প্রাতরাশ সেরেছে, চাপাটি আর গত বছরের মধু দিয়ে সবুজ চা খেয়েছে, ভেড়ার মাংসের সুরুয়াও বাদ দেয় নি, কেননা লোকে বলেছিল পরের চাখানায় পৌঁছতে বেলা হবে অনেক। তাই খিদে তার পায় নি। স্রেফ তার হঠাৎ ভালো লেগে গেল এই বিন্দু বিন্দু আগুনের হলদে খুবানি ছাওয়া সুন্দর গাছটির তলায় বসতে, কোন এক অসম্ভব উঁচু থেকে শক্ত শাদা ফোয়ারায় পড়ন্ত এই ঝোরাটার জল খানিক খেতে।

তাড়াহুড়ো ছিল না তার। সাগ্রহেই সে এখানকার জীবনের ছন্দটা মেনে নিয়েছে, যেন বরাবর এরই অপেক্ষায় ছিল সে। সামনে সময় আছে অঢেল, তার মৃত্যু পর্যন্ত, আর কাজ আছে শুধু একটি: গিয়ে পৌঁছনো। নিজের অজ্ঞাতেই সে তৃপ্তিভরে সে কাজটাকে দীর্ঘায়িত করে তুলছিল।

সবুজ ছায়ায় বসল সে, খসে পড়া খুবানিগুলোকে সরিয়ে দিলে হাত দিয়ে, কনকনে ঠাণ্ডা নরম জলে মুখ ধুলে অনেকক্ষণ, তারপর জল খেয়ে টাটকা সুস্বাদু চাপাটি চিবুতে লাগল, মাটি থেকে খুবানি কুড়িয়ে মুছে নিয়ে তাও মুখে পুরলে। আর তাকিয়ে দেখতে লাগল অদূরেই, নিচুতে পাগলার মতো ধেয়ে যাচ্ছে নোংরা পিয়াঁজ। জল তার কালো, মাঝে মাঝে ফেনার মতো, ঠিক যেন সাবান জলে মেজে পরিষ্কার করার ধোয়ানি। পিয়াঁজের পাথুরে তট ছেয়ে গেছে পাহাড়ী ঝাউগাছে, তাদের গোলাপ-রঙা স্বচ্ছ মঞ্জরী, ছোটো ছোটো স্বচ্ছ সবুজ পাতাগুলো যেন নির্ভার, হলদে-রঙা হালকা বাতাসে অলক্ষ্যগোচর, যেন মিশে যাচ্ছে, গলে যাচ্ছে তাতে। তাছাড়া চারিদিকেই খোঁচা খোঁচা হয়ে আছে লেবু-রঙা হলিহকের ডাঁটা, লাল লাল উচ্ছল ফুল আর ছোটো ছোটো গুটি সমেত ডালিম গাছের ঝাড়।

বসে বসে চারিদিকটা সে চেয়ে দেখছিল ধীরে—সবই একই সঙ্গে কেমন বাস্তব আর অবাস্তব, স্বপ্ন আর জাগরণ, দেহটা তার এখানে, কিন্তু উত্তাপ, উচ্চতা আর অক্সিজেন স্বল্পতায় ধোঁয়াচ্ছন্ন চেতনা তার এখানে ছিল শুধু আধখানা; হয়ত তাই একথা ভেবে অবাক হবার শক্তি তার ছিল না সত্যিই কেন সে এখানে, কেন হাঁটছে। নোংরা জলস্রোত হয়ত এই মুহূর্তে তার সামনে দিয়েই তার ছেলের দেহ

ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, একথা কল্পনা করে শোক বোধ করার শক্তিও তার ছিল না।

ঝোরাটার দিকে সে তাকাল, হঠাৎ ঝোরাটার ওপাশে একেবারে কাছেই এক বয়স্ক তাজিককে দেখতে পেলে সে। কে জানে কোথা থেকে ঠিক এক প্রেতাত্মার মতো আবির্ভূত হয়েছে ও, বসে আছে, মাথায় পাকানো-পাকানো এক সবুজ পাগড়ি, তার একটা প্রান্ত লোটাচ্ছে ঘাড়ের ওপর, গায়ে বালাপোষের ধূসর আলখাল্লা, পরনে শাদা চুড়িদার পায়জামা। তাজিক লোকটি ডান হাতে বুক ছুঁয়ে সরু সরু ঠোঁট টেনে হেসে একটু নুয়ে কী যেন বললে।

'নাও হয়েছে, ভাগো তো। দেখছ একটা লোক বসে আছে, অমনি ঠিক তার কাছে গিয়েই আড্ডা জমাতে হবে। এ কী অসভ্য রীতি।'

আগন্তুক লোকটি যেন তার রূঢ়তা ধরতে পারল না, নিশ্চল হয়ে সামনে তাকিয়ে চুপচাপ বসেই রইল।

৩

কী ও ভাবছে তোমার সম্পর্কে, কী চলছে ওর মিটমিটে বাদামী চোখের পেছনে কে বলবে। ঘেন্না করছে তোমায়, অবাক হচ্ছে, নাকি স্রেফ তোমাকে তার মন থেকেই সরিয়ে দিয়েছে, ওর কাছে তোমার অস্তিত্বই নেই? ইউরোপের মানুষ শোপেনহাউয়ার বলতেন, বিস্ময় জন্ম দিয়েছে দার্শনিকের কিন্তু প্রাচ্যের দর্শন কিছুতেই বিস্মিত হয় না, বিস্ময় বোধ করা তার কাছে অশোভন। নিশ্চল হয়ে বসে আছে বাদামী রঙের শুকনো মানুষটা, নিজেকে জড়িয়েছে রঙচঙে সব ন্যাতায়, বসে আছে যেন এক পবিত্র বোধিদ্রুম, প্রশান্তির

দুর্ভেদ্য অন্তরালে তোমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন। আর তুমি, সত্তরাধিক বছরেও যা মসৃণ হল না এমন যত সব তীক্ষ্ণ কোনা-কানাচ নিয়ে কতই না তুমি ভঙ্গুর।

তরোয়াল হাতে ঘোড়ার পিঠে তাজিকটির ছবি কল্পনা করল সে, জ্বলন্ত উন্মাদ, শাদা শাদা চোখ—সবাই এরা নিশ্চয় প্রাক্তন বাসমাচ দস্যু, সবাই ঘোড়ায় চেপে যায়, যেন ঘোড়ার পিঠেই জন্ম—আর মনে পড়ে গেল বহু-বিগত, পঁয়তাল্লিশ বছর আগেকার এক আতঙ্ক, সে আতঙ্ক দিয়ে আর কখনো তার স্মৃতিকে বিচলিত হতে দেয় নি সে, কেননা সেটা ছিল খুবই অপমানকর। অমানিধারা উন্মাদ, শাদা-চোখ লোকের এক জনতার মুখে সে পড়েছিল। তখন মুক্তির স্বাদ পেয়ে গেছে সে জনতা, জেনে গেছে 'সব কিছুই করা চলবে'। জনতা তাকে জাপটে ধরে, তারপর দলা মোচড়া করে ছুড়ে দেয়, পুরোপুরি খুন করে ফেলার চাড় দেখায় নি, কেননা আশেপাশে সামনে তাদের বধ্য ছিল আরো অনেক। সেই সময় মিনিট পাঁচেকের জন্যে এক সত্যিকারের আতঙ্ক টের পেয়েছিল সে, এ আতঙ্ক সে গেঁথে নেয় নিজের মধ্যে, কখনো তা আর মনে করতে চায় নি। তাহলেও এই আতঙ্কই তাকে অলক্ষ্যে চালিত করেছে, মনের গভীরে এটা সে টের পেত।

আর এখনো সে কেমন ঘোলাটে একটা অস্বস্তি টের পেল, কেমন একটা ম্যাড়মেড়ে নীলাভ অনুভূতি, যা তার ভেতরকার কী একটা জিনিস যেন নিবিয়ে দিচ্ছে। এটাকে সে অবশ্য তার ওই আতঙ্কটার সঙ্গে জড়িয়ে দেখল না। তবু মনে হল যেন বৃদ্ধকে অপমান করে সে কোনো এক দেবতাকে বুঝি রুষ্ট করে তুলেছে, এ দেবতাকে সে বিশ্বাস না করলেও তা বিদ্যমান ও সর্বশক্তিময়।

রুটিটা ছিঁড়ে সে এগিয়ে দিলে বুড়োর দিকে, পরিষ্কার করে বললে, 'আমার ছেলে তোমাদের এখানে মারা গেছে। ফ্রণ্টিয়ার ঘাঁটিতে কাজ করত। গাড়ি উল্টে পড়ে নদীতে।'

রুটিটা নিলে বুড়ো, সৌজন্যের সঙ্গে চোখ মুখ দিয়ে হাসলে, ছেলের প্রসঙ্গে কিছু বললে না। আসলে কোনো কিছু সম্পর্কেই বললে না কিছু। ম্যাপল গাছের শুকনো পাতার মতো ভঙ্গুর হাতে অঞ্জলি ভরে সে জল নিলে, তারপর একটু একটু করে রুটি ছিঁড়ে অনেকক্ষণ চিবিয়ে চিবিয়ে খেতে লাগল, তাকিয়ে রইল সামনের দিকে।

৪

রাত কাটালে সে কাছের ঘাঁটিতে। ঘাঁটির কম্যাণ্ডার তার ছেলে মিশার বন্ধু ছিল, নিজের বাড়িতে নৈশাহারে নিমন্ত্রণ করল সে, মিশার গল্প করলে অনেক এবং শেষ পর্যন্ত মাতাল হয়ে উঠল। মাতালদের বৃদ্ধ পছন্দ করত না, কেননা নিজে সে কখনো ভোদকা খেত না, মাতাল হত না কখনো, যদিও ভালো আঙুরের মদে যে সামান্য মাথা ঝিমঝিম করা প্রীতিকর একটা নেশা হয়, সেটার কদর করত সে। তাই উঠে গিয়ে সে বাইরের ঘরে রং ওঠা চাদর বিছানো শক্ত খাটটায় গিয়ে শুয়ে পড়ল এবং সকালে যখন সূর্য উঠল, রাতের পেট্রল ফিরে এল ঘাঁটিতে, তখন আবার রওনা দিলে।

ঘণ্টা খানেক বাদে পেছন থেকে একটা জীপ এসে তার সঙ্গ ধরল, কম্যাণ্ডার প্রায় চোখের জল ফেলে তাকে জীপে ওঠার জন্যে সাধাসাধি করলে; মিশা যে ঘাঁটিতে কাজ করত সেখানে তাহলে কালই পেঁছে যেতে পারে তারা। কিন্তু

বৃদ্ধ প্রথমে অভিভূত ও শেষে বিরক্ত হয়ে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলে। পায়ে হেঁটে যেতে চায় সে। পুরো আধ ঘণ্টা পীড়াপীড়ির পর কম্যাণ্ডার ফিরে গেল, বুড়ো চলল এগিয়ে।

হাঁটাটা বিশেষ সহজ হচ্ছিল না। পামিরের গাছে-ছাওয়া ঠাণ্ডা পাদদেশের পর এখন শুরু হল আসল পামির—ন্যাড়া ন্যাড়া তপ্ত শিলার জীবন্ত রাজ্য।

পাহাড় ফুঁড়ে গেছে পথটা, পাক খেয়েছে সাপের মতো, আর মুখোমুখি ছুটে আসা গাড়ি যখন পথ করে দেবার জন্যে অতল গহ্বরের ঠিক প্রান্তেই চাকাটা সরিয়ে আনত, তখন বৃদ্ধ মুখ কুঁচকিয়ে অজান্তেই চেয়ে দেখত নিচে যেখানে তুষার-গর্ভ মেঘের মতো কালো হয়ে ফুঁসছে পিয়াঁজ। মাঝে মাঝে তার ইচ্ছে হত দেখে কী করে ব্যাপারটা হয়, বোঝে কী হয়েছিল, কী ভাবে ঘটেছিল। কিন্তু নিরাপদেই চলে যেত গাড়িগুলো আর ড্রাইভার পুরনো পরিচিতের মতো ফুর্তির কিছু কথা বলে পামিরের উন্মাদ বাঁকগুলো দিয়ে উন্মাদ গতিতে চলে যেত দূরে।

ডাম্প-ট্রাকগুলোর চাকা থেকে ওঠা উত্তপ্ত পাথুরে ধুলো ভেসে থাকত কর্কশ বাতাসে, কখনোই তা থিতাত না, নিঃশ্বাস নেওয়া যেত না। অথচ আফগানিস্তানের পারে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্তূপে নেমে আসত না-গলা তুষার, কেননা দীর্ঘ পর্বতশ্রেণী পেরিয়ে সূর্য কখনো উঁকি দিতে পারত না সেখানে।

ঘন ঘনই বৃদ্ধ এসে দাঁড়াত একেবারে খাদের প্রান্তে, বুক ভরে নিশ্বাস নিতে চাইত একটু জলের ছিটে, একটু ঠাণ্ডা আমেজ পাবার জন্যে। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। কোনো ঝরনাও পড়ল না পথে, অথচ ওপারে অবিরাম ধাপ থেকে ধাপে লাফিয়ে পড়ছে সুঠাম শাদা জলস্রোত, ঠিক যেন আঁটো শাদা পোষাকের সার্কাস খেলোয়াড় ট্র্যাপিজ থেকে

ট্র্যাপিজে লাফাচ্ছে। সূর্য একেবারে মুখোমুখি জ্বলছে, ছায়ার লেশ নেই কোথাও, দম নেবার জায়গা নেই। ছোটো ছোটো খেপে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল সে, গিরগিটির মতো ধুক-ধুক করছিল গলার ঝুলন্ত লালচে চামড়া।

গাড়ি চলাচল কমে এসেছিল, থিতিয়ে গেছে ধুলো, তাহলেও হাঁটা মুশকিল হচ্ছিল: টান টান মাকড়শার জালের মতো শুকনো কঠিন কী একটা জিনিস চেপে ছড়িয়ে পড়ছে কাঁধে, নড়াচড়া কঠিন হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত মোড়ের ওপাশে একটা ঝরনা দেখা গেল, তাড়াতাড়ি পা চালাল সে, যেন স্বপ্নের মধ্যে তার শিথিল দেহকে ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে ইচ্ছে।

ঝরনাটা নেমেছে একটা খাদ বেয়ে—আর্দ্র, শীতল। বুড়ো সোজা গিয়ে একটা পাথরে বসল, কোনোক্রমে মাথা আর ঘাড়টাকে রাখল ছোট্ট একটু ছায়ায়। পেট পুরে জল খেলে সে, অনেকক্ষণ করে কুলকুচি করলে ঠাণ্ডা কনকনে জলে, জুতো আর সুতী ট্রাউজারটা ভিজিয়ে নিলে। ঠাণ্ডা হয়ে গেল চামড়া, কিন্তু ভেতরের তাপ গেল না, এমন কি ভিজে জমে যাওয়া খুলির হাড়ের নিচে মাথার ঘিলুও যেন তপ্ত ভারাক্রান্ত হয়ে রইল।

তারপর ফের সে আড়াল নিলে ছায়াটায়, এই দেখে আনন্দ হল যে জায়গাটা চুপচাপ, গাড়ি যাচ্ছে না, মুখে জোর করে ফুর্তি ফোটাবার দরকার নেই। অবশ্য ওপারে, ওপরের শিলায় লটকানো ডালপালায় বোনা মই বেয়ে নামছিল প্রকাণ্ড বোঝা নিয়ে বাদামী বাদামী সব লোক, থেমে তারা তাকিয়েও দেখলে ওকে। কিন্তু ওরা ছিল অসীম দূরে, দূরতিক্রম্য এক রেখার ওপারে; ওদের উপেক্ষা করা যায়।

পরিতৃপ্তির সঙ্গে সে গা জুড়তে লাগল, তাকিয়ে রইল ঘন এক-চাপড়া ঘাসের দিকে, সবুজ সে শীতলতাকে যেন

ছোঁয়া যায়। সে দিকে চেয়ে চেয়ে ভারি ভালো লাগল তার। ইচ্ছে হল খুব ছোট্ট কিছু একটা হয়ে ওই সবুজের মধ্যে আশ্রয় নেয়, জীবন কাটিয়ে দেয় সেখানেই।

একটা গান কানে এল তার। হয়ত অনেক দূরে কেউ গেয়েছে, ধ্বনিতরঙ্গে তা ভেসে এসেছে এতদূর, হয়ত বা ওটা তার মস্তিষ্কেরই কোনো কোষের কারসাজি। কিন্তু গানটা সে শুনতে পেলে পরিষ্কার, বেসুরো এক নারী কণ্ঠ দম নিচ্ছে, উচ্চ স্বরগ্রামে গলা উঠছে না—সবই কানে আসছে তার। প্রাণপণে চোখ বুজলে সে, দেখতে পেলে লাল ওয়াল-পেপারে মোড়া একটা ঘর, দেয়ালে গালিচা টাঙানো, নিকেলের গোলক লাগানো একটা শিশুর খাট, তার বৌয়ের চওড়া পিঠ, জ্বরে লাল হয়ে ওঠা মিশার মুখ, নাকি তাসিয়ার।

ওদের ছেলেবেলাটা ওর মনে পড়ে না, শুধু মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে এই ধরনের জ্বলজ্বলে ছেঁড়া টুকরো। পাটকিলে চুলের মোটা সোটা এক নারী হয়ে বেড়ে উঠেছে তাসিয়া, বিয়ে করে নি। মাঝে মাঝে সে কোনো একজন পুরুষকে সঙ্গে নিয়ে আসে তার বাগান বাড়িতে, ব্যাঙের ছাতা কি বৈঁচি খুঁজে বেড়ায় কিংবা হয়ত কিছুই খোঁজে না, এমনি ঘুরে বেড়ায় বনে, তারপর ফিরে এসে একসঙ্গে সামোভার থেকে চা খেয়ে চলে যায়। অসুন্দর এই মেয়েটাকে তার ভালো লাগে না, অথচ আশ্চর্য, তার অনুমতির তোয়াক্কা না রেখেই সে তার বাড়িতে আসতে পারে।

মিশার কথা সে ভাবত বেশি, হয়ত এই জন্যে যে, ছেলের বাইরের চেহারা বিশেষ বদলায় নি। গত বছর ছুটিতে মিশা বাড়ি এসেছিল—একই রকম রোগা, ছোটো খাটো দেখতে, শণচুলো গোল মাথা, জ্বলজ্বলে গোলগোল চোখ, শৈশবের আর্ত সারল্য তাতে তখনো টিকে আছে। স্কুলের

ছাত্র হিশেবে মিশাকে বৃদ্ধ সহজেই মনে করতে পারে — রোগাটে, ক্ষুধার্ত, পায়ে ছেঁড়া জুতো, পরনে জীর্ণ স্কি-স্যুট। তারপর ক্যাডেট অফিসার, তখনো একই রকম রোগা, মুখচোরা। কিন্তু এই মিশার কথাও বুড়োর মনে পড়ে কম, তার নিজের জীবনের ঘটনাই তার স্মৃতি ভরে রেখেছে।

বেশিক্ষণ এখানে বসে থাকা চলে না, ঘাঁটিতে ওকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যে সবচেয়ে কাছের কিশলাক বা ঘাঁটিও অনেক দূরে, পুরো দিন হাঁটলে তবে পেঁছতে পারা যাবে। আর পাহাড়ে রাত কাটানো বুড়োর অভ্যেস নেই, খুব ঠাণ্ডা পড়বে, বিপজ্জনক।

দুপুরের ওপাশে ঢলেছে সূর্য, ব্যস্ত হয়ে উঠল বুড়ো। জিরিয়ে নেবার পর তাড়াতাড়ি পা চলল তার, তাছাড়া উঁচু একটা পাহাড়ের ছায়ায় রাস্তাটা এখানে অনেক দূর ঢাকা।

ঘণ্টা খানেক পরে বাঁক নিল রাস্তাটা, পেঁছল একটা উত্তপ্ত উপত্যকায়, তার চতুর্দিকেই উঁচু উঁচু গোলাকার বাদামী পাথর, মনে হয় যেন একদল ফ্র্যান্সিস্কান সাধু। তাদের মাঝখান দিয়ে যাচ্ছিল বৃদ্ধ, অজান্তেই থেমে যাচ্ছিল একটু ভালো করে চেয়ে দেখার জন্যে: পাথরগুলোর প্রত্যেকটারই আছে নিজস্ব জীবন্ত রহস্যময় এক একটা চেহারা। ভ্রূকুটিত। বুড়ো জানত যে তাড়াতাড়ি করা দরকার, হাঁটার গতি সে বাড়ালে, নিজেকে হুকুম দিলে যে আশেপাশে চাইবে না, এবং সত্যিই চাইলে না, তারপর হঠাৎ ভেতরে অপ্রীতিকর কী একটা আর্তি তাকে জ্বালাতে শুরু করলে এবং তাকিয়ে দেখলে সে: কোমর পর্যন্ত হলুদ বালিতে ডুবে দাঁড়িয়ে আছে চিকন-বাদামী পাথরগুলো, ছোটো ছোটো কালো ছায়া পড়েছে তাদের।

সীমান্ত ঘাঁটিতে তার দলিলপত্র পরীক্ষা করা হল: সৈনিক কয়েকজন একেবারে ছেলেমানুষ, অবাক হয়ে তন্নতন্ন করে তারা দেখলে তার পাসপোর্ট, অনুমতি-পত্র, চিঠি; তারপর সেলাম ঠুকে ছেড়ে দিলে, এতই অবাক হয়েছিল যে মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরুল না।

আবার রাস্তা ধরলে সে, উদ্দাম হয়ে তা পাক খেয়েছে উপত্যকাটায়, ছুটে উঠেছে অনুচ্চ বালিয়াড়ির ওপর, ফের নেমে এসেছে নিচে, এঁকেবেঁকে গেছে এক ঢালাও সর্পিলতায়, যেন এক মন্থর বালুকা-নৃত্যে নামা কোনো বিশাল ডাইনোসোরের লেজের দাগ।

এখন আর গরম লাগছিল না তার, হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল না, যদিও তার চামড়া হয়ে উঠেছিল লালচে বাদামী, গা ভরে উঠেছিল চ্যাটচেটে ঘামে। কিন্তু তার মনে হচ্ছিল যেন সে একেবারে শুকিয়ে গিয়ে হালকা হয়ে উঠেছে। হাঁটছে হালকা পায়ে, যেন নাচছে, যেন সে একটা ছায়া। আসলে কিন্তু যাচ্ছিল সে খুবই ধীরে ধীরে, পা প্রায় চলছিল না।

চারপাশের পাহাড়গুলো কেমন হালকা আর অসম্ভব উঁচু। এত উঁচু যে মাথা তুলেও সে দেখতে পেল না তাদের হলদে চুড়োগুলো কোথায় হলদে সূর্যে গিয়ে বিঁধেছে। পাহাড়ের গা-গুলো সব উটের লোমের মতো পাটকিলে, অদ্ভুত যত কুণ্ডলীতে তা ঢাকা, বোঝা যায় তপ্ত গলন্ত পাথরের যে-নৈকট্য সে তার পা দিয়ে টের পাচ্ছিল তা থেকে থেকেই ফুঁসে বেরিয়ে বহুকাল ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া এই শান্ত পাহাড়ের গায়ে রেখে গেছে তাদের ছোটো ছোটো বুদ্বুদ।

আরো এগিয়ে গেল বৃদ্ধ, পাহাড়টা এখানে লাল, পাখির

ডানার মতো টান-টান রেখা টানা। মাথা তুলে বুড়ো দেখলে সেই পাখির উড়ে যাওয়ার আর্ত আকুল কামনা।

উপত্যকায় সূর্য একেবারে সরাসরি মাথার ওপর, একটা পাথরেরও ছায়া পড়ে নি, সবকিছুই শুকনো, পাটকিলে, উত্তাপে উচ্ছ্বসিত। অগ্নিময় এই শ্বসনের মধ্যে বৃদ্ধ সানন্দে বহন করলে তার লঘু দেহটি, তৃপ্তির সঙ্গে পান করলে রোদ, ভেজা লোমে ভরা বুক আর মুখখানি তুলে ধরলে সূর্যের দিকে, আর এই জন্যে তার ক্ষোভ ও দুঃখ হল যে এত সত্ত্বেও তার দেহ থেকে ওই নোংরা ছায়াটা পড়ছে পাথরের ওপর, ক্ষুণ্ণ করছে এই আগুনে উত্তেজনার সম্পূর্ণতা।

বৃদ্ধের মনে হল, সে যেখানে এসেছে তার আগে সেখানে অন্য কোনো মানুষ আসে নি, আসা সম্ভব নয়, যদিও রাস্তায় টায়ারের তাজা দাগ বেশ ফুটে আছে। তাহলেও এ জায়গাটা মানুষের জন্যে নয়, এখানে বাস করে শুধু পাতকী দেবতারা। কামনায়, লালসায় পৃথিবী এখানে ফেটে গেছে, আর এই আর্ত আসঙ্গলিপ্সায়, এই অপরূপ নরকে শুধু দেবতারাই তাদের সংখ্যাহীন প্রণয়িনী পাটকিলে পাহাড়গুলোর মধ্যে ভেসে বেড়ায়।

বৃদ্ধ অনুভব করলে সেও যেন দেবতা হয়ে গেছে। পোষাক, চাপাটি আর কাপটার বাণ্ডিলটা রাখলে পাহাড়ের নিচে, পরে তা তুলে নিলেই হবে। তারপর দুহাত বাড়িয়ে আনন্দে পাখির মতো ভেসে গেল সে পিয়াঁজ নদীর ওপর দিয়ে। তার নরম ঠাণ্ডা আমেজ আর ফুঁসন্ত জলের ছিটকানি টের পেল সে, উড়ে গেল পাখির ডানার মতো আবেগনম্র পাহাড়টার কাছে তারপর তাড়াতাড়ি করে উঠতে লাগল সূর্যের দিকে, ভয় হচ্ছিল হয়ত পেরে উঠবে না, হয়ত সূর্যের তাপে সে পুড়ে

যাবে, হাঁপিয়ে উঠবে, নয়ত কিছু একটা ঘটবে আর সে কখনোই সূর্য পর্যন্ত পেঁছতে পারবে না।

সূর্যের সঙ্গে ধাক্কা লাগল তার বুকে, পাথরের মতো তা শক্ত, অসহ্য উত্তপ্ত, গুমোট, গাঢ় কী একটা গন্ধে ভারাক্রান্ত।

৫

চোখ মেলে সে দেখল পড়ে আছে রাস্তার ওপর, চারিদিক ফাঁকা, অসহ্য ব্যথা সারা গায়ে, বিশেষ করে মাথায়, রক্তে ঝাপসা হয়ে আছে দৃষ্টি। মুখের কাছে হাত তুললে সে, থেঁতলে গেছে সব, ছেঁড়া ছেঁড়া নোংরা চামড়া আর মাংসের মধ্যে দিয়ে দেখা গেল শাদা শাদা হাড়। যন্ত্রণায়, ঘেন্নায় ফের মাথা ঘুরতে লাগল তার। ভাবলে সে, 'শেষ তোমার বেহালা। শেষ তোমার পিয়ানো!..'

ভারি হয়ে এঁটে যাওয়া চোখের পাতা তুললে সে, রাস্তায় গড়াচ্ছে লাল ব্যাণ্ডেজ, লাল ফুল, মোটা একটা মোচড়ানো রুপোলী পেন্সিল, লাল লাল ম্যাপল পাতা। বাঁধানো নুড়িগুলো শুকিয়ে ওঠা রক্তে লাল।

আলো আড়াল করে কে একজন ঝুঁকে এল তার ওপর, সাশা? সাশা, কী হল?' গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সে, টের পেলে তাকে এখন আর মরতে দেবে না কেউ। শান্তিতে অজ্ঞান হয়ে গেল সে।

জানলায় সকালের পক্ষে একটু বেশি জ্বলজ্বলে রোদের আলোয় সে জেগে উঠল, যদিও জানত এখনো খুবই সকাল। বিছানা ছেড়ে ইজের পরা অবস্থাতেই সে গেল জানলার কাছে, তাকিয়ে দেখল বাগানে। নিচের খাদটা ভেজা ভেজা, সুগন্ধভরা, অজস্র আপেল আর বার্ড-চেরি ফুল ফুটেছে।

নিচে নেমে হাঁটতে লাগল সে খাদ ধরে, শিশিরে তার পা ভিজে ঠাণ্ডা হয়ে উঠল হাঁটু পর্যন্ত, অলডার আর বার্ড-চেরি গাছের ঠাণ্ডা শিশির অঝোরে ঝরতে লাগল তার কাঁধের ওপর। বাড়িটার দিকে চেয়ে দেখল সে, টাটকা কাঠ তার মধুর মতো হলদে—দুই থাকের খাঁটি রুশী বাড়ি, ওপরে চিলেকোঠা, অলিন্দে জালিকাঠের নক্সা; মনটা তার ভারি খুশি, যেন বরাবরের মতো আঁকড়ে ধরেছে মাটিকে। শিশির ভেজা পাতাগুলো সরাতেই তার চোখে পড়ল মস্তো এক ঝলমলে লালচে স্ট্রবেরি।

'বাবা,' চেঁচিয়ে উঠল মিশা, 'সলোভিয়েভকে নিয়ে যাব?'

'নিয়ে যা,' ফিসফিসিয়ে বলে বুড়ো ফের স্ট্রবেরির ওপর ঝুঁকে পড়ল।

দেহের কোষে কোষে তার তিরিশ পুরুষের কৃষি কাজের স্মৃতি, এখন তার মনে হল যেন সে নিজেকে ফিরে পেয়েছে, শেষ পর্যন্ত তার হাত, তার আঙুলগুলো শূন্য থেকে এমন কিছু টেনে আনছে না যা ক্ষণস্থায়ী, আজ উঠেই যা কাল মিলিয়ে যাবে, কারো কখনো পেট ভরাবে না, তুলে নিচ্ছে এমন কিছু যা ধরা ছোঁয়ায় বাস্তব, দুই দু'গুণে চারের মতো স্পষ্ট, চিরকেলে।

ফের ঝুঁকে পড়ল সে, মুখে লাগল ছ্যাঁকা দেওয়ার মতো ঠাণ্ডা, পেট্রলের গন্ধ ওঠা শিশিরের ছোঁয়া, চোখ মেললে।

৬

'কী দাদু,' তারপালিন বালতির শেষ জলটুকু বৃদ্ধের বুকে ঢেলে বললে ড্রাইভার, 'আমি তো ভেবেছিলাম বুঝি পটলই তুললে...'

প্রাণভরে একটা খিস্তি করলে ড্রাইভার, আর বৃদ্ধ উঠতে গিয়ে গঙিয়ে উঠল মাথার পেছনে একটা আচমকা প্রচণ্ড যন্ত্রণায়।

'ভয় নেই,' বললে ড্রাইভার, 'এ যাত্রা বেঁচে গেছ!'

বুড়োর মাথা আর হাঁটুর তলে দু'হাত দিয়ে সে তাকে তুলে এনে বসালে তপ্ত সিটের ওপর, অনাবৃত পিঠে তাতে সঙ্গে সঙ্গেই ছ্যাঁকা লাগল। তারপর বালতি নিয়ে সে নেমে গেল পিয়াঁজ নদীতে, র‍্যাডিয়েটরে জল ঢাললে, রওনা দিলে।

চোখ বুঁজে নীরবে বসে রইল বৃদ্ধ, ঝাঁকুনিগুলো সইবার জন্যে টানটান করে রাখলে শরীর, পা দিয়ে ভর দিলে লোহার মেঝেটার ওপর, কিন্তু সেটাও এমন উত্তপ্ত যে জুতোর সোল ভেদ করে আসা গরমটা বেশিক্ষণ সওয়া গেল না।

'এইখানে একটা অক্সিজেন বওয়া গাড়ি পুড়ে যায়,' হঠাৎ বলে উঠল ড্রাইভার, মুখ বাড়িয়ে তাকিয়ে দেখল পুড়ে যাওয়া কেবিনের মরচে ধরা পাত আর ফ্রেমটার দিকে।

'পুড়ে গেল কেমন করে?' অবাক হল বৃদ্ধ।

'সিলিণ্ডার ফেটে গিয়েছিল বোধহয়?' অনুমান পেশ করলে ড্রাইভার।

কিছুক্ষণ পরে, গাড়ি যখন ঠিক পিয়াঁজ নদীর ওপর দিয়ে যাচ্ছে, চাকা ঘুরছে ঠিক খাদের ওপর, ড্রাইভার ফের বললে:

'এই জায়গাটায় ভাস্কার সঙ্গে আমার ধাক্কা লেগেছিল। আমি আসছি এদিককার মোড় থেকে, ও শালা ওপাশ থেকে। কী জোরই না লাগল। ওর র‍্যাডিয়েটর দুমড়ে গেল, আমার পাশটা।'

তার উদ্ধার-কর্তা যে বেহিসেবী খিস্তি ছড়াল তাতে মুখ কাঁচুমাচু করলে বৃদ্ধ, জিজ্ঞেস করলে:

'অমন পাগলার মতো গাড়ি ছোটাও কেন, ভয় করে না?'

'পনের বছর পামিরে আছি, অভ্যেস হয়ে গেছে। এখন তো রাস্তা নয় কোথাও কোথাও চওড়া করা হয়েছে, নইলে আগে তো ধাক্কা লাগত প্রায় প্রত্যেক দিন।'

বেশিক্ষণ চুপ করে রইল না ড্রাইভার।

'এইখানটায় গত বসন্তে স্কিড করে পেত্‌কা। তাকেও পাওয়া যায় নি, গাড়িটাও না। ভাগ্যিস ছেলেটাকে সেবার সঙ্গে নেয় নি।'

'কিসের ছেলে?'

'মানে ওর ব্যাটা। প্রত্যেকবার ছেলেটা ওর সঙ্গে সঙ্গে যেত... পিয়াঁজ যদি ছেঁকে তোলা হয়, তাহলে আমার ধারণা দোশাম্বেতে যত গাড়ি আছে তার চেয়ে বেশি গাড়ি পাওয়া যাবে এই নদীতে।'

কেবিনের জানলা দিয়ে তাকাল বৃদ্ধ, চোখে পড়ল নিচে নামা অবিরাম খোঁচা খোঁচা তট, আর পিয়াঁজের উদ্দাম ধূসর ফিতে। একটা আতঙ্ক শিরশির করে উঠল পিঠে। কিন্তু হেঁটে যাওয়ার সামর্থ্য এখন আর নেই। ফের চোখ বুজে সে বললে:

'একটু আস্তে চালাও হে, অভ্যেস নেই তো, ভয় করে...'

'ভয়ের কী আছে দাদু!' সান্ত্বনা দিলে ড্রাইভার, 'একদিন তো মরতে হবেই।'

'তা কথাটা তুমি ঠিকই বলেছ,' কেমন অবাক হয়ে সায় দিলে বৃদ্ধ।

৭

ন্যাতার মতো আঙুলে উইন্ডস্ক্রীনের ব্র্যাকেট ধরে সে যথাসম্ভব টান-টান হয়ে রইল যাতে ঝাঁকুনি খেয়ে সীট থেকে পিছলে না পড়ে। ঘুম পাচ্ছিল তার, নিজেকে চাঙ্গা করে

তোলার শত চেষ্টাতেও তার ভাবনা আর বাস্তবতা যেন কোথায় মিলিয়ে যাচ্ছিল, ঢলে পড়ছিল সে, জেগে উঠছিল শুধু মাঝে মাঝে।

ট্রাকটা ছুটছিল পিয়াঁজ নদী বরাবর, ঘটঘট শব্দ করছিল প্যাকিং বাক্সগুলো। ড্রাইভারের গায়ে ছেঁড়া নীল গেঞ্জি, টুপিটা উল্টো করে পরা, শাদা ফ্রেমের গগল্‌স্‌ চোখে, নিশ্চিন্তে সে তাকিয়ে ছিল রাস্তার দিকে, ঘুম তাড়াবার জন্যে মৃদু শিস দিচ্ছিল। লোকটার সুরজ্ঞান ছিল, তাই এ শিসে বৃদ্ধের অস্বস্তি হল না, অথচ বৌয়ের গানে সর্বদাই তার বিরক্তি ধরত, কেননা তার গলাটা ছিল বেসুরো। গান গাইলেই তার বিচ্ছিরি লাগত, শেষ পর্যন্ত তার গান গাওয়া সে বন্ধ করে। না, জুলুমবাজ ছিল না সে, শুধু চারপাশের লোকজনের কাছে তার সামান্যই দাবী ছিল: কেউ যেন তাকে বিরক্ত না করে।

বড়ো কিছু হতে চেয়েছিল সে। এটা শুধু একটা হাস্যকর বাতিক বা ভুঁইফোঁড়ের স্বপ্ন নয়। দৈহিক ভাবেই এ তাগিদটা সে অনুভব করত, যেভাবে অন্তঃসত্ত্বা অনুভব করে তার সন্তানকে, দৈহিক কামের মতোই এটা তাকে পীড়িত করত, সুন্দর তাগড়াই একটা ঘোড়া যে ভাবে ছটফট করে তার গতি আর মুক্তির জন্যে।

এই বড়ো কিছুটা যে তার মধ্যে আছে, এটা সে নির্ভুল জানত। কিন্তু প্রকাশ পেল না সেটা। এই জন্যে নয় যে সে সাফল্য লাভ করে নি। বরং ভাগ্য তার সারা জীবনেই আনুকূল্য করেছে। এমন কি ওই উন্মত্ত জনতার সঙ্গে সংঘাতেও তার ভবিষ্যৎ আর পরিকল্পনায় কোনো ছেদ পড়ে নি। যদিও ভাঙা হাতে বেহালা বাজানোর আশা তাকে ছাড়তে হয়েছিল। সে হয়ে দাঁড়ায় সুরকার, সঙ্গীত পরিচালক, গান তার সম্প্রচারিত হয় রেডিওয়, কনসার্ট তার রসজ্ঞদের

তারিফ পায়। কিন্তু সে বুঝত যে এটা ঠিক সেই জিনিসটা নয়। সে জানত যে লোককে কাঁপিয়ে দেবার শক্তি তার আছে, তবে আপাতত সে শুধু লোকের ভালো-লাগায় সুড়সুড়ি দিচ্ছে, লোকেও কনসার্টের সময়টুকু তাকে প্রশংসা করে ভুলে যাচ্ছে বেরিয়ে যাবার সময়।

ও চেয়েছিল বড়ো হতে, তার গোটা জীবন ছিল এই কামনায় বশীভূত, পিষ্ট। দিনের পর দিন যারা নিশ্চিন্তে কাটিয়ে যাচ্ছে তাদের সে বুঝত না, মনে হত ওটা সত্যি নয়, কেউ হয়ত তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা সাবধানে আড়ালে রেখেছে, কেউ হয়ত অকৃতকার্য, অশক্ত, ওঠার চেষ্টা করে টের পেয়েছে যে শক্তিতে কুলবে না।

নিজের জন্যে এ ধরনের জীবন সে কল্পনা করতে পারে না, ওর মনে হত যেন এটা অপরূপ এক ঢোক সুরা পান করে তার স্বাদ অনুভব করেও আলস্যে তা নিঃশেষ না করে রেখে দেওয়ার মতো, একথা না বোঝা যে নেশা ঘনায় শুধু শেষ ঢোকে, সেখানেই নির্বাণ। এমন কি এখনো, আয়ু যখন ফুরিয়ে এসেছে, শেষ হয়ে এসেছে জীবন, কিছুই তার আর বদলাবার নয়, তখনো সে বেঁচে আছে এই আশায় যে সবটা তার খাওয়া হয় নি, নির্বাণ পায় নি সে।

৮

গ্রামটায় যখন পেঁছল তখন সন্ধ্যে ঘনিয়েছে। চাখানা এমন কি ভোজনালয়ও ছিল এখানে। রাতের খাওয়া সেরে বুড়ো জানাল যে রাতটা সে এখানে কাটাবে, তারপর আগের মতো পায়ে হেঁটে যাবে, কিন্তু ড্রাইভার জানিয়ে দিলে সেটা চলবে না।

'তোমায় দাদু ফ্রণ্টিয়ার ঘাঁটিতেই নিয়ে যাব, কম্যাণ্ডারের হাতে সঁপে দেব, তারাই খতিয়ে দেখুক কার তুমি বাপ, কে তোমার ছেলে।'

ঈষৎ হেসে সায় দিলে বুড়ো। বোঝা যায় লোকটা তাকে হয় গুপ্তচর নয় দেশত্যাগী বলে ঠাউরেছে। বোকা ছেলে, ইউরোপ আমেরিকা যে ঘুরে এসেছে, সে লুকিয়ে বর্ডার পেরবে কিসের আশায়? বহু আগেই সে বুঝেছে যে রুশীর জায়গা রাশিয়ায়, অনেক আগেই জেনেছে যে রাশিয়াকে সে ভালোবাসে একটা পীড়িত হৃদয়াবেগে।

কিন্তু কিছুই বললে না সে। তার দেহ, মস্তিষ্ক তখনো অসাড়, ভারাক্রান্ত। তাছাড়া যন্ত্রণাও আছে। কিন্তু উড়ে যাওয়ার অনুভূতিটা, তার স্মৃতিটা ছিল বাস্তব, সুনির্দিষ্ট, মধুর। যন্ত্রণায় মূল্যশোধটা তার তুলনায় সামান্য। সবিস্ময়ে, সন্তর্পণ সুখাবেশে সে মনে মনে স্মরণ করল উড্ডয়নের মধুর পুলক, আন্দোলিত হাতের টান টান শক্তি, অনভ্যস্ত উত্তেজনায় বগলের কাছে সামান্য ব্যথা। তারপর গুঞ্জন তুলে অনবরত সূর্যের কাছিয়ে আসা, সারা দেহ ঝাঁকিয়ে বিপর্যস্ত করে সূর্যের সঙ্গে ধাক্কা। এত সত্ত্বেও সে বেঁচে। আর মিশা কিনা মরে গেল। মৃত্যুর মুহূর্তে কী মনে হয়েছিল তার?

ছেলের সঙ্গে কোনো বিষয়ে খোলাখুলি কোনো আলাপ সে কখনো করে নি। হয়ত সর্বদাই কী একটা গুঞ্জরিত প্রবাহ ঘুরত তার মধ্যে। কী একটা গোলমাল উঠত, বাইরের কিছু নিয়ে ভাবনায় বাধা ঘটাত, শুধু বৌ বা ছেলেমেয়ের কথা নয়। এমন কি নারীর কথাও তার মনে বিশেষ জাগত না। নারী সাহচর্য তার প্রায় ঘটত না, যদিও শক্তিমান সুপুরুষ ছিল সে, মেয়েরা পছন্দ করত তাকে। আপনা থেকেই সে নিজেকে জমিয়ে রাখছিল প্রধান জিনিসটার জন্যে।

প্রেম নাকি প্রেরণা দেয়, এটা কেবল অলস কবিদের আষাঢ়ে গল্প। সুখী প্রেম স্রষ্টাকে তার পথ থেকে বিচ্যুত করে। অসুখী প্রেমই সার্থক। সে এর কোনোটাই পায় নি।

শুধু গত বছর, মিশা যখন শেষবারের জন্যে ছুটিতে এসেছিল, তখন তারা কথা বলে খোলাখুলি, সমানে-সমানে। মিশা এসেছিল এক সঙ্গিনীকে নিয়ে, যদিও বিবাহিত সে, বৌ আর মেয়ে থাকে আলমা-আতায় মিশার শ্বশুর বাড়িতে, সামরিক বিদ্যালয় সে শেষ করে ওখানেই।

তার নিরাপদ ন্যায়বান পুত্রের পক্ষে অপ্রত্যাশিত এই 'অবৈধ' প্রেমটায় বৃদ্ধ হঠাৎ ছেলের প্রতি কেমন একটা শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে, যেন নিচু থেকে ওপর দিকে তাকাতে বাধ্য হয়, ছেলে যেন তার চেয়েও বয়সে বড়ো হয়ে উঠেছিল।

৯

ফেরি ঘাটে যখন পৌঁছল ওরা, তখন বেশ অন্ধকার হয়েছে, ফিরতি-মুখী ড্রাইভাররা আর এগুতে বারণ করলে, কেননা খরোগের সামনে বৃষ্টি নেমে রাস্তা পিছল হয়ে উঠেছে। তাহলেও এগিয়ে গেল ওরা। ঘণ্টা দেড়েক গাড়ি ছুটল অটুট অন্ধকারে, হেড লাইটের আলোয় শুধু সামনের খানিকটা পথ ধরা পড়ছিল—তার ওপাশে সবই অন্ধকার। বুড়ো অপেক্ষা করছিল প্রচণ্ড একটা বাঁক নেবার সময় তার উদ্ধারকর্তার লক্ষ্য ফসকাবে, গাড়ি উলটিয়ে পড়বে পিঁয়াজে।

তারপর চাঁদ উঠল। ফের দেখা গেল ভুতুড়ে নদীটার নোংরা জল, যেন কোনো ডাইনি তার জঘন্য ন্যাতাকানি কেচে গেছে ওতে; দেখা যেতে লাগল পাহাড়। সব মিলিয়ে এক অপরূপ আশ্চর্য দৃশ্য। কেবিনের শার্সিতে মুখ চেপে বুড়ো

কাঁদলে। অপরূপ কিছু দেখলেই ওর কান্না পায়। পাহাড়, চাঁদ, চন্দ্রকলঙ্ক আর টান-টান কালো আকাশ...

মেয়েটি এসেছিল মিশার আগে। দিন দুপুরে হঠাৎ ডেকে উঠেছিল কুকুরগুলো, বৃদ্ধ বারান্দায় এসে দাঁড়ায়, দেখে খাদের দিক থেকে হাঁটা পথ ধরে কে একটি মেয়ে আসছে। তখন জুন মাস, গরমের সময়টা গাঁয়ে কাটাবার আয়োজনে মস্কোবাসীরা আসা-যাওয়া করছে, বুড়ো ভাবলে এ মেয়েটিও বোধ হয় ঘর ভাড়া নিতে চায়।

'ভাড়া দেওয়া হবে না,' চেঁচিয়ে বললে বুড়ো, 'ফটকে লেখা আছে। পড়তে জানেন না নাকি?'

'আপনার নামে চিঠি আছে,' হাঁটা না থামিয়ে বললে মেয়েটি।

'দাঁড়ান, কুকুরগুলোকে সরাই,' গজগজ করলে সে। এই সময়টা সাধারণত সে ঘুমোয়, চাইত না কেউ তাকে বিরক্ত করে।

'ব্যস্ত হবেন না, আমার অভ্যেস আছে,' বললে মেয়েটি। প্রথমে কথাটা বোকার মতো শোনালেও পরে সে তার মানে বুঝেছিল: মেয়েটি পশুচিকিৎসক, তাই বর্ডারের কুকুর ঘোড়া প্রভৃতি যে সব জন্তু তার সাহায্যপ্রার্থী, তাদের সঙ্গে সে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

চশমার জন্যে বুড়ো ঘরে ঢুকল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করল মেয়েটি। আর কুকুরগুলো ক্ষেপার মতো ছিঁড়তে চাইল শেকল। মিশা লিখেছে যে দু'দিন পরে বিমান যোগে ছুটিতে বাড়ি আসবে, আপাতত মেয়েটি তাদের ওখানে থাকুক, মস্কোয় তার ওঠার কোনো জায়গা নেই।

ক্ষিপ্ত কুকুরগুলোর ঝনঝনে শেকলের পাশ দিয়ে বুড়ো বাড়ির পেছন দিককার একটা ছোট্ট ঘর দেখিয়ে দিলে—এদিকটা বুড়োর পছন্দ হত না।

'মাপ করবেন, পরিষ্কার চাদর টাদর কিছু নেই,' গজগজ করলে বুড়ো, 'মনে হয় ছারপোকাও আছে।'

কিছুই মন্তব্য করলে না মেয়েটি, আঙুর আর বাঙির ঝুড়িটা দিয়ে বললে যে তক্ষুণি সে মস্কো চলে যাবে, ফিরবে বেশ রাত করে। এবং যখন ফিরল, বুড়ো তখন বসে ছিল তার অপেক্ষায়। মেয়েটি সসেজ আর পিঠে নিয়ে এসেছিল, তাই দিয়ে সামোভার থেকে চা খায় ওরা, কথাবার্তা বলে। সকালে মেয়েটি আবার চলে যায় মস্কো, এবং অনেক দেরি করেও যখন সে ফিরল না, তখন কুকুর নিয়ে স্টেশনে রওনা দিলে বুড়ো। মেয়েটি ফেরে একেবারে শেষ ট্রেনে, বুড়ো তাকে প্রচণ্ড ধমক দেয়, কেননা বড়ো দুশ্চিন্তায় ছিল সে, রাগ জমে উঠেছিল। হঠাৎ কেঁদে উঠে মেয়েটিও অভিমানী মেয়ের মতো পাল্টা মুখঝামটা দেয়, এবং চায়ের জল ফোটার অপেক্ষা না করেই চলে যায় শুতে।

মিশা আসে পরের দিন এবং বুড়ো বোঝে যে মেয়েটি কোনো সাধারণ শয্যা-সঙ্গিনী নয়, প্রবল এক প্রেমে সে সৌভাগ্যবতী। প্রথমটা ওরা তাদের সম্পর্ক আড়ালে রাখত। নিজের পক্ষেই বিরক্তিকর এক কৌতূহলে বুড়ো দেখত কীভাবে মিশা ওর হাত ধরেছে কুনুইয়ের ওপরে, যেন অজান্তেই ছোঁয়া লেগে গেছে ওর গালে, অথবা শুধুই মুখোমুখি চেয়ে আছে দু'জনে। রাত্রে কানে আসত ক্যাঁচকেঁচে মেঝে দিয়ে ছেলে তার নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে মেয়েটির ঘরে, ফিরছে কেবল ভোরের দিকে। দিনের বেলায় বিমূঢ় চোখে, প্রেমে ও মুক্তিতে বোকা-বোকা হয়ে ঘুরে বেড়াত। বাকি দুনিয়াটা মুছে যেত তাদের কাছে।

একবার মিশা নিজের জন্যে ভোদকা আর বাপের জন্যে সুরা কিনলে, নৈশাহারে বসলে বারান্দায়।

ধোঁয়া আর স্যাঁৎসেঁতেনির আমেজ আসছিল খাদ থেকে, কিন্তু মদ্য পান, অবিরাম ফুটন্ত সামোভারটা, নিজের জন্যে বুড়ো কখনোই যা ব্যবহার করত না সেই শাদা টেবিল-ক্লথটা, টেবিলের ওপর নিজেদের বাগানের টাটকা মধু আর স্ট্র-বেরিগুলো, সিদ্ধ হতে দেওয়া বড়ো বড়ো শাদা ডিমগুলোয় কেমন উষ্ণ লাগছিল। নিবিড়তা, শিথিলতা, নৈঃশব্দ্য—এমনটা তার লেগেছে কবে, শৈশবে কি?

প্রসারিত মুখে নেশাতুরের মতো হাসলে মেয়েটি, মধু-রঙা হলদে চোখে তাকালে মিশার দিকে। আর গোল ছাঁটা মাথাটা ঝুঁকিয়ে মিশা বলছিল:

'নিজেকে দুর্বল হতে দিতে, নিজের মতো হতে আমি পারি না বাবা। কী ভাবে পরিস্থিতির ওপরে উঠতে হয় সেটা শিখলে যে ওদেরই উপকার... প্রথম দিকটায় ওরা গাঁইগুঁই করে, বলে কম্যান্ডারি ফলাচ্ছে। কিন্তু পরে বোঝে।'

'সোনার ছেলে!' হাসলে মেয়েটি, 'গোটা পামিরে এমন পোস্ট-কম্যান্ডার আর নেই। বেয়াড়াগুলোকে সব ওর কাছেই পাঠায়।' হঠাৎ তার দেহ, অধর, চোখ সবকিছু দিয়ে সে ঝুঁকে গেল মিশার দিকে, 'সেইজন্যেই তো ওকে ভালোবাসি।'

পাতকী এই ভঙ্গিটা হঠাৎ বুড়োর বুক চিরে চিরকেলে স্মৃতি রেখে যায়।

চলে যায় ওরা। সব চলতে থাকে বরাবরের মতো। মাঝে মাঝে তাসিয়া আসত, কখনো কোনো পুরুষ সঙ্গে করে, কখনো একা। মাঝে মাঝে আসত কোনো পড়শী। কিন্তু হঠাৎ বুড়োর মনে চোরের ভয় পেয়ে বসে এবং শরতে সে চলে আসে মস্কোয় তার ছোট্ট কামরাটায়।

এখন কিউয়ে দাঁড়িয়ে বাজার করতে, পার্কে ছেলেপুলে আর মায়েদের সঙ্গে আলাপ জুড়তে তার ভালো লেগে গেল।

জীবনে এই প্রথম লোকের সঙ্গ তার কাছে বিরক্তিকর লাগল না। কাজ থেকে পেনশন নেবার পর এই প্রথম তার কাছে অসহ্য লাগল নিঃসঙ্গতা। লোকের সাহচর্য খুঁজত সে, মনে হত এটা শুধু সাময়িক, কী একটার আগে কোনো বিরতি মাত্র। ছেলের মৃত্যুটাকে তাই সে একটা সঙ্কেত, একটা নির্দেশ বলে নেয়, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, আপনা থেকেই এই দেড় হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দেবার বাসনা জাগে। কেন?.. সেটা সে তখনো জানত না, শুধু অনুভব করত এটা দরকার। সে ভাবতেও পারে নি যে পরে এর কথা সে সুরে গাঁথবে, এটাই হবে তার তর্পণ, সত্যিকার জিনিস, সেই উৎসার যার পরে সে পাবে আত্মিক শান্তি ও নির্বাণ।

১০

'আহ্, আমায় উন্মত্ততা দাও দেবগণ। উন্মত্ততা, যাতে বিশ্বাস করতে পারি নিজেকে। বিকার আর প্রলাপ দাও আমায়, ক্ষণে ক্ষণে বদলে দাও আলোক আর তিমির। এমন উত্তাপ আর হিমানীতে আমায় বিদ্ধ করো কোনো মর্ত্যবাসী যা কখনো অনুভব করে নি, তুমুল কোলাহল আর সঞ্চরমান ছায়ায় আমায় আতঙ্কিত করো, বাধ্য করো আমায় কাৎরাতে, গজরাতে, মাটিতে লুটোতে। শুধু আত্মবিশ্বাস দাও... সন্দেহ আমায় কুরে কুরে খাচ্ছে। নতুন যে আত্মা রয়েছে আমার মধ্যে, তোমাদের কাছ থেকে ছাড়া তা আসবে কোথা থেকে। দেখাও যে আমি তোমাদেরই লোক, আর সেটা দেখাতে পারে কেবল উন্মত্ততা...'

যুগে যুগে অসাধারণত্বের অধিকার, লোকসিদ্ধকে অস্বীকার করার অধিকার, স্পর্ধার অধিকার অর্জনের পথ থেকেছে

কেবল একটিই—উন্মত্ততা। এক সময় তা কৃত্রিমভাবে আহৃত হয়েছে ব্রতোপবাস, ইন্দ্রিয়দমন, গুহায় নির্জনবাসের মধ্য দিয়ে। কেবল উন্মাদেই পারে নিজের ইচ্ছামতো দিন কাটাতে, খুশি মতো কথা বলতে, কেউ তাতে অবাক হবে না, সবাই তাকে দেখে অন্য নিরিখে।

তাকেও সর্বদাই খানিকটা পাগল, খানিকটা বিকৃতমস্তিষ্ক বলে ধরত তার সহকর্মী, বন্ধুবান্ধব, স্ত্রী। খোঁচাখুঁচি না করলে ও ছিল আশেপাশের লোকেদের কাছে নিরুপদ্রব। ইচ্ছে হলে সে কথার জবাব না দিতে পারত; যাকে তাকে সে 'হাঁদা' বলে দিতে পারত, যদি মনে মনে তাই ভাবত, 'আপনার ওপর ঘেন্না ধরে গেছে!..' বলে চলে যেতে পারত অনায়াসে,—কোনো স্বাভাবিক লোকের পক্ষে যা করা অসম্ভব। কিন্তু মনে মনে সে জানত যে ওটা শুধু একটা সুবিধেমতো আড়াল, আসলে সে খুবই সুস্থমস্তিষ্ক, মোটেই বেপরোয়া নয়, নিজের সমস্ত আচরণের ফলাফল কী হতে পারে সেটা চমৎকার বোঝে।

ভয় ছিল তার মধ্যে। ছিল সেই মুহূর্ত থেকে যখন রাস্তায় ধাবমান জনতাকে সে দেখে, টের পায় যে জনতার নজর পড়েছে তার ওপর, কেন জানি জনতা তার ওপর চটেছে, যখন সেই প্রশ্ন সে শোনে যা উত্তরের অপেক্ষা করে না, কারণ উত্তর জিজ্ঞাসুদের জানাই আছে। 'নে, দেখা তো তোর বাক্সে কী আছে? বেহালা? দেখা তো ওটা কী কিসিমের বেহালা, শালা শুয়োরের বাচ্চা, চীনা তোদের। বলে বেহালা, আসলে একটা জোড়-খোলা মেসিনগান।' জীবনে সে জোড়-খোলা মেসিনগান দেখে নি কখনো, কোনো অস্ত্রই কখনো হাতে তোলে নি, কিন্তু তাতে কিছু এসে গেল না। কে একজন তাকে ধাক্কা দিলে, তারপর ধাক্কা দিতে লাগল

আরো অনেকে, কিমা তৈরির যন্ত্রে কিমা করার মতো করে চটকাল তাকে, পর মুহূর্তেই পিণ্ড পাকিয়ে ছুড়ে ফেলে দিলে। এগিয়ে চলে গেল জনতা।

সেই মুহূর্ত থেকে তার মধ্যে বাসা বেঁধেছে জনতার প্রতি বিদ্বেষ, জনতায় আতঙ্ক—অধরা, অন্ধকার, ন্যক্কারজনক কী একটা অনুভূতি। যা কিছু সে সৃষ্টি করেছে তাকে পিষ্ট করেছে এই জিনিসটাই, অথচ এইটের রূপ দিয়ে সে মুক্ত হতে, ঝেড়ে ফেলতে অক্ষম, যদিও জানত, সেই হবে তার গানের মতো গান। তার ভয় হত, সোজাসুজি জানত তেমন গানের মতো গানে আপাতত কারো প্রয়োজন নেই, তাই গাইত জনগণের মহিমা আর মেধা নিয়ে, যদিও নিজেই তাতে বিশ্বাস করত না।

১১

পোস্টে তারা পেঁছিল ভোরের দিকে। ডিউটি অফিসার তাকে অভ্যাগত কক্ষে নিয়ে গিয়ে বললে যে আপাতত ঘুমিয়ে নিক, তারপর যেন কর্তৃপক্ষের কাছে হাজির হয়।

শুতে গেল বুড়ো, ঘুম ভাঙল দুপুর নাগাদ, সারা দেহ একেবারে বিপর্যস্ত, মাথার পেছনে যন্ত্রণা এবং ভার-ভার বোধ হচ্ছে, মনে হচ্ছে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সবই নিষ্ফল, নিজেকে মনে হল একেবারেই তুচ্ছ ও গুণহীন। তবে দেহ ও মনের এই অবস্থা তার কাছে নতুন নয়, প্রায়ই এক একটা উন্মাদনার পর তার এই হয়েছে।

একটা ভদ্র চেহারায় হাজিরা দেবার জন্যে সে তার দলামোচড়া কোট প্যাণ্ট ইস্ত্রি করলে, শাওয়ার বাথ নিলে,

দাড়ি কামিয়ে বেরুল বাইরে। বেশ ঠাণ্ডা লাগছিল এবং বৃদ্ধের মনে হল পাহাড়ের ওপর দিকটা সত্যিই ঠাণ্ডা, হেঁটে নিজেকে ক্ষয় করা যথেষ্ট হয়েছে, নাটক শেষ করে এখন একটা গাড়িতে উঠে পড়াই ভালো, মিশার ঘাঁটি দেখে বাড়ি ফেরাই উচিত। নিখুঁতভাবে সে টের পাচ্ছিল অসাধারণ যা কিছু হবার তা হয়ে গেছে, ভবিষ্যতে আছে শুধু পুনরাবৃত্তি।

একটা পপলার গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে সে ভাবছিল। গাছটার ডালগুলো সব কৃত্রিমভাবে উঠে গেছে ওপর দিকে, যেন সামনে পিস্তলের নল দেখে সবাই হাত তুলেছে। সামরিক পোষাক পরা লোকজন যাচ্ছিল পাশ দিয়ে, যাবার সময় চেয়ে দেখছিল তাকে: মুখের ভাব তার সম্ভ্রান্ত, অহংকৃত।

একজন সৈনিক এসে বললে যে কম্যাণ্ডার তার জন্যে অপেক্ষা করছে।

হৃদ্যতা সহকারে কম্যাণ্ডার তাকে আপ্যায়ন করলে, মিশার কথাও গল্প করলে, কিন্তু বুড়োর দলিলপত্র দেখে তাদের প্রামাণিকতায় নিশ্চিত হয়ে তা সরিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত মুখটা তার টানটানই রয়ে গেল।

বুড়োকে সে আমন্ত্রণ করলে ভোজনালয়ে, এখানে আর বাড়িতে মিশার জীবনযাত্রার কথা সে বলেই চলল, তারপর বৃদ্ধের অতীত পেশা সম্পর্কে জানতে চাইল, এবং বুড়ো যে সুরকার তা জেনে লাফিয়ে উঠল চেয়ারে, কেননা যে লোকটার সঙ্গে এখন সে কথা বলছে, নাম তার কম্যাণ্ডারের তারুণ্যের সময়ে যথেষ্ট বিখ্যাত ছিল।

'আপনিই তিনি?' ফের জিজ্ঞাসা করলে এবং দ্রুত গেয়ে উঠল দুটি কলি। 'এটা আপনারই গান?'

'হ্যাঁ, আমারই,' বৃদ্ধ বললে অপ্রসন্ন গলায়, 'না, আমি নিজে বাজাই না, হাত দেখছেন তো। না, ইচ্ছে হচ্ছে না,

বুঝতে পারছি আপনার পক্ষে এ রকম সাক্ষাৎকার বিরল, কিন্তু ইচ্ছে হচ্ছে না।'

'মাপ করবেন,' অনুতপ্তের মতো মাথা নাড়লে কম্যাণ্ডার, বুদ্ধিহীনতার জন্যে দুষলে নিজেকে।

নীরবে খাওয়া শেষ করলে ওরা। কম্যাণ্ডার মাপ চেয়ে বললে যে তাকে যেতে হবে, পরামর্শ দিলে দিন তিন-চার এখানে থেকে উচ্চতায় অভ্যস্ত হয়ে নিক। ঘাঁটিতে পেঁছবার জন্যে নিজের 'ভলগা' গাড়িও দিতে চাইল সে। বুড়ো ধন্যবাদ জানিয়ে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলে, বললে যে সে পায়ে হেঁটেই যাবে, এটা তার পুত্রের স্মৃতিতর্পণ। কম্যাণ্ডার তাতে অবাক হল না, বোঝাবারও চেষ্টা করলে না কিছু— বোঝা যায় বুড়োর বিদ্ঘুটে খেয়ালের কথা সে আগেই শুনেছিল। শুধু উপদেশ দিলে ফৌজী কোর্তা, ট্রাউজার আর হাই বুট নিতে। সামনের পথটা ঠাণ্ডা হবে।

১২

এখন সে হাঁটতে লাগল ধীরে ধীরে, নিচে দোশাম্বে থেকে যে লঘুতা আর সানন্দ একটা তাগিদ তাকে তাড়িয়ে আনছিল, সেটা আর ছিল না। সেই সঙ্গে পথ শেষ হোক এটাও চাইছিল না বুড়ো, তাতে ভয়ই করছিল তার, কেননা মস্কো ফেরার পর কী সে করবে সেটা কিছুই ভেবে পাচ্ছিল না সে।

এইখেনে হঠাৎ সে টের পেলে যে সে বুড়ো হয়ে গেছে, শক্তি তার বাকি আছে অলপই, কষ্ট হচ্ছে প্রতিটি পা ফেলতেই। মুখটাও বুড়িয়ে গিয়েছিল তার, লোল চামড়া আরো ঝুলে পড়েছে, লাল হয়েছে চোখ, নাক ফোলা-ফোলা।

ঘাঁটি থেকে ঘাঁটিতে যাচ্ছিল সে, প্রতিটি ঘাঁটিতে থাকছিল

দু’-তিন দিন করে, ফাঁকা ফাঁকা অভ্যাগত কক্ষে শুয়ে থাকত, কারো সঙ্গে কথা বলার শক্তিও থাকত না, ইচ্ছেও হত না। একটু ভালো বোধ করলে মাঝে মাঝে সে কোথাও রোদ্দুরে গিয়ে বসত, অলস দৃষ্টিতে চেয়ে দেখত হরাইজণ্ট্যাল বারে ব্যায়াম করছে সৈন্যরা, দলাই মলাই করছে ঘোড়া, ব্যারাক সাফ করছে। সবাই তারা তার কাছে কেমন বিজাতীয়, তাদের জীবন আর কাজকর্ম তার অবোধ্য। এমন জীবন কেন সাত বছর কাটিয়েছিল তার ছেলে তা ভেবে পেত না বৃদ্ধ।

একদিন তার কাছে এসে বসল ঘাঁটির কম্যান্ডার, একজন লেফ্‌টেন্যাণ্ট। মস্কো, দোশাম্বের আবহাওয়া ইত্যাদির কথা জিজ্ঞেস করে হঠাৎ আবেগ ভরেই এমনভাবে বলে উঠল যেন অনেক দিন থেকেই বলতে চাইছিল কথাটা:

‘চমৎকার অফিসার ছিল আপনার ছেলে।’

এবং বুড়োর ঠোঁটে অনিচ্ছাকৃত একটু বাঁকা হাসি দেখে ঝাঁঝ দিয়ে বললে:

‘আপনাকে আমি বুঝতে পারছি। আমার বাবাও ঠিক আপনার মতোই! মিশা আপনার কথা আমায় বলেছে, মিলিটারি স্কুলে মিশা আর আমি যে পাশাপাশি খাটে শুতাম। মিশা ছিল বরাবরই এবং সবখানেই মানুষের মতো মানুষ!’ শেষ কথাটায় সে একটা বিশেষ অর্থ আরোপ করতে চেয়েছিল, কিন্তু কী সেটা আলস্যবশে খেয়াল করলে না বুড়ো।

হরাইজণ্ট্যাল বারের কাছে উঠে গেল কম্যান্ডার, রোদ্দুরে দোল খাওয়া একটি সুন্দর পেশল দেহকে কম্যাণ্ড দিতে লাগল:

‘পেত্রোভ! নে শুরু কর: এক, দুই! এক দুই! আরো নিখুঁত, আরো! এবার শেষ কর!’

প্রয়োজনীয় ভঙ্গিতে কাঠের গুঁড়োয় লাফিয়ে পড়ল দেহ,

তারপর বুট, শার্ট, ট্রাউজার নিয়ে বুড়োর পাশ দিয়ে গেল ধারা-স্নানের ঘরে। যাবার সময় মুখ ফিরিয়ে একদৃষ্টে চাইলে বুড়োর দিকে, আর হঠাৎ বুড়োর খেয়াল হল ও যে একেবারে ছেলেমানুষ, জ্বলজ্বলে রোদ-পোড়া চামড়া, হাসি খুশি। উনিশ বছুরে, সুপুরুষ তরুণ—ঠিক যেন তার তারুণ্যের দিনে সে নিজে। হাসল ছেলেটা, বৃদ্ধও হেসে সস্নেহে মাথা নাড়ল।

১৩

চড়াইয়ে উঠতে উঠতে বৃদ্ধ তাকিয়ে দেখতে লাগল কীভাবে আচমকা বদলে যাচ্ছে উদ্ভিদ। পপলার, ঝোপ, হলিহক পড়ে রইল নিচে, এখানে আছে শুধু মাটিতে গেড়ে বসা ঘাস, ফনীমনসার মতো পুরুষ্টু, রসালো, রুপোলী রোঁয়ায় ধূসরাভ। তাছাড়া ছিল কড়ে আঙুলের মতো ক্ষুদে ক্ষুদে হলদেটে স্টক, ক্ষুদে ক্ষুদে ডেইজি, ক্ষুদে ক্ষুদে ক্লোভার। আর প্রায় প্রতি দশ পা অন্তর দেখা দিতে লাগল পাহাড়ে ছাগলের প্রকান্ড প্রকান্ড শিঙ।

প্রথম যখন তা বুড়োর চোখে পড়ে, বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল সে—এতই অপূর্ব ও ট্র্যাজিক লেগেছিল এই রাজকীয় শিরোভূষণ, সুসম্পূর্ণ একটি প্রাণীর জীবনের সঙ্গে সঙ্গে পরিত্যক্ত এই দর্পিত অবশেষ। শিঙগুলো এবার দেখা যেতে লাগল বেশি ঘন ঘন, ঘাসের মধ্যে থেকে তা বেরিয়ে আছে যেন ছোবল মারতে উদ্যত কেউটে সাপ, ধূসর রঙের উঁচু পাহাড়ে মালভূমিটা তার ফলে হয়ে উঠেছে কেমন মৃত ও ভয়াবহ, যেন যুদ্ধের পর রণক্ষেত্র।

ফের চাঙ্গা হয়ে চলতে লাগল বুড়ো, কেননা বিরলীভূত

বাতাস আর উচ্চতায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল সে, শুধু দিন রাত ভারি টাটাত বুকটা। চলত লম্বা লম্বা নানা ভাবনা নিয়ে, এই জন্যে খুশি লাগত যে পাহাড়গুলো শেষ হয়েছে, পামিরের ছাদ তার নাগালের মধ্যে, সামনে ঝকমক করছে সর্বোচ্চের তুষারগাত্র।

কখনো সে রাত কাটাত ঘাঁটিতে, কখনো বা কিরগিজদের ছাউনিতে, তারা তাকে শিরচা খেতে দিত, চমরী গাইয়ের অসাধারণ সুস্বাদু হলদেটে ক্রীম দেওয়া কড়া এক রকম চা এটা, আরো হাঁটার শক্তি পেত তাতে।

গন্ধক আর নার্জান কুণ্ডে স্নান করে নিত সে, গরম স্রোত বয়ে যেত পায়ের ওপর দিয়ে, জলের ওপর ভাসত গুমোট বাষ্পের কুণ্ডলী। জলের ওপর মাথা নুইয়ে সে শুনত মৃদু কুলকুল টগবগ শব্দ, দেখত জলের ওপর সঞ্চরমান বুদ্বুদ, আর ফের তাকে পেয়ে বসত এক মধুর আদিম আতঙ্ক: পাথুরে এই রাজ্যটাকে জীবন্ত লাগত তার, মনে হত তার নিজস্ব একটা প্রাণ আছে।

১৪

সকালে তুষারপাত হচ্ছিল, কিন্তু সীমান্ত থেকে ফেরা একটা বাহিনীর সঙ্গে প্রাতরাশ সেরে সে যখন বাইরে বেরুল তখন রোদ্দুর উঠেছে। দুপুরটা হল বেশ গরম। কুর্তার বোতাম খুলে সে কলার আলগা করে দিলে।

যেতে যেতে সে ভাবছিল এখানে বাস করা লোকের পক্ষে কঠিন, তাহলেও বাস করে। এই ভেবে তার অবাক লাগল, যেখানে থাকা দুষ্কর, সেখানেও লোকে বাস করতে আসে স্বেচ্ছায়।

নিচের ঘাঁটিতে তার দিকে চেয়ে যে ছেলেটা হেসেছিল, তার কথা মনে পড়ল তার, মনে পড়ল তার সুন্দর মুখ, সুঠাম দেহ, লম্বা পা। কল্পনা করলে যেন তার বাগানে হাঁটছে এমনি কোনো লম্বা-পা কিশোর, পায়চারি করছে আপেল গাছগুলোর ফাঁকে ফাঁকে, হরিণের মতো তেজী, গায়ের চামড়া তাজা, টাটকা জ্বলজ্বলে ঠোঁট, চোখের শ্বেতাংশ নির্মল, উজ্জ্বল। শিশির আর রোদ পান করছে দেহ, বিকিরণ করছে একটা প্রখর সুরভি। নিজের মধ্যেই ছেলেটাকে টের পেলে সে, অনুভব করলে তার নিঃশঙ্ক সঞ্চরণ, তার নিশ্চিন্ততা, যেন দেখতে পেলে সে খালি পায়ে কদম ফেলছে ঘাসে, পায়ের আঙুল কুঁচকে যাচ্ছে শিশিরে—শক্তিমান, শুভপ্রাণ, প্রসারিত বাহু।

রাস্তা থেকে কিছু দূরে এখানে ওখানে তাদের বিবরের কাছে মোটা মোটা পেটের ওপর ক্ষুদে ক্ষুদে থাবা চেপে দাঁড়িয়ে ছিল পাটকিলে রঙের পাহাড়ে ইঁদুর, বুড়োকে দেখে জোরে শিস দিচ্ছিল। কিন্তু মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করে ওদের সঙ্গে আলাপের ইচ্ছে হল না বৃদ্ধের, সে চাইছিল শুধু নিজের মধ্যে এই ছেলেটাকে অনুভব করতে।

সে দেখছিল ছেলেটা দৌড়চ্ছে, টানা টানা শক্ত পেশীর পা তার অনায়াসে উঠছে আর নেমে আসছে ঘাসের ওপর। উপভোগ করলে সে কী সুন্দর এই রোদ্দুরের মধ্যে ছোটা, শরীর দিয়ে তার উষ্ণতা পান করা, পায়ের নিচে ঠাণ্ডা শিশির টের পাওয়া, চেয়ে চেয়ে দেখা ফুটন্ত আপেল গাছ।

এবং প্রতিটি মুহূর্তই বাঁচা, বইয়ের নীরস পাতাগুলোকে উলটিয়ে যাওয়ার মতো করে দিন ডিঙিয়ে যাওয়া নয়, পরিণামটা জেনে নেওয়ার জন্যে তাড়াহুড়ো নয়, বাঁচা। আর তারই মতো দেখতে এই ছেলেটির মধ্যে ফের সে বাঁচতে

লাগল, নিজের মধ্যেই অনুভব করলে সেই জীবন, অন্য সব কিছু চাপা দিয়ে এই প্রসঙ্গটাই তাকে আলোড়িত উদ্বেলিত করে তুললে।

একটু জিরিয়ে নেবার জন্যে বসলে সে, তাকিয়ে দেখলে চারিদিকে—আর সবই মিলিয়ে গেল। অপরের এই স্বচ্ছন্দ জীবনটার কেবল একটু ছোঁয়া লেগেছে তার—প্রতিটি মুহূর্ত প্রতিটি পদক্ষেপ তার ইন্দ্রিয় দিয়ে উপভোগ করার মতো, কিন্তু সে জীবন যাপনে সে আর কখনো সক্ষম হবে না। হয়ত ভবিষ্যতের কোনো সুখী পুরুষেরা, নিজেদের সমস্ত সন্দেহ শঙ্কার নিরসন যারা করেছে, একই ভাবের যারা ভাবী অথবা আদৌ ভাবে না, তারা ছাড়া এ জীবন যাপন আর কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

লাঠিতে ভর দিয়ে বসে রইল সে, তাকিয়ে রইল সীমাহীন মালভূমিটার দিকে, হলদেটে শেয়ালে লেজের ঝলক দিয়ে তাতে ছোটাছুটি করছে কীসব ছোটো ছোটো পাহাড়ী জন্তু। তার ভালো লাগল যে দিনটা গরম, তুষারগলা মাটি থেকে কড়া, ঝাঁঝালো গন্ধ উঠছে, দূরের কৃষ্ণনীল হ্রদটার ওপরে উড়ছে তিনটি হাঁস। আর অনেক দূরে ফিরোজা আকাশের পটে ঝকমক করছে পামির শীর্ষের তুষার কুঁজ।

এটা তার পথের শেষ দিন। মিশার পোস্টে পৌঁছতে লাগবে আর ঘণ্টা পাঁচেকের হাঁটা। ফেরার পথটা সে ঠিক করলে গাড়িতে আসবে, সেই জন্যে পথের তৃপ্তিটা সে চাইল দীর্ঘায়ত করতে।

তাই রাস্তায় তার নিশ্চিন্ত পদক্ষেপের শব্দটা সে আর মনের মধ্যে চাপা দিলে না, স্লোগান আর হুকুমনামা আঁটা বাড়ির দেয়ালগুলো, সে সন্ধ্যায় তার যে কনসার্ট দেওয়ার কথা, তার আমেজ, দূরের যে ভাঙা ভাঙা হল্লা তাকে বিচলিত

করছে না, স্পর্শ করছে না, তারপর ক্রমবর্ধমান কণ্ঠস্বর, সবই শুনতে পেল সে। শুনলে উৎকটের, অকরুণের, অমোঘের এগিয়ে আসাও।

তারপর বিদ্বেষের, জান্তব আতঙ্কের এই প্রসঙ্গটা তাকে অভিভূত, দলিত করে ভাসিয়ে নিয়ে গেল, রক্তের স্বাদ পাওয়া মর্কটের এই প্রসঙ্গ, যাদের দেহে শুধু প্রাথমিক সংকেত ব্যবস্থাটাই কাজ করছে। দুই হাতে লাঠি আঁকড়ে সে বসে রইল, দু'-চোখ কাচের মতো, মুখখানা ফ্যাকাশে।

কাছেই একটা পাহাড়ে ইঁদুর সোজা তাকে লক্ষ করেই শিস দিলে। সম্বিত ফিরে উঠে দাঁড়াল বুড়ো, ফের চলতে লাগল।

পৌঁছল হ্রদটা পর্যন্ত, তার তীরে খানিক দাঁড়িয়ে ভাবল তার ছেলেও নিশ্চয় একাধিক বার দাঁড়িয়েছে এখানে, তাকিয়ে দেখেছে কালচে অগভীর জলে, হয়ত গুলিও করেছে এই কালচে-বাদামী ভারতীয় হাঁসগুলোর দিকে। ছেলের নিশানা বোধ হয় ভালোই ছিল। তবে তার যা চাকরি তাতে নিশানা ভালো থাকারই তো কথা।

আর এ কথা ভেবে তার ফের অবাক লাগল যে এইখানে, এই দুঃসহ পাথরের রাজ্যে, গরমকাল যেখানে মাত্র এক মাস, যেখানে স্বচ্ছন্দ বোধ করে কেবল চমরী গরু, কেননা নিচে নামালে তারা মরে যায়, সেখানেও পুরুষের পর পুরুষ লোকে দিন কাটাচ্ছে স্বেচ্ছায়। দিন কাটাচ্ছে, ভাবছে না যে অন্য কোনো আলাদা জীবন আছে, অনশন মৃত্যুর আতঙ্ক আর পরের বসতিতে পৌঁছবার পথটা ঠিক কিনা এই সন্দেহ ছাড়া অন্য কোনো আতঙ্ক বা সন্দেহে তারা পীড়িত নয়।

আর কয়েক মুহূর্তের জন্যে তার খেদ হল যে সেভাবে

জীবন যাপনে সে অক্ষম, পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি সে আহরণ করতে পারে না টাটকা সেদ্ধ মাংসের স্বাদ থেকে, নারীর আসঙ্গ থেকে, তার নিজের অমরতার যারা সূত্র সেই সন্তানদের ধ্যান থেকে।

পশুপালকদের তাঁবু দেখতে পেয়ে সে রাস্তা ছেড়ে চলে গেল সেখানে। শিরচাইয়ে চুমুক দিলে, চাপাটির সঙ্গে খেলে কাইমাক, বড়ো একটা চেক ব্রোচ আর মাকড়ি উপাহার দিলে কর্ত্রীকে, তপ্ত লোহার চুল্লির কাছে বসলে খানিক, আলাপ করলে বড়ো ছেলেমেয়েদের সঙ্গে—শীতকালটা তারা থাকে ওশের বোর্ডিং স্কুলে। সারা দেহে ছড়িয়ে পড়েছিল একটা অবসাদ, দুর্বলতা, হাঁটার ইচ্ছে হচ্ছিল না। তাহলেও নিজেকে শক্ত করে সে বেরিয়ে পড়ল।

দূরের তাঁবুটার দিকে তাড়াতাড়ি করে ঘোড়া ছুটিয়ে গেল দু'জন সীমান্তরক্ষী, একজন লেফট্‌ন্যাণ্ট, অন্যজন সিপাহী; লেফট্‌ন্যাণ্ট পশুপালকদের দলপতির সঙ্গে কী একটা আলাপ করে এগিয়ে এল এদিকে। ভারি লম্বা লোকটা, কষে বেল্ট বাঁধা কোমরটা সরু, স্থিতিস্থাপক, হাঁটছিল সামনের দিকে একটু ঝুঁকে, খাকি রঙের তারা বসানো টুপিটা ধরে রাখছিল হাত দিয়ে যাতে বাতাসে উড়ে না যায়। কাছাকাছি এসে লেফট্‌ন্যাণ্ট সম্ভাষণ জানালে:

'আপনি কে আমি জানি, দেখা হয়ে আনন্দ হল।' কৈফিয়ৎ দিলে, 'মিশা ছিল আমার সেরা দোস্ত, আমাদের ঘাঁটিটা ওদের পাশেই।'

দলপতিও বললে, তাদের সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় কম্যাণ্ডারের মৃত্যুতে তারা খুবই মর্মাহত, আর তাঁর পিতা যখন এখানে এসেছেন, তখন একবার তাঁকে তাঁবুর ভেতরে যেতেই হবে: বউ মাংস রান্না করেছে।

রাজী হল বৃদ্ধ, আনন্দই হল যে মেয়াদটা আরেকটু বাড়ল।

পাহাড়ে ছাগলের চামড়ার ফরাশে বসল তারা, বাচ্চা পাঁঠার পুরুষ্টু কালো মাংস খেলে, গল্প করতে লাগল। দলপতি লেফ্টেন্যাণ্টের কাছে অনুমতি চাইলে যাতে সীমান্ত এলাকাটায় তাদের পশু চরাতে দেওয়া হয়। লেফ্টেন্যাণ্ট কথা দিলে যে ব্যাপারটা দেখে একটা এলাকা বরাদ্দ করবে; গর্ব করে বললে যে কাল সন্ধ্যায় সে খবর পেয়েছে তার ছেলে হয়েছে। এই উপলক্ষে নেমন্তন্ন করল সবাইকে পোস্টে। বুড়োর ইচ্ছে হচ্ছিল নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে, কিন্তু কেন জানি প্রত্যাখ্যান করলে।

সিপাহীর সঙ্গে লেফ্টেন্যাণ্ট চলে গেল, আবার এগুতে থাকল বুড়ো।

হাঁটছিল সে, কিন্তু খুবই কষ্টকর আর দুর্বহ বোধ হচ্ছিল সেটা, কেননা ফের সেই দঙ্গলটাকে সে দেখতে পাচ্ছিল তার সামনে, উচ্ছৃঙ্খল সেই জনতা যারা তাকে মথিত, রক্তাক্ত করেছে। আতঙ্ক আর নয়, বোধ করছিল শুধু বিদ্বেষ। নিজেকে সে দেখছিল যেন চোখ তার জ্বরের ঘোরে বসে গেছে, মাথাটা ভারাক্রান্ত, প্রাজ্ঞ, দুই বাহুর বদলে পাখা গজিয়ে উঠেছে দুটো, কেননা সবার চেয়ে ওপরে উড়ে যাওয়ার এক উদগ্র ইচ্ছা হচ্ছিল তার। এবং উড়েই গেল সেই জনতার ওপর দিয়ে, যারা খায়, দায়, ভালোবাসে, জন্ম দেয় সন্তানের।

কিন্তু কোথায় যেন এই জনতার মধ্যে, পৃথিবীর সবচেয়ে অপ্রসন্ন সব জায়গায় বাস করছিল তার ছেলের মতো মানুষেরা। নানান পেশার লোক তারা, কিন্তু অভিপ্রায় ছিল একটা: পুঞ্জীভূত কাঁচামালের মধ্যে থেকে, ভালো মন্দের বাছবিচারে অক্ষম যেসব ছেলেমেয়ে তাদের হাত দিয়ে বেরিয়ে

আসছে, তাদের মধ্য থেকে শুভপ্রাণ, শক্তিমান মানুষ গড়ে তোলা। এমন মানুষ যারা আর কখনো এক চিন্তাহীন নিষ্ঠুর জনতায় পরিণত হবে না।

ফের তুষারপাত হল, ধূসর আর ঠাণ্ডা হয়ে উঠল চারিদিক। রাস্তা ঢেকে গেল তুষারে, তাহলেও ভেজা মাটিতে টায়ারের দাগগুলো তখনো ঠাহর করা যাচ্ছিল। তবে শীগগিরই তুষারপাত বন্ধ হয়ে গলে গেল তুষারকণা।

অদ্ভুত একটা জায়গায় এসে পৌঁছল বৃদ্ধ—হলদেটে মাটি, হলদেটে ঘাস, ছোটো ছোটো টেরাকোটা টিলা। কালো কালো পদচিহ্ন তাতে, যেন কোনো নিগ্রো সেখানে ছোটাছুটি করে গেছে। টিলাগুলোর মাঝখান দিয়ে কিছুটা এংকেবেংকে হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে পথটা। বৃদ্ধ বুঝল যে সে পথ হারিয়েছে, ফ্রণ্টিয়ার পোস্টে পৌঁছবে না এটা, গেছে শুধু পশুপালকদের কোনো একটা প্রাক্তন আস্তানা পর্যন্ত। এ পথ ধরে উল্টো মুখে তাঁবুতে ফিরতে হলে লাগবে ঘণ্টা পাঁচেক, অথচ ভয়ানক হাঁপিয়ে গেছে সে, পা আর চলছে না। অথচ কোথাও যদি সে না যায় তাহলে এখানেই ঘুমিয়ে পড়ে জমে মারা যাবে।

হঠাৎ একটু দূরে আরেকটা পথের মতো চোখে পড়ল তার। কেবল একটা গাড়িই এখান দিয়ে গেছে এবং গেছে মাত্র কিছুক্ষণ আগে। কিছুটা দ্বিধার পর এই চাকার চিহ্নটা ধরেই এগুতে লাগল সে, ভাবল যে করেই হোক এই পথটাই তাকে পোস্টে পৌঁছে দেবে।

ঘন ঘন ক্লান্ত আঘাতে স্পন্দিত হচ্ছিল তার বুক, টনটন করছিল বাঁ হাতটা, বমি ঠেলে আসছিল গলা পর্যন্ত, বেড়ে উঠল মাথার যন্ত্রণা ও ভার। বুড়ো বুঝলে যে অলক্ষ্যে, প্রায় না অনুভব করেই সে নিশ্চয় উঠে এসেছে খুবই উঁচু একটা

জায়গায়; এই উচ্চতায় এবং অক্সিজেনের একান্ত অভাবে তার শেষ শক্তিও ফুরিয়ে গেছে।

চুড়োগুলোকে আলো করে পাটে বসল সূর্য, গোলাপী আর রক্তিমে কোলাকুলি করে আরো কিছুক্ষণ জ্বলল আকাশ, তারপর নিভে গেল, কালো হল, চাঁদ উঠল। পূর্ণিমার জ্বলজ্বলে চাঁদ, তাই বেশ দেখা যাচ্ছিল পথরেখাটা।

চলতেই থাকল বৃদ্ধ, ঘন ঘন থামছিল সে, হাঁপাচ্ছিল। রক্ত দপ দপ করছিল রগে, চোখের সামনে দেখা দিল রামধনুর ছটা।

কিছুই আর দেখছিল না সে, কিছুই শুনছিল না, শুধু প্রতিটি পা ফেলছিল সন্তর্পণে। সময় নেই তার, ইচ্ছে নেই যে চারিদিকে চোখ বুলোয়, তাকিয়ে দেখে প্রসারিত শাদা সমভূমিতে কালো কালো সাপের মতো ফণা তুলে আছে পাহাড়ে ছাগলের শিঙ, লুটিয়ে আছে পাথরগুলোর কালো ছায়া।

ভেতরটা তার শূন্য, অদ্ভুত, এখন শুধু শুয়ে পড়া ছাড়া কোনো আকাঙ্ক্ষাই তার ছিল না, কিন্তু জানত যে শোয়া উচিত নয়। কিন্তু তারপর যখন টের পেলে সে আর এক পা-ও হাঁটতে পারবে না, তখন কেন এটা আগেই করে নি ভেবে অবাক হয়ে শুয়ে পড়ল ঝকমকে শাদা ঘাসের ওপর। পাথরগুলোর মাঝখান দিয়ে সে এঁকেবেঁকে ছ্যাঁচড়াতে লাগল সাপের মতো, জ্যোৎস্নায় সে সাপের আঁশগুলো ঝলক দিলে কখনো রুপোলী, কখনো নীলাভ। ভারি ভালো লাগল তার।



ভ্লাদিমির সলোউখিন। ১৯২৪ সালে জন্ম ভ্লাদিমির অঞ্চলের কৃষক পরিবারে। টেকনিক্যাল কলেজ পাশ করেন, সোভিয়েত ফৌজে যোগ দেন। শেষ করেন গোর্কি সাহিত্য ইনস্টিটিউট। সাংবাদিক হন, কবিতা ও গল্প লেখেন। প্রথম বই 'ভ্লাদিমির এলাকার মেঠো পথ', জবলজবলে মৌলিক ধরনের লেখক হিশেবে প্রতিষ্ঠা পান তাতে। প্রকৃতির ভক্ত তিনি, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যারা মাটিতে খাটছে, তাকে রূপসী করে তুলছে, তাদের জয়গান করেন, 'পৃথিবীতে বাঁচা', 'শিশির কণা', 'মা-সৎমা', 'শীতের দিন', 'রুশ মিউজিয়ম থেকে চিঠি' প্রভৃতি গদ্য ও কবিতা গ্রন্থের লেখক।

ভারভারা ইভানভনা

বসে বসে গল্প করছিলাম আমরা। পানভোজন হয়ে গেছে। টেবিলের ওপর এখন পড়ে আছে শুধু শূন্য পানপাত্র, ওমলেটের শূন্য প্যান, একটা ডিশে পেঁয়াজ কলির কিছু অবশেষ, একটা ডিশে রুটি।

আমি ছাড়া টেবিলে ছিলেন আমাদের জেলা কমিটির (সেটা বর্ধিত হবার আগে) ভূতপূর্ব সেক্রেটারি, বর্তমানে প্রাদেশিক কমিটির কর্মী কুদ্রিয়াশভ, জেলা কমিটির (বর্তমানে তা পার্টি কমিটি) নতুন সেক্রেটারি গ্রিগোরিয়েভ, গ্রাম সোভিয়েতের সভাপতি বরিসভ আর ট্র্যাক্টর মেরামতি স্টেশনের পরিচালক লেওনিদ কনস্তান্তিনভিচ করোভিন।

পাছে কোনো কথা ওঠে, তাই খোলাখুলিই স্বীকার করছি

যে প্রথম তিনটে নাম বানানো: ওমলেটের সঙ্গে একশ গ্রাম করে মদ খেয়েছিলাম আমরা, তবে লেওনিদ কনস্তান্তিনভিচ করোভিনের নাম কিছুতেই গোপন করতে পারলাম না, কেননা চমৎকার একটা ছোট্ট ঘটনা আমাদের বলেছিলেন তিনিই, সেইটেই লোককে জানাতে চাইছি।

আর বলেছিলেন কেমন! একেবারে যেন পেশাদার সাহিত্যিক। একটি বাড়তি কথা না, ছিল শুধু প্রধান জিনিসগুলো, যেন নিজের লেখা একটা গল্পের বিষয়বস্তুটা বলছেন।

আর ওমলেটের সঙ্গে একশ গ্রাম করে যে মদ খেয়েছিলাম সেটা এই জন্যে যে তার আগে দুটি জীপে করে সারাটা দিন কলখোজের ক্ষেতে ক্ষেতে, ব্রিগেডে ব্রিগেডে ঘুরতে হয়েছিল: কোথাও অঙ্কুর বেরিয়েছে, কোথাও বেরয় নি, সেবারকার বসন্তটা হয়েছিল ভারি ধকলের: এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল তিরিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড গরম।

তাতে আবার কলখোজের নতুন সভাপতি (১৯৩৭ সালে জন্ম, ছোকরা পশুপালনবিদ, তাকেই সভাপতি করা হয়) তার প্রাথমিক প্রশাসনিক উৎসাহে গুবলেট করে বসেছিল। শৃঙ্খলা জোরদার করার জন্যে ব্যবস্থাপক মণ্ডলীতে স্থির হয় যে কলখোজে যারা কাজ করবে না, তাদের ব্যক্তিগত সবজী জমি কেটে নেওয়া হবে। যারা সজ্ঞান আলসে বা বাইরে কোথাও কাজ নিয়ে রোজগার করে তাদের কথা আলাদা, কিন্তু আমাদের প্রায়ই যা হয়, বাড়াবাড়ি করে বসল।

যেমন বুড়ো আর বুড়ি তাদের ভাঙা কুড়েয় বসে মরণের দিন গুণছে। যতদিন পেরেছিল কলখোজের কাজে খেটেছে, এখন আর শক্তি নেই। আশী বছর তো পেরুল। সবকিছুরই একটা সীমা আছে। থাকুক না তার মাটির দাওয়ায় বসে,

কি সবজী ক্ষেতে মাটি খুঁড়ুক। ছোট্ট একটু বাগান, মে জুন মাসে এটা ওটা ফুল ফোটে তাতে, বাগানের পর আলুর ভুঁই। আশি অবিশ্যি ওদের পেরিয়েছে, হয়ত শীগগিরই মরবে, ধরো মাত্র আর দু'-বছরই বাঁচল, কিন্তু খেতে তো হবে। ফুল বাগান, আলুর ভুঁই, সবজী ক্ষেত, সবই তো বুড়োদের চাই। কলখোজে তো আর পেনশন দেয় না।*

হঠাৎ কিনা হুকুম হল, অর্ধেকটা জমি কেটে নাও।

'সে কী গো সজ্জনেরা? সবজী ভুঁইয়ের ওপাশে ধার বরাবর যে ওট লাগিয়েছি, মুরগীগুলোকে তো দুটো দিতে হবে।'

কিন্তু কোথায়, কানেই তোলে না! যা বুনেছিল গেল। এমন কি বীজগুলো ফেরত দেবার কথাও ভাবলে না। দ্যাখো কেমন ছোকরাদের কাণ্ড।

কিংবা ধরো আরেকটা ঘটনা। সারা জীবন লোকটা মস্কোয় কাটাল, ইচ্ছে করে কলখোজ থেকে পালিয়েছে এমন নয়, মস্কোয় গেছে সে বিপ্লবেরও আগে। কাজ করেছে সেখানে কারখানায়, লোকের জন্যে দিয়েছে বলা যায় নিজের যা সামর্থ্য। প্রতি বছর ছুটির সময় গাঁয়ে আসে, নদীর ধারে বাড়ি, বাড়ির সঙ্গে বাগান।

পেনশন পেয়ে বরাবরের জন্যে চলে এল খোলা হাওয়ায়। বাগানটিও বেশ পরিপাটী, ছিমছাম, সভ্যভব্য। এমন নয় যে বিক্রি করার মতলব, নিজেই ভোগ করবে। বড়ো একজন সাহিত্যিকই বলেছিলেন, প্রত্যেকটি লোক অন্তত একটি করে

---

* এটা আগের ঘটনা। বর্তমানে কলখোজেও (যৌথখামার) পেনশন দেওয়া হচ্ছে। — সম্পাঃ

গাছ পুঁতুক মাটিতে। আর বুড়োরা তো খোদ ভগবানের আজ্ঞায় মাটি নিয়ে পড়ে থাকে, যত্ন আত্তি করে বাগানের।

হঠাৎ হুকুম হল: ফলগাছ সমেত মস্কোর পেনশনভোগীর সমস্ত বাগিচা কেড়ে নেওয়া হোক। আমাদের এখানে যা বলে: দেয়াল ছাঁট। অর্থাৎ যেটুকু জমির ওপর বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে শুধু সেইটুকু রাখো।

কলখোজের ছোকরা সভাপতি গুবলেট করে বসল, জেলার কর্তারা তার তদন্ত করছে। তাই প্রচণ্ড গরমে কলখোজের ধুলোভরা পথে গাড়ি দাবড়িয়ে পাঁচটা নাগাদ আমাদের যে ক্ষিদে পাবে আর চর্বির টুকরোর সঙ্গে ওমলেট যে যুৎসই লাগবে, তাতে অবাক হবার কী আছে।

আলাপটা ক্রমশ পেঁছে গেল সোজাসুজি দার্শনিক প্রসঙ্গে। ঠিক কী সূত্রে মনে নেই, তবে আলোচনা হচ্ছিল, লোকের ধরা যাক শক্তি বা সহ্যক্ষমতার সীমাটা কোথায়, লোকে নিজেই কি সে সীমাটা জানতে পারে, নাকি কোনো গুপ্ত মজুদ শক্তি আছে, যার আভাসও জানা থাকে না, হঠাৎ তা চালু হয়ে যায়, অসাধ্য সাধন করে লোকে।

নানা রকমের চিত্তাকর্ষক ঘটনা শোনা গেল।

'আর এটা কী করে ঘটে, যুদ্ধে যেমন হয়েছিল, (তখন ঘেরাও হয়ে পড়েছিলাম) মনে হচ্ছে আর এক কিলোমিটার হাঁটলেই লুটিয়ে পড়ব। পা আর এক কদমও চলে না। দেহের সমস্ত মজুদশক্তি শুকিয়ে গেছে। কিন্তু জার্মানরা যেই তাড়া দিলে, অমনি চল্লিশ কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে দিলাম, তাও গোটা পথটা প্রায় ছুটে... ধাঁধা বটে।'

এই দিক থেকে খুবই তাৎপর্যময় অভূতপূর্ব একটা ঘটনার কথা আমার মনে পড়ল, শুনেছিলাম ভূতপূর্ব নৌসৈনিক মিশা গর্দেঙকোর কাছে।

ওদের ডেস্ট্রয়ারের ডেকে মাইনের মধ্যে হঠাৎ বিস্ফোরক ক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। খট করে ওঠা শব্দটা শুনতে পায় দু'জন নাবিক। ঠিক কয় সেকেন্ড পরে বিস্ফোরণ ঘটবে সেটা ভালোভাবে জেনেই তারা মাইনটাকে তুলে দুলিয়ে ছুড়ে ফেলে জলে। ডেস্ট্রয়ারটা পেরিয়ে যাবার পর তার পেছনে সেটা ফাটে। কিন্তু মজার কথা এই যে পরে নিশ্চিন্ত পরিস্থিতিতে সেই দু'জন নাবিক ডেক থেকে ওই ধরনের মাইন এক সেণ্টিমিটারও তুলতে পারে নি, দুলিয়ে ডেক পেরিয়ে ছুড়ে ফেলা তো দূরের কথা। করাল সেই মুহূর্তটায় শক্তি এল কোথা থেকে?

'এ আর কী!' হঠাৎ বলে উঠলেন লেওনিদ কনস্তান্তিনভিচ করোভিন, 'এ সবই নিতান্ত গপ্পো—ছেঁদো কথা। আমি যে ঘটনাটা জানি...' বলে তিনি এই গল্পটা করলেন:

একটা গাঁয়ে আমি কলখোজের কাজ যাচাই করছিলাম (যে গ্রামটার নাম করলেন সেটা আমাদেরটা থেকে বিশ কিলোমিটার দূরে)। ঠিক এই আজকের মতো যত সব ঝামেলার পর ব্রিগেডিয়ারের বাড়িতে গেলাম একটু কিছু খেয়ে নেবার জন্যে।

ব্রিগেডিয়ারটি মেয়ে, বছর চল্লিশ বয়স, নাম তাতিয়ানা সের্গেয়েভনা। বাড়িটি ছিমছাম, রাস্তার দিকে তিনটে জানলা, জানলার সামনের বাগানে জুঁই ঝাড়, যেন টবের ফুল। অবিশ্যি বোঝা যাচ্ছিল অনেক দিন থেকেই ও গাছের যত্ন হয় না। বোঝোই তো: কলখোজে ব্রিগেডিয়ারের কাজ কিংবা ফুল গাছ, দুয়ের একটা, একসঙ্গে দুটোই চলে না।

মেয়েটি বিধবা। স্বামী গত বছর মারা যায়। সত্যি বলতে কি, এখন আর মনে নেই কিসে মরল, মানে কোন রোগে। মনে হচ্ছে হয়ত পেটের আলসারে। তবে হয়ত

আলসার নয়। মিথ্যে বলে কি হবে, তাছাড়া ওটা আমার বক্তব্যের দিক থেকে প্রাসঙ্গিকও নয়। ঘটনাটা এই যে মেয়েটি বিধবা।

সামনের ঘরটি বেশ বড়ো সড়ো, গোছালো, মেঝের নানা দিকে সব কার্পেট পাতা, টবে ফুল, সুতী ছিটের পর্দা, দেবপটগুলো নক্সাতোলা কাপড়ে সাজানো, সামনে লাল বাতি।

'এ সব কী গো,' ভর্ৎসনা করেই বললাম, 'তুমি কলখোজের একজন কর্ত্রী, পার্টির সদস্য, লজ্জা হয় না?'

তাতিয়ানা সের্গেয়েভনা চোখ দিয়ে কাঠের পার্টিশানটা দেখিয়ে প্রায় ফিসফিস করে বললে:

'মা মৃত্যুশয্যায়। বাতি জ্বালাতে বলেছে। মুমূর্ষু কৃত্য হয়ে গেছে গত কাল।'

পার্টিশানটার ওদিকে উঁকি দিয়ে দেখলাম খাটে এক বুড়ি শুয়ে আছে টানটান হয়ে, মৃতকে যেভাবে শোয়ানোর রীতি। এমন কি হাত দু'খানাও বুকের ওপর জোড় করা, কবরে দেবার সময় যা করা হয়। মুখখানাও একেবারে মড়ার মতো: হলদে চামড়া, গাল বসে গেছে, ঠোঁট টানটান, নীলচে, নাক শুকিয়ে গেছে, ভুরুর জায়গাটা ঠেলে উঠেছে ফ্যাকাশে হয়ে। হাত দুখানার কথা তো বলারই নয়—একেবারে মোমের মতো। ছাই ছাই রঙ ছড়িয়ে পড়েছে মুখে। তার মানে আজ কি কালই শেষ। শেষ কৃত্য করে রাখতে বলেছে নেহাৎ খামকা নয়...

'হ্যাঁ, ভারভারা ইভানভনা তাঁর যা করবার সবই করে গেছেন,' বেরিয়ে এসে টেবিলের দিকে যেতে যেতে বললাম আমি, 'কত হল? নিশ্চয় আশি পেরিয়েছে?'

'ছিয়াশি চলছে,' বললে তাতিয়ানা সের্গেয়েভনা, 'হ্যাঁ, করবার সবই করেছে। মানুষ করেছে সাতটি ছেলেমেয়ে।

দুই মেয়ে বিয়ে করে অন্য জায়গায় চলে গেছে। চারটি ছেলে মারা গেছে জার্মান যুদ্ধে। আরেকজন তো এই সেদিন গেল (তার মানে কথাটা তার স্বামীর প্রসঙ্গে)। ছেলেরা মারা যাবার পর তাদের ছেলেমেয়েদের খাড়া করতে হয়। এখন নানা জায়গায় সবাই ছড়িয়ে পড়েছে: কেউ ভ্লাদিমিরে, ট্র্যাক্টর কারখানায়, কেউ মস্কোয়, একজন ইঞ্জিনিয়র। বড়ো হল সবাই, তবে দেখতেও আসে না। পর হয়ে গেছে...

'আর আপনি ভাবছেন এই যে তকতকে পরিষ্কার, এ সব আমার করা? কলখোজের ব্রিগেডিয়ার আমি, ঘরদোর ধোয়া পাকলার সময় কোথায়? সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত কেবল পায়ের ওপর, মেজাজ ঠিক রাখাই দায়। বাড়ির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সবই ওর করা। তা ছাড়া আমারও তিনটি আছে তো, ছোটোটির আড়াই বছর, বড়োটির ছয়। কী করা যাবে, সংসার...

'চার দিন আগে শয্যা নেয়। সঙ্গে সঙ্গেই খারাপ বাঁক নিল। তিন দিন পরেই তৈরি। যেন মোমের বাতি—এক ফুঁয়েই শেষ। অথচ আপনারা আমায় ধমকাচ্ছেন, কেন মুমূর্ষুকৃত্য করতে দিলাম। না করে করি কী, গোটা পঁচাশি বছর জীবনের মধ্যে এইটেই যে তার শেষ আর একমাত্র ইচ্ছে, শেষ কামনা। আমরা যাই হই, বুড়োরা যে অন্যরকম। যাবার সময় যেমন ইচ্ছে সেই ভাবেই যাক। ওদের সেকেলে দৃষ্টিতে যেটা মনে হচ্ছে ভালো, মানুষের মতো, সেই ভাবেই।'

হঠাৎ আমাদের খেয়াল হল যে ভারভারা ইভানভনাকে নিয়ে আমরা এমনভাবে আলাপ করছি যেন মরেই গেছে, অথচ প্রাণটা তো আছে এখনো। হয়ত আমাদের কথাবার্তাও কানে যাচ্ছে, শুধু বলতে পারছে না কিছু। সংযত হয়ে আমরা

আলাপ করতে লাগলাম নিচু গলায়, তারপর ও প্রসঙ্গটাই ছেড়ে দিলাম।

আমরা যখন ওমলেট সহযোগে আহার সারছি, ঘরে ঢুকল তাতিয়ানা সের্গেয়েভনার তিনটি ছেলেমেয়ে। বড়োটি ছেলে, সেরিওজা, ছয় বছর বয়স, ধূসর চোখ, খড়-রঙা চুল— বাড়িতে লোক এলে নমস্কার জানাতে সে এর মধ্যেই শিখে গেছে। চার বছরের মেয়ে মাশার গায়ে একটা খাটো ঢিলে জামা, গোলালো মুখ, গোলাপী গাল, শক্ত গড়ন, ব্ল্যাক ক্যারেণ্টের জেলিতে তার সারা মুখ মাখা। তিন বছুরে ভভোচ্‌কা এসেই আঁকুপাঁকু করে উঠল মায়ের কোলে, আঙুল দিয়ে খাবার দেখাতে লাগল। সবারই খালি পা, তবে অযত্নের ছাপ কোথাও নেই। বোঝা যায় নারীর মনোযোগ আছে তাদের পেছনে। সামান্য অবহেলা আদৌ যদি কিছু ঘটে থাকে, সেটা মাত্র এই চার দিনে।

ব্রিগেডনেত্রীকে সদর কেন্দ্রে বৈঠকের জন্যে ডাকার কথা ছিল। কিন্তু ঘরে ওর মুমূর্ষু দেখে বলা হল সে যেন না আসে। ঝামেলা তো কম হবে না: কফিন আনো রে, কবর দাও রে, মৃতের স্মরণে মদ্যপানের আয়োজন করো রে—গ্রামের প্রথা তো। তা ছাড়া শোক আছে, অবিশ্যি বুড়ো হয়েছিল, অকালে যাচ্ছে না, তাহলেও কষ্ট হয় বৈকি...

পরের দিন জেলা কমিটিতে আমরা বৈঠকে বসেছি, হঠাৎ সেক্রেটারি মেয়েটি আমায় টেলিফোনে যেতে বললে। কাল যেখানে ওমলেট খেয়েছি, সেই কলখোজ থেকে ফোন করছে: ব্রিগেডনেত্রী তাতিয়ানা সের্গেয়েভনা সন্ধ্যায় বিচালি-কাটা যন্ত্র থেকে খসে আসা একটা টুকরোর ধাক্কা খেয়ে তৎক্ষণাৎ মারা গেছে। যেতে হয় ঘটনাস্থলে, তদন্ত করতে হয়। সত্যি না গিয়ে পারি কী করে! বিমূঢ় হয়ে গেলাম, কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিলাম

না আমাদের তাতিয়ানা সের্গেয়েভনা, দশাসই চেহারা, মাত্র চল্লিশ বছর বয়স, শক্তসমর্থ, প্রায় ঘোড়ার সহ্যশক্তি—হঠাৎ কিনা সে মরে গেল। আমাদের এলাকার সেরা ব্রিগেডিয়ার সে।

ডাক্তারকে নিয়ে রওনা দিলাম 'বিজয়' কলখোজে। সিলো তৈরির গর্তটা ওদের গাঁয়ে ঢুকবার মুখেই। তাই সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাটা দেখলাম।

তবে, কী আর দেখলাম। সিলো তৈরির জন্যে কাটা ভুট্টাগাছগুলোর ওপর পড়ে আছে আমাদের তাতিয়ানা সের্গেয়েভনা। বালাপোষের জামা, পায়ে চামড়ার পুরুষালী হাইবুট। পড়ে আছে উপুড় হয়ে, মুখটা পাশে ফেরানো। লোহার টুকরো বিঁধেছে রগে। হাতের ওপর মাটি, ব্রিগেডিয়ারকে যা মানায়। আসলে দেখবার কিছু নেই। সারা রাত এইখানেই পড়ে আছে বিচালির ওপর। হাসপাতালে পোস্ট মর্টেম পরীক্ষার জন্যে দেহটা তোলা হল গাড়িতে।

আমাকেও সদরে ফিরতে হত, কিন্তু হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে উঠল গতকালকের ছবিটা: প্রায় মৃত বৃদ্ধা, পিঠোপিঠি তিনটি শিশু।

ওদের কী হবে? ওদের কী হবে? অপ্রত্যাশিত ভাবনাটা পেয়ে বসল আমায়। শূন্য কুটির। মৃতা আর তিনটি শিশু। একেবারে যেন স্পষ্ট দেখতে পেলাম, বুড়ি মারা গেছে, মৃতা দিদিমাকে ঘিরে তিনটি শিশু। হয়ত ভয়ে ঢুকে বসে আছে বেঞ্চির তলায় টেবিলের নিচে।

থার্ড গিয়ার স্পীডে আমার জীপ চালালাম গাঁয়ের ভেতর, গাঁয়ের শেষ প্রান্তে, যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেই হলদে বাড়িটি, রাস্তার দিকে তিনটি জানলা, সামনের পুরনো বাগানটায় বুনো হয়ে ওঠা জুঁই ঝাড়।

ব্রেক কষলাম, ছুটে উঠলাম অলিন্দে, তারপর আঁতকে উঠলাম: হাতে বালতি নিয়ে হেঁটে আসছে ভারভারা ইভানভনা। জল আনতে।

'সেকি তুমি মারা যাও নি?' বেরিয়ে এল আমার মুখ দিয়ে। এতই নিশ্চিত ছিলাম যে না বলে পারলাম না।

'ওগুলোর কী হবে তাহলে?' কাজের লোকের মতো মাথা নেড়ে সে দেখালে কুটিরের ভেতর দিকে, যেখানে সম্ভবত বসে আছে নাতিনাতনীরা, 'বেশ, নয় আমি মরলাম। কিন্তু ওগুলো যে একেবারে অনাথ, কে ওদের দেখাশোনা করবে? দেখছি আমার মরারও ফুরসুত নেই। ভেতরে আসুন। আসুন না। ঠান্ডা দুধ চলবে?'

বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, তার পরও তিন বছর কাটল, বুড়ি এখনো বেঁচে আছে, প্রায় লোকান্তরিতা রুশী নারী ভারভারা ইভানভনা। বেঁচে আছে, মরবার সময় নেই তার। কিন্তু এ শক্তি আসছে কোথা থেকে?..

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:

প্রগতি প্রকাশন
২১, জুবোভস্কি বুলভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
21, Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union

পঞ্চাশের দশকের শেষ থেকে ষাটের দশকের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক ছোটো গল্পের রেওয়াজ যখন বেড়ে ওঠে তখন যে সব সোভিয়েত লেখক সাহিত্যে এসে বিশেষ নাম করেছেন।

তাঁদের রচনা এই গল্পগুচ্ছে সংকলিত হল। ইয়েভগেনি নোসভ, ভিক্তর আস্তাফিয়েভ, ইউরি কাজাকভ, ভিক্তর লোগিনভ, ভিক্তর তেলপুগভ, ভাসিলি বেলোভ, ফাজিল ইসকান্দের, মাইয়া গানিনা, ভ্লাদিমির সলোউখিন — এঁদের পরিচয় নিন।